প্রকাশনায় স্পেস চ্যানেল ফাউন্ডেশন

بنغالي



শান্তির পথ

The Path to Happiness

ডঃ আব্দুল্লাহ সালেম বাহাম্মাম

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল মামুন

বি,এ (অনার্স) ([illegible]) আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়,
এম, এ ([illegible]) ([illegible]) [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।

SPACE

প্রথম সংস্করণ
হিঃ১৪৩৫ ২০১৪ইং

https://www.path-2-happiness.com/bn

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness

www.path-2-happiness.com

শান্তির পথ

এমন কিছু ভাবনা, যা আপনাকে পৌঁছে দিবে সঠিক পথে......শান্তির পথে

প্রথম সংস্করণ

হিঃ১৪৩৫ ২০১৪ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

الطريق إلى السعادة

The Path to Happiness

www.path-2-happiness.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বংশধর ও সাহাবাগনের উপর। পরকথা......

আমি ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে আধুনিক পদ্ধতিতে লেখা যুগোপযোগী কোন বই খুঁজছিলাম, এমন বই যা মুসলিম ও অমুসলিম সকলের উপর প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং আধুনিক হওয়া স্বত্বেও ইসলামের মৌলিক উৎস নির্ভর হবে, যা ইসলামের পরিচয় তুলে ধরে যৌক্তিক ভাবনা ও অধুনা জ্ঞান-সভ্যতার পথ মাড়িয়ে শান্তির পথে নিয়ে যাবে; যাতে মৌলিকতার কোন ঘাটতি থাকবেনা এবং সাথে সাথে তা হবে ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি সমৃদ্ধ।

যদিও এ ক্ষেত্রে অনেক উৎকৃষ্ট বই আছে এবং সেগুলো হতে অনেক উপকৃত ও হয়েছি তবুও আমি চাচ্ছিলাম এ সংক্রান্ত সবগুলোকে একত্রিত করতে; যার ফলশ্রুতিতে আপনাদের করকমলে আমার এই বই। এতে একাধিক লেখার সমষ্টি, একদল কর্মীর যৌথ প্রচেষ্টা,বিভিন্ন মূল উৎস হতে একত্রীকরণ এবং বিভিন্ন পদ্ধতির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে; এ মহান দ্বীন ইসলামের পরিচয়কে আধুনিক ভাবে যৌক্তিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার জন্য এবং একথা প্রমাণ করার জন্য যে, ইসলামই শান্তির পথ এবং জ্ঞান,সভ্যতা ও সম্মানের পথ। অতএব আমাদের জন্য উত্তম হল,এ পথ ও দ্বীনের পরিচয় লাভ করা আল্লাহ তায়ালার বাণীর মাধ্যমে; যার অগ্র-পশ্চাতে কোন মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই এবং সাথে সাথে এ দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন অমুসলিম মনীষীদের বাণী উদ্ধৃত করা; যাতে পাঠকের অন্তরে প্রভাব-সৃষ্টিকারী উপাদানে ভিন্নতা আসে এবং ন্যায়পরায়ণ পাঠকের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়।

আমরা চাচ্ছি ,আপনাকে নিয়ে মৌলিকতার পথে পাড়ি জমাতে, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির সাগরে অবগাহন করতে এবং দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কথায় পথ খুঁজতে। শান্তির পথ অন্বেষণের এই পথ পরিক্রমায় আমরা বিখ্যাত জ্ঞানী ও মনীষীদের অভিজ্ঞতার পথ পাড়ি দিব।

শান্তির পথে উপনীত হওয়ার জন্য এটি একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক পথ পাড়ি দেয়া। এ পথ অন্তরের গহীনে পৌঁছবে, অতীত ইতিহাসের পথ পাড়ি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে উঁকি দিবে; এমন একটা মূহুর্তে, যখন বিভিন্ন ধরনের অনেক পথ ও মতবাদ শান্তির পথের মালিকানা দাবী করছে। ... আমরা অন্তরের বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলোকে একত্রিত করে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজ ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে শান্তির পথের পরিচয় লাভ করব।

সে পথ চেনার জন্য ও তা অবলম্বনের মাপকাঠি জানার জন্য এবং তার যাচাই বাছাই ও মূল্যায়নের জন্য আমাদের সাথেই থাকুন...... এটি শান্তির পথে এবং নৈতিকতা,জ্ঞান,সভ্যতা, দয়া ও মর্যাদার পথে যাত্রা.........আপনি কি সে পথ চিনেন?! সে পথ চিনতে আগ্রহী?!

ডঃ আব্দুল্লাহ বাহাম্মাম

www.ba-hammam.com

E_mail: abdullah@ba-hammam.com

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness



কোথায় শান্তির পথ?!

সূচিপত্র



কোথায় শান্তির পথ?!

প্রত্যেক মানুষ শান্তি খুঁজে, কিন্তু কোথায় সুখ-শান্তির পথ?!

পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক মানুষই সুখ-শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মতবাদ, জাতি, বর্ণ, উৎপত্তি, লক্ষ্য- উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সবাই একটি উদ্দেশ্যে একমত, তা হলো সুখ ও প্রশান্তি তালাশ করা।

যদি কোন লোককে জিজ্ঞেস করঃ তুমি এ কাজটি কেন কর? উহা কি কারণে করবে? সে বলবেঃ সুখ-শান্তির জন্য!! চাই তা শব্দগতভাবে বলুক বা অর্থগতভাবে বলুক। শান্তির প্রকৃত বা রূপক যেকোন অর্থেই হোক।

তাহলে সুখ-শান্তি কি? কিভাবে ইহা পাওয়া যায়?

সুখ হলো আনন্দ, প্রশান্তি, ঔদার্য ও প্রফুল্লতার ধারাবাহিক অনুভূতি। এ সুখানুভূতি তিনটি জিনিসের স্থায়ী অনুভূতির ফলে আসে, তা হলোঃ আত্মার উৎকৃষ্টতা, জীবনের উৎকৃষ্টতা ও শেষ পরিণতির উৎকৃষ্টতা।

মানুষ নিজেকে এ তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করে। সে যত বড় হয় তার প্রশ্নগুলো ততই বাড়তে থাকে। তার মনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান এসব প্রশ্নের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত সে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারেনা। সেগুলো হলোঃ

-কে এ মহাবিশ্বের মালিক? কে ইহা পরিচালনা করেন?

বিনিময়ে সৌভাগ্য

“কখনো তুমি এমন কিছু করবে যা তোমার কোন সৌভাগ্য বয়ে আনবেনা, তবে কোনকিছু করা ছাড়া সৌভাগ্য আসেনা। “

বেঞ্জামিন ডিজ্রাইলি
সাবেক বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী



সৌভাগ্য হল আমাদের সব চেয়ে নিকটে

“অনেক সময় আমরা সৌভাগ্য খুঁজি অথচ সৌভাগ্য আমাদের কাছেই থাকে, যেমন আমরা চোখের উপর চশমা রেখে অনেক সময় চশমা খুঁজি।”

টলস্টয়
রুশ সাহিত্যিক

-কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? কে আমার চারপাশের এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন?

-আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি কোথায় যাব?

যখনই মানুষের নিজের ও জীবনের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় তখনই এ সব প্রশ্নগুলো তার চিন্তা ভাবনার মাঝে বার বার ঘুরতে থাকে। যতক্ষণ না এ সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া না যায় ততক্ষণ সে প্রশান্তি লাভ করতে পারেনা।

পথ বিভিন্ন তবে আল্লাহ এক

“কোথায় যাচ্ছ যদি না জান, তবে সব পথই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।”



লুইস ক্যারল
গণিতজ্ঞ

নাস্তিকতার পথ, নাকি ধার্মিকতার পথ?!

মানুষ শুরুতেই উপরোল্লিখিত প্রশ্নের জবাব দু’ভাবে খুঁজতে চেষ্টা করে। একটা হলো নাস্তিকতার পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতিতে কোন ইলাহে বিশ্বাস করা হয়না এবং মনে করা হয়যে, এ বিশ্ব একটি উপাদান মাত্র।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলোঃ সে পদ্ধতি,যাতে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ তায়া’লা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এদু’ধরণের পদ্ধতির ফলে অনেকগুলো প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলোঃ

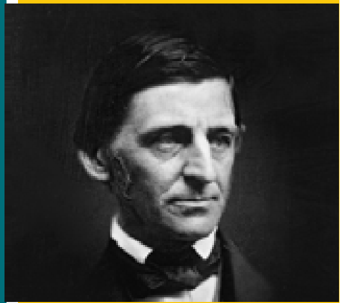
-এ মহাবিশ্ব কি কোন সময়ের নির্ধারণ ব্যাতিত আকস্মিক ঘটনাচক্রে শুরু থেকেই এমনিতেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব? !

- কোন বিবেকবান লোক এটা কি ভাবতে পারে যে, এ সুশৃংখল মহাবিশ্ব আকস্মিক ঘটনাচক্রে সৃষ্ট হয়েছে?!!

-মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যবদি যা কিছু পেয়েছে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যেসব উন্নতি হয়েছে এগুলো কি শুধুই আকস্মিক ঘটনা?!! আমরা কি শুধুই বাতাসের মুখে পতিত পালকের মত , যা আকস্মিক ঘটনা ও বিশৃঙ্খলতায় উলোট-পালট হতে থাকে?!

মানুষ কি নিজেই আইন প্রণয়নকারী উপাস্য ? সে কি নিজেই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা? এ সবের পিছনে কি কিছুই নেই?

- আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্যজগত কি শুধুই মরীচিকা, যা ধর্মহীনরা ও দৃশ্যমানে



তোমার গন্তব্য ঠিক কর

“কোথায় যাচ্ছে এটা যে জানে, জগত তার জন্য পথ প্রশস্ত করে দেয়।”

রালফ এমারসন
মার্কিন দার্শনিক



বিশ্বাসীরা বলে বেড়ায়?

- মানুষ কি যেকোন বিবেচনায় শুধুই পদার্থ ? নাকি তাদের মূল হচ্ছে বানর, যা যুগের পরিক্রমায় মানুষের রূপ ধারণ করেছে? এ নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে কিভাবে উচ্চ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, মহান গুণাবলী ও আশ্চর্য গঠনপ্রণালীর মানুষ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব?! যার কাছে যে বস্তু নেই সে কিভাবে অন্যকে তা প্রদান করবে?!

-দুনিয়াই কি মানুষের শেষ লক্ষ্যবস্তু? এতেই কি তার সকল আশার সমাপ্তি? আসমানী ধর্মসমূহ যে বলে, মানুষ ছাড়া অন্য একটি শক্তি আছে বা মানুষের এ জীবন ছাড়াও অন্য একটি জীবন আছে তার কি কোনই বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা নেই?

আল্লাহ তায়া'লা এ সবের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে ইরশাদ করেনঃ

{তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।}

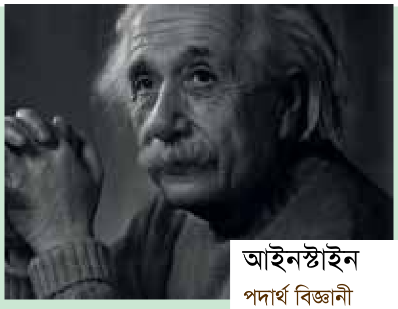
[জাসিয়াঃ ২৪]

যারা এসবের অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেনঃ

{তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?}[

[নামলঃ ১৪]

নাস্তিকরা ধর্মের ব্যাপারে যে বলে, ধর্ম শুধুই কাল্পনিক বিষয় এটাই যদি সঠিক হত তাহলে কেন মানুষের মাঝে ধর্মের সম্মানবোধ এভাবে বিরাজ করে।



আইনস্টাইন
পদার্থ বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান ও ধর্ম

“আমি মনে করি না যে, বিজ্ঞান অবশ্যই স্বভাবগতভাবে ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। বাস্তবে আমি এ দুয়ের মাঝে শক্ত মিল দিখতে পাই। এজন্য আমি বলব, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হল পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হল অন্ধ। উভয়টাই গুরুত্বপূর্ণ, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে। আমার মনে হয় বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোয় যে আলোকিত নয় সে মৃতপ্রায়।”



নিউটন
ইংরেজ দার্শনিক

নাস্তিকতা এক রকম বেকুবি।

“নাস্তিকতা এক রকম বেকুবি। কারণ, সৌরমণ্ডলের দিকে তাকালে দেখতে পাই, পৃথিবী সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থিত। এতে পৃথিবী সঠিক পরিমাণে আলো ও তাপ গ্রহণ করতে পারে। এটা অবশ্যই আকস্মিকভাবে ঘটেনি।”

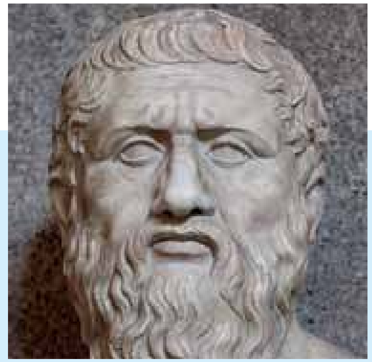
যুগে যুগে আম্বিয়া কেরামগণ কেন সফল হয়েছেন? তাদের রেখে যাওয়া মতাদর্শ কেন মানুষের মনে এখনো বিরাজ করছে? অথচ অন্যান্য মানুষের চিন্তাভাবনা মুছে যায়, বরং তা যতই বাগ্মিতাপূর্ন হোক যুগের পরিক্রমায় একসময় তা নিঃশেষ হয়ে হয়ে, মানুষ ভুলে যায়।

কে ভাল কাজ করল আর কে খারাপ কাজ করল তা কিভাবে পার্থক্য করা হবে? মানুষকে কোন জিনিস অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে? কোন বিষয় ধনীকে গরিবের প্রতি দয়াশীল করবে? চোর, ধোকাবাজ, খিয়ানতকারী, ও নেশাখোরকে কোন জিনিস বিরত রাখবে? ... কোন বিষয় তাদেরকে মনের খামখেয়ালীপণা থেকে বিরত রাখবে?

নাস্তিক্য সমাজব্যবস্থায় মানুষ এমনভাবে বসবাস করে, যেভাবে হিংস্র নেকড়ে অন্যায় অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও মনোবাসনাপূরন ইত্যাদি নিয়ে বসবাস করে। এজন্যই নাস্তিকতা হলো দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্রতা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ, উদ্বেগ ও অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব ।} [ত্বহাঃ ১২৪]

নাস্তিকতা একটি ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা যা সুস্থ জ্ঞান ও স্বভাব গ্রহণ করতে পারেনা। ইহা বিজ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক বৈপরিত্বের। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানীগণ এটার প্রতিবাদ করেছেন। এমনিভাবে ইহা যুক্তি তর্কেরও বিপরীত। কেননা ইহার মূল ভিত্তিই হলো জীবনের কোন যুক্তি নেই, এ সুন্দর পৃথিবী এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, জীবনের কোন স্বভাবজাত ধারা নেই। সুস্থ স্বভাব সকল মানুষকে, এমনকি নাস্তিকতার দাবীদারকেও ধর্মের দিকে আহবান করে।



প্লেটো
গ্রীক দার্শনিক

সৌন্দর্য এবং শৃঙ্খলা

“নিশ্চয় বিশ্বজগত সৌন্দর্য এবং শৃঙ্খলার এক মহা নিদর্শন। তা কাকতালীয় হেতু চক্রের ফল হতে পারেনা। বরং তা কোন জ্ঞানী স্বত্বার সৃষ্টি যিনি কল্যাণ কামনা করেছেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় ও প্রজ্ঞায় সব কিছু সুবিন্যস্ত করেছেন।”



প্রকৃত সৌভাগ্য

"আমি এখন বেঁচে আছি বাস্তবতার মাঝে; সমসাময়িক জড়বাদ, ভোগবাদ, যৌনতা ও নেশার মত বিভ্রান্তিকর আবহে নয়। অথচ ধারণা করা হয় যে, এগুলো মানুষকে সুখ দেয়। কিন্তু আমি এখন শান্তি, আশা ও ভালোবাসা সমৃদ্ধ সুখময় জগত দেখেছি।"

লরেন বুথ

বৃটিশ আইনজ্ঞ

এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা দরকার!!

এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে মানুষ অনর্থকই চেষ্টা করে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ সব প্রশ্নের একটিরও যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। কেননা এ সব বিষয় ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত, এজন্যই এগুলোর ব্যাপারে অনেক কিচ্ছা কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, কাল্পনিক নানা গল্প বানানো হয়েছে, যা মানুষকে আরো দিশেহারা ও হয়রান করেছে।

আল্লাহ পাক যদি কাউকে হেদায়েত না দেন ও সঠিক পথের সন্ধান না দেন তার পক্ষে এ সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব পাওয়া সম্ভবপর নয়; যে হেদায়েত তাকে নিরাপত্তা, শান্তি, সুখ ও আনন্দ দান করবে।

এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব একমাত্র ধর্মই দিতে সক্ষম, কেননা এগুলো অদৃশ্যের বিষয়। একমাত্র সঠিক ধর্মই এগুলোর ব্যাপারে সত্য বলতে পারে। কেননা এগুলো আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুল প্রেরণ করে অহীর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত'} [বাক্বারাঃ ১২০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {{বলে দিন নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ করেন।} [আলে ইমরানঃ ৭৩]

এজন্যই মানুষের উচিত সঠিক ধর্ম তালাশ করা, ইহা শিক্ষা করা এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যাতে তার সব ধরনের অস্থিরতা দূরীভূত হয়, সব সন্দেহের অবসান ঘটে, সঠিক পথের সন্ধান পায়, এবং সুখ ও মনের শান্তি লাভ করে।

তাহলে এসব প্রশ্নের জবাব কি?

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {{আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংর¶িত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশ্তপিÊে পরিণত করি। তারপর গোশ্তপিÊকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আলাহ কত বরকতময়! এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে।তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনর"খিত হবে। } [মু'মিনুনঃ ১২-১৬]

অতএব, মানুষের সর্বশেষ স্থান ও প্রত্যাবর্তন হলো আল্লাহর কাছে। আল্লাহর এ সৃষ্টি অনর্থক নয় – আল্লাহ পাক কোন অনর্থক কাজ করেন না- বরং এর পিছনে রয়েছে অনেক বড় হিকমত। আল্লাহ পাক বলেনঃ

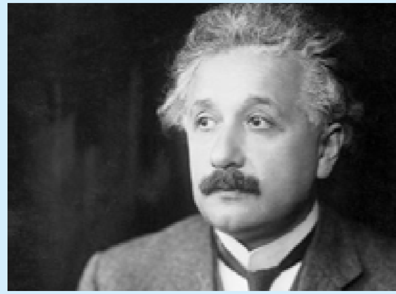
{তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না'?} [মু'মিনুনঃ ১১৫]

অতএব, আল্লাহ তায়া'লা মানুষ ও জীন জাতিকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং কোন শরীক ব্যাতিত একমাত্র তারই ইবাদত করার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন।

আছে সব অর্থেই তাঁর ইবাদত করা, তাঁর ভালবাস অর্জন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে নামাজ, জিকির, জমিন আবাদ, মানুষের উপকার সাধন ইত্যাদি সব ধরনের কাজ করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।} [যারিয়াতঃ ৫৬]

সবমানুষইতাঁরনিকটপ্রত্যাবর্তনকরবে।আল্লাহতায়া'লা বলেনঃ {এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।} [আলে ইমরানঃ ২৮]



সৌভাগ্যকে লক্ষ্য নির্ধারণ কর।

'যদি সুখী হতে চাও তাহলে সৌভাগ্যকে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত না করে তাকে লক্ষ্যে পরিণত কর।"

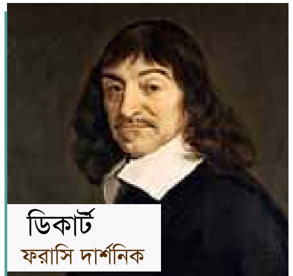
আইনস্টাইন

পদার্থবিজ্ঞানী



মানুষের এ বিশ্বাস জীবনের অনর্থকতাকে দূর করে জীবনের অর্থ প্রদান করে, অন্তরে শান্তি ও সুখ আনয়ন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।} [তুরঃ ৩৫-৩৬]

মানুষ যখন এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য জানতে অক্ষম হয়, তখন সে যদি আল্লাহর সৃষ্ট আসমান, জমিন, গ্রহরাজি, সমগ্র বিশ্বজগত, রাত দিনের পরিক্রমা, জীবন মৃত্যুর ধারাবাহিকতা এবং এ মহাবিশ্বে আল্লাহ পাক আরো যা কিছু সৃষ্টি করেছেন ....ইত্যাদির দিকে তাকায় ও চিন্তা গবেষণা করে তাহলে অবশ্যম্ভাবীভাবে তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তিই তাকে জানিয়ে দিবে যে, এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে একজন মহাস্রষ্টা যিনি সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী, তাঁর সমীপে মাথানত করা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর কাছে প্রতিদান চাওয়া, তাঁর আযাবকে ভয় করা ইত্যাদির তিনিই একমাত্র উপযুক্ত। এমনিভাবে এসব কিছুর চিন্তাভাবনা ব্যক্তিকে সর্বশক্তিমান বিজ্ঞ, মহান স্রষ্টার স্বীকৃতি দানে পৌঁছাবে। এবং এ স্বীকৃতি প্রদানে অনুপ্রাণিত করবে যে, সব পদার্থই আল্লাহর সৃষ্টি, একসময় এগুলোর অস্তিত্ব ছিলনা,পরে তাঁর হুকুমে সৃষ্টি হয়েছে।



ডিকার্ট
ফরাসি দার্শনিক

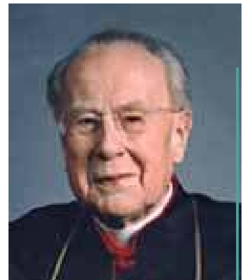
সব কিছুর স্রষ্টা

«আমি বিদ্যমান, তাহলে কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমিতো আমাকে সৃষ্টি করিনি। তাহলে অবশ্যই আমার এক জন সৃষ্টি কর্তা আছেন। আর এ সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বগত হতে হবে, তিনি কোন অস্তিত্ব দানকারী বা অস্তিত্ব রক্ষাকারীর প্রতি মুহতাজ হবেন না। অবশ্যই তিনি সৌন্দর্যের সব গুনে গুণান্বিত হবেন। আর সে সৃষ্টি কর্তাই হলেন, আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা।»

সর্বশক্তিমান মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তায়া'লা বান্দাহর কাছে নিজের পরিচয় দান করেছেন। এ জন্য অনেক দলিল প্রমাণ, মু'জেযা দান করেছেন – যদিও এগুলো দেয়া আল্লাহর জন্য জরুরী ছিলনা- তিনি নিজেকে অনেক পূর্নাঙ্গতার গুনাবলীতে গুণান্বিত করে বর্ণনা করেছেন। আসমানী শরিয়ত, বিবেকের জরুরী চেতনা, ও মানুষের স্বভাবজাত ভাবনায় তাঁর অস্তিত্ব, আধিপত্য , খোদায়ী ও একত্ববাদের উপর প্রমাণ মিলে।যুগে যুগে সব জাতিই এ ব্যাপারে একমত হয়েছে।

সন্তোষ জনক উত্তর

"সাধারণ ভাবে ধর্মের ইতিহাস এবং বিশেষ ভাবে একত্ববাদের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমানই হল জগত ও মানবতার উৎস এবং এ দুটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব প্রশ্নের সন্তোষ জনক উত্তর। সুতরাং এক আল্লাহ ছাড়া মানব জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। সচেতন ভাবে হোক কিংবা অসচেতন ভাবে মানুষের মাঝে সব ধর্মের গন্তব্য হল, এক ইলাহের প্রতি বিশ্বাস।"



কার্ডিনাল কোয়েং
অস্ট্রিয়া এর যাজক প্রধান



তাহলে সে প্রমাণগুলো কি?

১-আল্লাহর দৃশ্যমান মহাবিশ্ব ও এর সুন্দর সৃষ্টিনৈপুন্য

- আপনি কি এ মহাবিশ্ব ও এর মধ্যে বিদ্যমান আকাশ ও জমিন দেখেছেন?!

- আকাশ, গ্রহরাজি ও ছায়াপথ ইত্যাদির সৃষ্টি নিয়ে আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন?

- জমিন ও জমিনের মধ্যে বিদ্যমান নদ-নদী, সমুদ্র,সমতল ও পাহাড় ইত্যাদি নিয়ে কি কখনো চিন্তাগবেষণা করেছেন?!

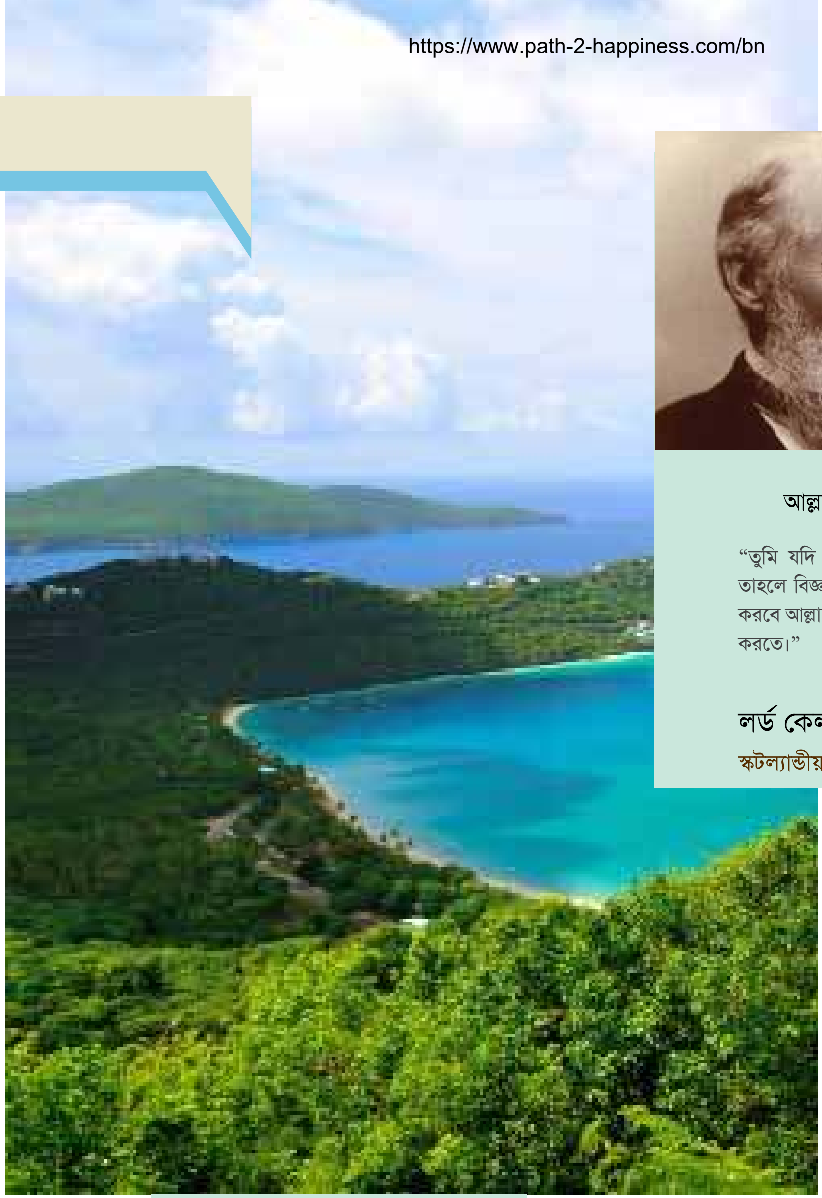
- এ নিখুঁত বিন্যাস ও অনুপম সৃজন কি আপনাকে বিস্ময়াভূত করেনা?!

- আপনার কি ধারণা? কে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্বের কোন নমুনা ছাড়া এত সুন্দর, সুনিপুনভাবে বিস্ময়কর আকৃতিতে তৈরি করেছেন, যা একটি সৌন্দর্য্যের প্রতীক হয়ে আছে ?!

- আপনি কি মনে করেন যে ইহা নিজে নিজেই সৃষ্ট হয়েছে? নাকি এর রয়েছে একজন শক্তিমান মহান স্রষ্টা?!

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।} [আলে ইমরানঃ ১৯০-১৯১]

কখনো কি আপনি নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেছেন? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?} [যারিয়াতঃ২১]





আল্লাহ সত্য

"তুমি যদি গভীর ভাবে ভাব তাহলে বিজ্ঞান তোমাকে বাধ্য করবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে।"

লর্ড কেলভেইন

স্কটল্যান্ডীয় পদার্থবিজ্ঞানী

মানুষ কিভাবে সৃষ্ট হয়েছে? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়েগেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।} [তুরঃ ৩৫-৩৬]

মানুষ যখন এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি - তারা নিজেদেরকে সৃষ্টি করা থাক দূরের কথা বরং আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করেনি- তাহলে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় এ মহাবিশ্ব ও এর ভিতর যা কিছু আছে তার একজন মহান স্রষ্টাআছে, তিনি হলেন আল্লাহ তায়া'লা। এসব দলীল প্রমানের পরেও সে সুনিপুণ আকৃতি দানকারী মহান আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকার কারীদের ব্যাপারে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায়না !!

২- স্বভাব-প্রকৃতি

স্বভাবগতভাবেই নিঃসন্দেহে সৃষ্টজীব তার মহান স্রষ্টাকে স্বীকার করে। যেভাবে স্বভাবগতভাবে তারা কল্যাণকর জিনিস পছন্দ করে আর খারাপ জিনিস অপছন্দ করে। বরং স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করা মানুষের মনে স্বভাবজাতগত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যার জন্য কোন দলীল প্রমাণের দরকার পড়েনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [রূমঃ ৩০]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ "প্রত্যেক ভুমিষ্ঠজাত শিশুই স্বভাবপ্রসূত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে" [বুখারী ও মুসলিম]

স্বভাবগত বোধ

"আমরা যে ইলাহের অস্তিত্ব মানি বস্তু জগতের সাথে তার কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের সীমিত অনুভব শক্তি তাকে পূর্ণভবে বুঝতে সক্ষম নয়। তাই প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে তার অস্তিত্ব প্রমান করার চেষ্টা করা অনর্থক। কারণ, তার ব্যপ্তি প্রকৃতির সীমিত পরিধির বাইরে বিস্তৃত। আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস হল এমন একটি বিশেষ ব্যপার যা মানুষের অনুভবে ও হৃদয়ে অংকুরিত হয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিসরে বেড়ে উঠে।"



রবার্ট মরিস পেইজ

প্রকৃতিবিদ

৩- সব জাতির ঐক্যমতঃ

সৃষ্টির শুরু থেকেই সব জাতি এ ব্যাপারে একমত যে, এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন। সুতরাং একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তায়া'লা এ মহাবিশ্ব কোন অংশীদার ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। কোন জাতিই এ কথা বলেননি যে, আসমান- জমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা বা রিজিকদাতা আছেন। বরং যখনই তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তখনই তারা অকপটে আল্লাহ তাআলার প্রভূত্বকে স্বীকার করে - শিরক সহকারে- । আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। } }[আনকাবুতঃ ৬১-৬৩]



আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্বভাবগত

"স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠা শিশুদের বিবেক তদেরকে তাড়িত করে কোন সৃষ্টি কর্তা ও ইলাহের উপর ঈমান আনতে, বিবর্তনবাদের উপর নয়, যা মানব বুদ্ধির জন্য অস্বাভাবিক , দূর্গ্রাহ্য, ও দূর্বোধ্য। "

গেষ্টন ব্যারেট

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক গবেষক



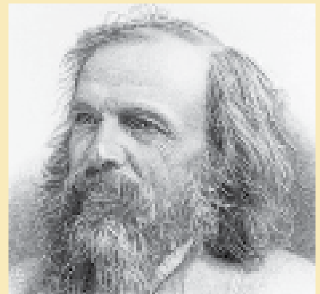
আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ। } [জুখরুফঃ ৯]

তবে নাস্তিকতা ও আল্লাহকে অস্বীকার - যা ইতিপূর্বে খন্ডন করা হয়েছে- অস্বাভাবিকত্ব ও বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র যা নাস্তিকদেরকে জ্ঞানীদের কাতার থেকে পিছিয়ে রেখেছে, পৃথিবীতে এর ব্যর্থতা ও অসারতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

৪- সুস্থ বিবেকের দাবীঃ

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণে উপরোল্লিখিত এ সব দলীল প্রমাণ ছাড়াও মানুষের বিবেকই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, এ সুনিপুণ সৃষ্টি নিজে নিজে হতে পারেনা, এগুলো নতুন সৃষ্টবস্তু, যা একসময় ছিলনা। আর প্রত্যেক নতুন সৃষ্টবস্তুই - সন্দেহাতীতভাবে- একজন স্রষ্টার মুখাপেক্ষী।

এখন নিজেকে একটি প্রশ্ন করুনঃ আপনি জীবনে কতবার বিপদে পড়েছেন? সে সময় আপনি কার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন? কার নিকট আকুতি মিনতি করেছেন? কার নিকট আশা করেছেন যিনি আপনার বিপদআপদ দূর করে



বিবেক বান হও

"কোন বিবেকবান কি কল্পনা করবে বা বিশ্বাস করবে যে, বিবেক ও প্রজ্ঞা বাদে পদার্থ আকস্মিকতার মাধ্যমে নিজেই নিজের অস্তিত্ব দান করেছে?! "

জন ক্লিভল্যান্ড কোথ্রযান

ডোলাথ ভার্সিটির প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক



দর্শন ও ধর্ম

“স্বল্প দর্শন মানুষকে নাস্তিকতার কাছে নিয়ে যায়, আর দর্শনের গভিরতা তাকে ধর্মের কাছে ফিরিয়ে আনে। “

ফ্রান্সিস বেকন
ইংরেজ দার্শনিক



দিবেন?! আল্লাহ পাক বলেনঃ {যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।} [যুমারঃ ৮]

আল্লাহ পাক বলেনঃ {তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায় ভাবে। হে মানুষ! শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও-অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে।} [ইউনুসঃ ২২-২৩]

আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ {যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।} [লোকমানঃ ৩২]

আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ

যখন একথা সুস্থ স্বভাব ও বিবেকে স্থিতিশীল হলো যে, এ মহাবিশ্বের একজন প্রতিপালক আছেন, এসব সৃষ্টজীবের একজন স্রষ্টা আছেন, তাহলে আল্লাহর প্রতিপালনের ব্যাপারে সবাই একমত হলো, তাঁর একচ্ছত্র প্রতিপালকত্বে সবাই মাথানত করল। এ প্রতিপালকত্ব ঘোষনা করে যে, তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, তাঁর কোন শরিক নেই। এ ব্যাপারে অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু হলোঃ

১. কিভাবে এ মহাবিশ্বের দু'জন ইলাহ থাকবে?!!

মানুষের বিবেক সর্বদা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এ বিশ্বে একজনই মাত্র ইলাহ আছেন। নতুবা যদি দুজন বা একাধিক ইলাহ থাকত - তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হলে- তাহলে প্রশ্ন দেখা দিতঃ যখন দুজনের মতে বিরোধ দেখা দিবে, বা দুজনই তাঁর নিজের ইচ্ছা পূরন করতে চাইবে তখন কি হবে? একজন একটি আদেশ দিবে আর অন্যজন এর বিপরীত আদেশ দিবে?! তখন একজনকেঅন্যজনের উপর জয়ী হতে হবে। আর একজন জয়ী হলে অন্যজন স্বাভাবিকভাবেই অক্ষম হবেন। আর একজন অক্ষম ব্যক্তি কি ইলাহ হতে পারেন? তাহলে একথা প্রমাণিত হলো যে, এ মহাবিশ্বে একজনই ইলাহ আছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আলাহ কোন সš—ান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। [যদি থাকত] তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বি—ার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আলাহ কত পবিত্র!} [মু'মিনুনঃ ৯১-৯২]

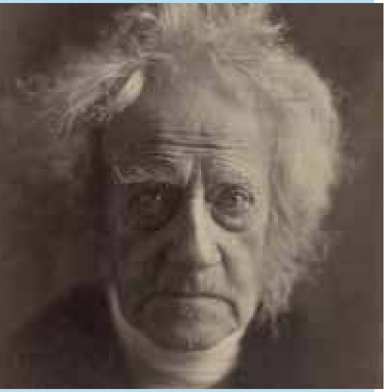
২. এটা অবশ্যই আশ্চর্যজনক যে, মানুষ অক্ষম ও শক্তিহীন কোন কিছুর ইবাদত করবেযে আসমান জমিনের মালিক নয় এবং কিছুই সৃষ্টি করেননি, আর যে নিজের ভাল মন্দেরই মালিক নয়- অন্যদের ভাল মন্দের কথা বাদই দিলাম- জীবন মৃত্যুর ও পুনরুত্থানেরও সে মালিক নয়।



আর আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

“ইস্রাইলের প্রভু, তার ত্রানকর্তা ও সৈন্যদের প্রতিপালক রব এরূপ বলেনঃ আমিই প্রথম, আমিই শেষ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।” [ইশাইয়ার 44: 6]

ওল্ড টেস্টামেন্ট [তওরাত]



হার্শেল
ব্রিটিশ দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ

আল্লাহর একত্ব

"জ্ঞানের পরিধি যত প্রশস্ত হবে ততই অধিক পরিমাণে সুনিশ্চিত প্রমান পরিস্ফুট হবে, যা প্রমান করবে একটি সর্বময় শক্তির অধিকারী সৃজনকারি প্রজ্ঞার অস্তিত্ব। ভূতত্ত্ববিদ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও গণিতবিদগণ তাদের সকল প্রচেষ্টা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে স্রষ্টার বানী উঁচু করার জন্য জ্ঞানের উপাসনালয় তৈরী করতে যা প্রয়োজন তা প্রস্তুত করছে। "

আল্লাহ পাক বলেনঃ {পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়, তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে। তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনের ও তারা মালিক নয়।} [ফুরকানঃ ১-৩]

তা নাহলে মুশরিকরা যেভাবে বলে যে, আল্লাহর সাথে কতিপয় ইলাহ আছেন যাদের ইবাদত করা হয় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ও তারা আল্লাহর নিকট শাফায়াত করবেন। তাহলে সেসব ইলাহগণও আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা করে, তাঁর নিকট ওসিলা কামনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার পথ অন্বেষন করত। তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্বে।} [বনী ইসরাঈলঃ ৪২-৪৩]

বরং তিনি এক ও একক আল্লাহ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কাউকে জন্ম দেননি, আর কারো থেকে জন্ম লাভও করেননি, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

আর এ সব মা'বুদ্গণ কোন কিছুরই মালিক নয়, তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।} [সাবাঃ ২২-২৩]

অর্থাৎ হে রাসুল! যারা আল্লাহর সাথে উপকার বা ক্ষতি সাধনে অক্ষম অন্য সব সৃষ্টজীবকে শরীক করে, তাদেরকে সেসব শরীকের অক্ষমতা ও সেসবের ইবাদাতের ভ্রান্তি প্রকাশ করে বলুনঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক মনে কর তাদেরকে ডাক, যদি মনে কর তাদেরকে ডেকে কোন লাভ হবে। কেননা তাদের মধ্যে অক্ষমতা ও ডাকে সাড়া না দেয়ার সব ধরনের উপাদান বিদ্যমান।কারণ, তাদের সামান্যতম ক্ষমতাও নেই, তাই তারা আসমান ও জমিনের অণু পরিমান জায়গারও স্বতন্ত্র বা অংশীদারি কোনভাবেই মালিক না। তোমাদের তথাকথিত শরীকদের আসমান ও যমীনে সামান্যতম মালিকানা বা অংশীদারীত্বও নেই। এখন বাকি রইল যারা বলেঃ আমরা তাদের উপাসনা করি কেননা তারা প্রভুর সাহায্যকারী, সহযোগী উজির নাযির ইত্যাদি, তাই তাদের দোয়া কাজে আসে। কেননা - মালিকের তাদের দরকার পড়ে- প্রত্যেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহ তায়া'লা তাদের এ সব ভ্রান্ত ধারণা নস্যাৎ করে বলেনঃ {তার নেই } অর্থাৎ পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়া'লার নেই তাদের থেকে} অর্থাৎ সে সব উপাস্যদের থেকে {সাহায্যকারী }অর্থাৎ তার মালিকানায় ও পরিচালনায় কোন সাহায্যকারী।

৩-এ মহাবিশ্ব ও এর সুবিন্যাস্ত সুন্দর বহমানতা ও পরিচালনার দিকে তাকালে সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী এক আল্লাহর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।} [বাকারাঃ ১৬৩-১৬৪]

এ সুবিন্যাস্ত ও নিয়মতান্ত্রিক পরিচালনা যা সারা জীবন ধরে চলে আসছে, যাতে কোন ত্রূটি দেখা দেয়নি, এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যায়নি, যদি থেমে যেত তবে এ মহাবিশ্ব নিমিষে ধবংস হয়ে যেত। এ সব কিছু একমাত্র মহাশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এ চমৎকার সৃষ্টিকারী ও পরিচালনাকারী কি একজন নয়? যা কোন শরীক নেই। এসব কিছুতে জ্ঞানীদের কাছে কি এটা স্পষ্ট ও স্থায়ীভাবে প্রমাণিত হয়না যে, দু'জন বা একাধিক ইলাহ থাকা অসম্ভব?!



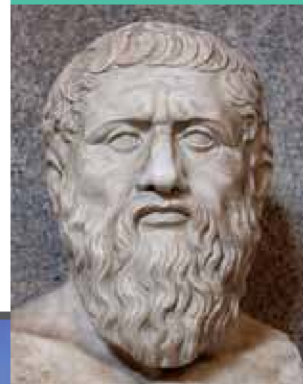
আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।} [আম্বিয়াঃ ২২]

অর্থাৎ আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত যদি একাধিক ইলাহ থাকত তাহলে উহা ধবংস হয়ে যেত। ধবংস হয়ে যেত এর মধ্যকার সব সৃষ্টি। কেননা বিশ্বব্রহ্মান্ড -আমরা যা দেখি- সর্বোচ্চ সুনিয়ন্ত্রিত ও চমৎকারভাব সুবিন্যাস্ত। এতে সামান্যতমও ত্রূটি নেই। কোন আপত্তি ও বৈপরিত্য নেই। এতে প্রমাণ করে যে, এর পরিচালক একজন। প্রতিপালক একজন, উপাস্য একজন। যদি এর দুজন বা ততোধিক পরিচালক বা প্রতিপালক থাকত তাহলে পরিচালনায় ত্রূটি দেখা দিত। এর মূলভিত্তিগুলো ধবংস হয়ে যেত। কেননা তখন একে অন্যের সাথে বিরোধ দেখা দিত। এক ইলাহ চাইত এক ধরনের আর অন্যজন চাইত অন্য ধরনের। আর দুজনেরই ইচ্ছা পূরণ করাও অসম্ভব। আবার শুধু একজনের ইচ্ছা পূরণ হওয়া অন্যজনের অক্ষমতা ও দুর্বলতার প্রমাণ। আবার সব বিষয়ে দুজনের এক হওয়াও অসম্ভব। অতএব এটাই অবধারিত যে, একমাত্র যে মহা ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় সব কিছু সৃষ্টি হয় , যার কোন শরীক নেই তিনিই হলেন একমাত্র সর্সক্তিমান আল্লাহ।



সর্বোচ্চ লক্ষ্য

"এই জগত যেভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে এতে কোন কিছুই আকস্মিকতা নির্ভর নয়। বরং এর প্রতিটি অংশ একটি লক্ষ্যমুখী। সে লক্ষ্যটিও তার উর্ধের আরেকটি লক্ষ্যমুখী। এভাবে সর্ব শেষ একটি একক লক্ষ্যে উপনীত হয়।"



প্লেটো
গ্রীক দার্শনিক

৪- হরত আদম [আলাইহিস সালাম] থেকে শুরু করে, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ [আলাইহিমুস সালাম] সহ সব নবী রাসুলগণ - তারা হলেন পুতঃপবিত্র আত্মা, দূরদর্শী জ্ঞানী, সত্যবাদি, সঠিকভাবে আমানতের সাথে দাওয়াত দানকারী, পরিপক্ক ও পরিশোধিত ব্যক্তিবর্গ- তারা সকলে আল্লাহর একত্ববাদ এবং আল্লাহ ছাড়া যে কোন ইলাহ নেই এ ব্যাপারে একমত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।} [আম্বিয়াঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা নূহ [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।} [আ'রাফঃ ৫৯]

আল্লাহ তায়া'লা ঈসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।} [মায়েদাঃ ৭২]

তিনি মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] কে তাঁর জাতিকে বলার নির্দেশ দিয়েছেনঃ {বলুনঃ আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাংতোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে?} [আম্বিয়াঃ ১০৮]



প্রভু এক

"প্রভু হলেন ঐ ইলাহ যিনি ছাড়া আর কেউ নেই।" [দ্বিতীয় বিবরণ৪/৩৫] আমিই প্রভু, অন্য কেহ নয়। আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।" [ইশাইয়ার45/5]

ওল্ড টেস্টামেন্ট [তাওরাত]

অতএব জ্ঞানীদের কর্তব্য হলো আম্বিয়া কিরামদেরকে অনুসরণ করা, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা এবং প্রতিপালক ও ইলাহ হিসেবে তাঁর উপর ঈমান আনা;যাতে তারা দুনিয়া ও আখেতারে সফলতা ও শান্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [নাহলঃ ৯৭]

ঈমানের সাথে সৎ কাজের প্রতিদান হলো এ পৃথিবীতে উত্তম জীবন লাভ। উত্তম জীবনের অর্থ এ নয় যে খুব সম্পদশালী হবেন, কখনো কখনো সম্পদশালী হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। কেউ অঢেল ধন সম্পদ ছাড়াও উত্তম জীবন পেতে পারে। কেননা জীবনকে উত্তম করতে ধন সম্পদ ছাড়াও অনেক কিছু আছে। তন্মধ্যেঃ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাঁর উপর আত্মবিশ্বাস ও ভরসা করা, তাঁর পর্যবেক্ষণ, হেফাযত ও সন্তুষ্টিতে নিজেকে নিরাপদ ও শান্ত মনে করা। এমনিভাবে উত্তম জীবনের অন্তর্ভুক্ত হলো সুস্বাস্থ, শান্তি, পরিতুষ্টি, গৃহে প্রশান্তি, অন্তরের ভালবাসা। এতে আরো রয়েছে, সৎ কাজের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করা এবং ব্যক্তির অন্তরে ও জীবনে এর প্রভাব। ধন সম্পদ জীবন সৌন্দর্যের একটি উপাদান মাত্র। {ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।} [কাহাফঃ ৪৬]

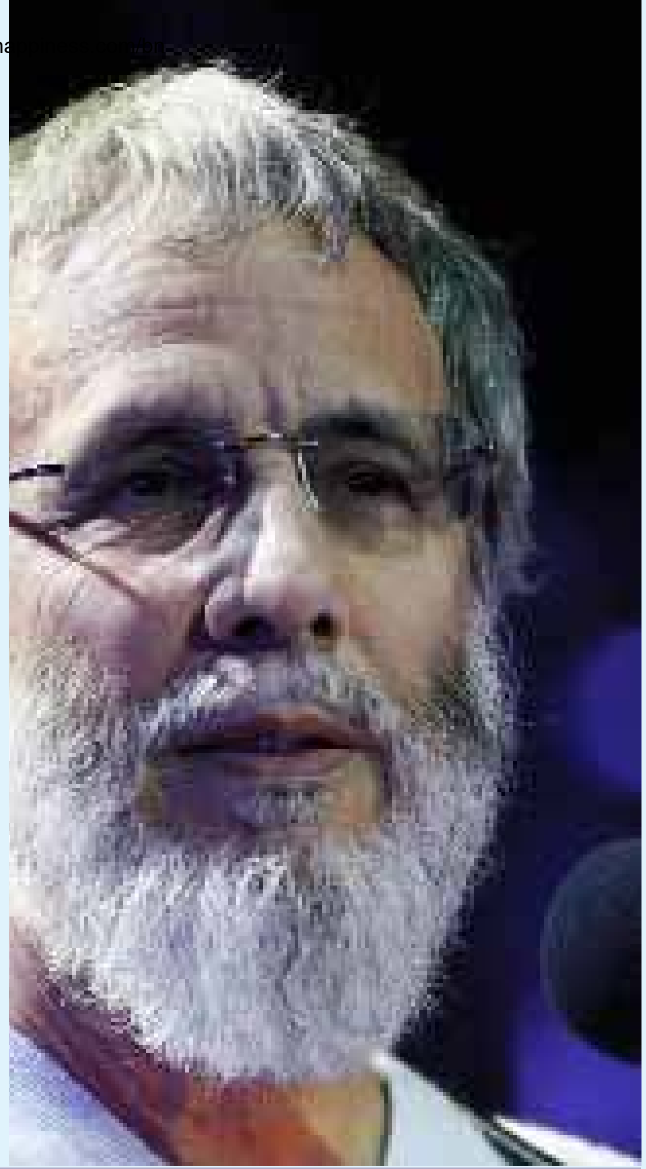
অন্তর যখন আল্লাহর নিকট যা অধিক মহান, পুতঃপবিত্র ও স্থায়ী তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে তখন উত্তম জীবনের ও শান্তির অন্য অর্থ দেখতে পাবে।

আর যদি মানুষ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে সে একাধারে দুর্দশা ও দুর্বিপাক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য থাকে। কখনো তার দুশ্চিন্তা, পেরেশানী এমন পর্যায় পৌঁছে যায় যে, তখন মনের সব আশা শেষ হয়ে যায় ও জীবনে

বাইবেল

"তোমার ইলাহ যে প্রভু শুধু তাকে সেজদা কর এবং সুধু তারই এবাদত কর।"। ম্যাথু 4:10, লুক 4: 8।" আর এটাই হলো চিরস্থায়ী জীবন [ইউহোন্না১৭/৩]

ইলাহ এক



সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক

"আমি আগে সৌভাগ্য খুঁজে পাইনি। যখন থেকে কোরআন পাঠ করা শুরু করলাম বিস্ময়ের সাথে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম, মানুষ কেন এ দুনিয়ায় বিপথে চলে? অথচ, পথ প্রদর্শক তো তাদের সামনে, আলো তো তাদের সামনে!

স্টিভেন্স
ইংরেজ গায়ক

বেঁচে থাকার অর্থ হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

{অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে।} [আন'আমঃ ১২৫]

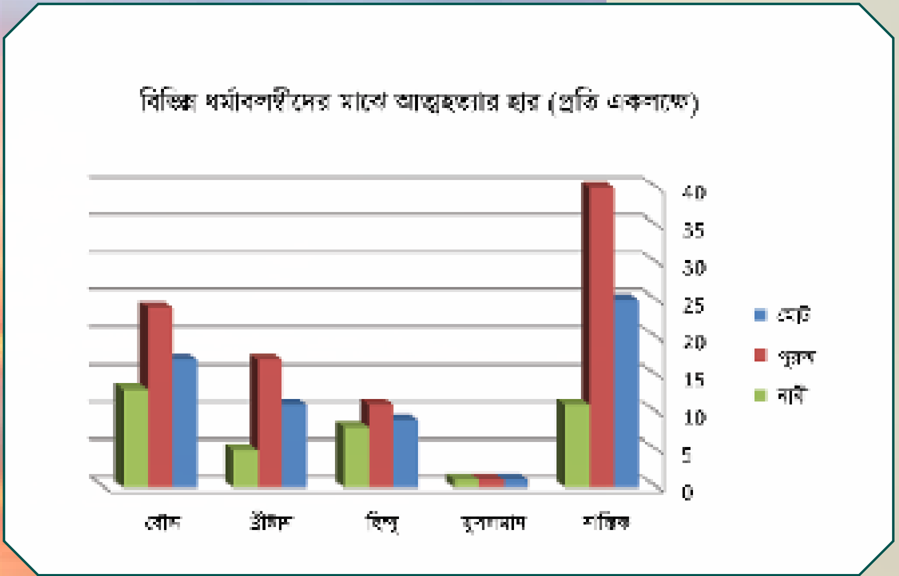
যে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, যার কোন শরিক নেই, তার অন্তরকে আল্লাহ তায়া'লা প্রশস্ততা, আরাম ও প্রশান্তির দ্বারা ভরে দেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার অন্তরকে সংকীর্ণ, অস্থির, উদ্বিগ্ন ও জটিল করে দেন, -আল্লাহ আমাদেরকে এ সব থেকে হেফাযত করুন-। এ উদাহরণ যারা এক আল্লাহ তায়া'লায় ঈমান আনে, আর যারা তার সাথে শরিক করে তাদের জন্য। আল্লাহ পাক আরেকটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেনঃ {আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন-তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।} [যুমারঃ ২৯]

মুশরিক হলো উক্ত ব্যক্তির ন্যায় যার হিংস্র চরিত্রের ও কঠোর স্বভাবের

একাধিক মালিক রয়েছে, তারা তাকে নিয়ে পরস্পর বিরোধ করে। একজন বলেঃ এদিকে এসো, অন্যজন বলে, বসে থাক, তৃতীয়জন বলে, দাঁড়িয়ে থাক। সে তাদের আদেশে হয়রান, দিশেহারা। তার দৈহিক ও আত্মিক কোন ধরনেরই শান্তি নাই। অন্যদিকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হলো একজন নিরাপদ ব্যক্তি যাকে এক মালিকই আদেশ ও নিষেধ দেয়, ফলে কোন বৈপরিত্য দেখা দেয়না। এ দুজনের অবস্থা কি সমান? অতএব সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়া'লার, যত গুনকীর্তন একমাত্র তারই, তিনি মহান, তিনি এক প্রতিপালক, এক ইলাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ বা রব নেই। আর যারা একথা জানেনা বা বিশ্বাস করেনা তারা অন্তর্দন্ধ নিয়া বাস করে। এর সাথে আছে দুশ্চিন্তা দুর্দশা, বিষন্নতা, হয়রানি মোহাবিষ্টতা ও আত্মহননের প্রবনতা ।

ধর্ম ও আত্ম হত্যা

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার [WHO] দুই জন বিশেষজ্ঞ ডঃ জোস ম্যানুয়েল ও মহিলা গবেষক এলিসাভ্রাফ্লীশম্যান আত্ম হত্যা ও ধর্মের সম্বন্ধ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন। জাতী সংঘের তথ্য সূত্রের মাধ্যমে প্রামাণিত তাদের গবেষণার ফল নিম্নরূপঃ A global perspective in the epidemiology of suicide





মানব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি... হিকমত, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

সূচিপত্র

মানব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি... হিকমত, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য



মানব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি... হিকমত, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

আপনি কি কোন দিন মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে দেখেছেন?!

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সবচেয়ে উপযোগী পন্থা। এতে মানুষের মনে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। স্রষ্টার মহত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও হিকমত জানা যায়। আল্লাহ তায়া'লা আসমান জমিন যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি কোন কিছু নিরর্থক কিছু সৃষ্টি করেন না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[আল্লাহ যথার্থরূপে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে]।} [আনকাবুতঃ ৪৪]

এ ধরায় কত যে বিচিত্র প্রাণী রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবেনা। এ সব কিছু সৃষ্টির পিছনে কি হিকমত আছে বলে আপনি কি মনে করেন?! এ মহাবিশ্বে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে যা আল্লাহর কুদরত ও তাঁর মহিমা প্রমাণ করে। আধুনিক বিজ্ঞান এখনো অনেক নতুন নতুন নিদর্শন আবিষ্কার করছে যা মানুষকে মহান সুনিপুণ প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা আল্লাহর মহিমা বুঝিয়ে দেয়।

মানুষ যদি এ মহাবিশ্ব ও এর ভিতরে যা কিছু আছে তা নিয়ে একটু চিন্তা করে এবং গভীরভাবে গবেষণা করে তবে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, এ বিশ্ব অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে সুবিন্যস্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী ইলাহ তা সৃষ্টি করেছেন, তিনি একে উত্তমরূপে সুপরিমিতভাবে বানিয়েছেন।



কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক

"আমি যখন মহা শূন্যের কিছু নতুন ছবি দেখলাম তখন আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, আমি চিৎকার করে বলেছিলাম, হায় আল্লাহ! কাজ সম্পূর্ণ সফল। আমার জীবনের শপথ, ব্যাপারটা খুবই চমৎকার!!"

পল মর্ডেন

হায় আল্লাহ!

এ মহাবিশ্বের আকাশ, আকাশের তারকারাজি, গ্রহ নক্ষত্র ও ছায়াপথ আর জমিনে যা কিছু আছে ও যে সব নদ নদী, খাল বিল, পাহাড় পর্বত, পশুপাখি , গাছপালা ইত্যাদিযা কিছু মহান আল্লাহ তায়া'লা অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, এসব নিয়ে চিন্তা করলেই আমরা আল্লাহর কুদরত, জ্ঞান, প্রজ্ঞা বুঝতে সক্ষম হই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{[কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়। আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে]।} [আম্বিয়াঃ ৩০-৩৩]

জ্ঞানীলোক যখন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে এ বিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহর ইবাদত করে। সব সৃষ্টজীব আল্লাহর পবিত্রতা বর্ননা করে ও গুনকীর্তন করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমন্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমন্ডলে]।} [জুম'আঃ ১]

তারা সকলে আল্লাহর মহিমার সামনে সিজদাবনত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।} [হাজ্বঃ ১৮]

এমনিভাবে সব সৃষ্টজীব মহান আল্লাহ তায়া'লার তাছবিহ পাঠ করে, তাঁর প্রতি বিনীত হয়ে তারই প্রশংসা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখ না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।} [নুরঃ ৪১]

অন্যদিকে মু'মিন ব্যক্তি দেখতে পায় যে, মহাবিশ্ব একটি কাফেলার মত একই দিকে চলমান, আল্লাহ তায়া'লার দিকে চলছে। ফলে সেও এ চলমান পবিত্র কাফেলার সাথে ঐকতানে চলে। এতে তার জীবন আনন্দময় হয় এবং তার বিবেক ও অনুভূতি স্থীর হয়।





ইলাহের একটি দলিল

“আমাদের গ্রহের অবলোকন ছিল ঐশী আভাস।”

এডগার মিশেল

চাঁদে ষষ্ঠ বিচরণকারী

এটা আল্লাহর সৃষ্টি!!

“এটা দেখা মাত্র অবশ্যই মানুষের মাঝে পরিবর্তন আসবে যে আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর ভালবাসাকে মূল্যায়ন করবে” তখন তিনি আলোচনা করেছিলেন জগত নিয়ে।

জেমস আরউইন

মহাকাশচারী





আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে মর্যাদা প্রদান

“ইসলামই হল আল্লাহ তায়ালার বিধান, আমাদের চার পাশে প্রকৃতির মাঝে তা আমরা দেখতে পাই। এক মাত্র আল্লাহর নির্দেশে পাহাড় সমুদ্র গ্রহ নক্ষত্র বিচরণ করে এবং নিজ কক্ষ পথে সঠিক ভাবে পরিচালিত হয়। এ গুলো তাদের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহর নির্দেশের অধীন। এমনিভাবে এই জগতের প্রতিটি অনু এমনকি জড় বস্তুও এ নিয়মের অধীন। ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন। তাই ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর বিধানে চলতে পারে, ইচ্ছা করলে নিজে নিজের বিধান রচনা করবে এবং নিজের পছন্দের দীনের উপর চলতে পারে। দুঃখের বিষয় হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করেছে। “

ডেবোরা পটার

আমেরিকান সাংবাদিক



মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যঃ

১- আল্লাহ তায়া’লার একত্ববাদের প্রমাণঃ

এ সুবিশাল মহাবিশ্ব, এর মধ্যকার সকল সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ আল্লাহর মহিমা ও কুদরত এবং তাঁর সুনিপুণ সৃষ্টির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ সব কিছুই আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করে এবং প্রমাণ করে যে, তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই, কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে,তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। আর এক নিদর্শন এই যে,তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আর ও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শনঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শনঃ তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। নভোমন্ডলে ও ভুমন্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।} [সূরা রূমঃ২০-২৬]

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেনঃ {বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ না ওরা-তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি;



অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়। বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। } [সূরা নামলঃ৫৯-৬৪]



২- মহাবিশ্বকে মানুষের আয়ত্ত্বাধীন করাঃ

আল্লাহ তায়া'লা বস্তুগত জিনিসের পূজা অর্চনা থেকে মানুষকে মুক্তি দান করেছেন। এ ধরায় যা কিছু আছে, আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুকে মানুষের অধীনস্থ ও আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন। এ সব কিছুই মানুষের জন্য তাঁর দয়া ও মমতা। তিনি জমিন আবাদ ও তাতে মানুষের পূর্ণ খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ সব কিছু করেছেন। অন্যদিকে মানুষ যেন তাঁর পরিপূর্ণ ইবাদাতের উপযুক্ত হয়। এখানে অধীনস্থ বলতে দুটো অর্থ বুঝায়ঃ আল্লাহকে জানা এবং তাঁর দয়া মমতা, সম্মান ও মর্যাদা বুঝার জন্য অধীনস্থ করা। অন্যটি হলোঃ অধীনস্থ বলতে মানুষের মর্যাদা অন্যান্য সব প্রাণী ও জিনিসের উপরে বুঝানো। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। } [জাসিয়াঃ ১৩]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। } [ইবরাহিমঃ ৩২-৩৪]

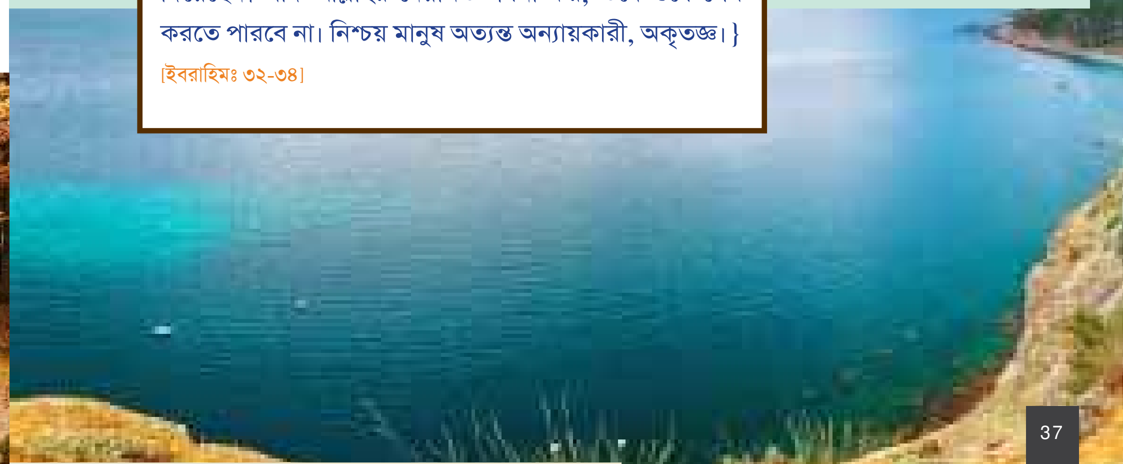
নবুয়তের আলামত

"মুর্খ সমাজে বেড়ে ওঠা নিরক্ষর মুহাম্মাদ কিভাবে জগতের অলৌকিক বিষয় গুলো জানতে পেরেছিল? যা আল কোরআন বর্ণনা করেছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, অবশ্যই তা আল্লাহর কালাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

ডেবোরা পটার

আমেরিকান সাংবাদিক







৩- যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও

মানুষের সৃষ্টির কথা বাদ দিলেও আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। কোন কিছু পুনঃরায় সৃষ্টি করা কি প্রথম বারের সৃষ্টির তুলনায় সহজ নয়ঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ।} [রুমঃ ২৭]

বরং আসমান জমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির তুলনায় অনেক সঠিনতম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।} [গাফিরঃ ৫৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।} [রা'দঃ ২]

সত্য একটিই

"এ ধরনের সৃষ্টি দেখেও তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে না এটা অসম্ভব! এ সৃষ্টি তো আমার ঈমানকে আরো মজবুত করেছে। আমি এ চিত্রের আরো কিছু বিবরণ চাই।"

জন গ্লেন

প্রথম আমেরিকান মহাকাশচারী



মহাবিশ্বে আপনার অবস্থান কোথায়

"এটি একটি ছায়া পথের বৃহৎ সমগ্রের চিত্র। এর একটিতে বা এক বিন্দুতে অবস্থিত আমাদের সৌর জগত। তবে আমাদের ছায়াপথে আছে ১০০০০০০০০০০০টিরও বেশী সূর্য। আর সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩০০০০০ গুন বেশী বড়। আর পৃথিবী তোমার ঘর থেকে -তোমার ঘরের আয়তন যদি ৫০০মিটার হয়- ১০২০১৪৪০০০০০০ গুন বড়। আর তোমার ঘর তোমার থেকে কত গুন বড়?!"



সমুদ্রের মধ্যে একটি বিন্দু

"এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হল, VYCanisMajoris আমাদের থেকে এর দুরুত্ব ৫ হাজার আলোক বর্ষ। সূর্য থেকে ৯২৬১০০০০০০ গুন বড়। অর্থাৎ ৯ বিলিয়ন ২৬১ মিলিয়ন গুন বড়। আর সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩০০০০০০ গুন বড়!!!"

মানুষের সৃষ্টি ও তার সম্মান:

এ মহাবিশ্ব, আসমান ও জমিন মানুষের তুলনায় অনেক বড় হওয়া সত্বেও আল্লাহ তায়া'লা এগুলোকে মানুষের অধীনস্থ ও অনুগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে।} [জাসিয়াঃ ১৩]

আর এসব কিছু তিনি করেছেন সমস্ত মাখলুকাতের উপরে মানুষের মর্যাদা দিতে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।} [বনী ইস্রাইলঃ ৭০]

আল্লাহ তায়া'লা মানুষ সৃষ্টি করেছেনএবং আমাদেরকে আদম [আঃ] কে সৃষ্টির কাহিনী ও তাকে সম্মানের কথা শুনিয়েছেন। অতঃপর জান্নাত থেকে শয়তানের প্ররোচনায় তাঁকে জমিনে পাঠানো, তার অপরাধের কথা অতঃপর তার তাওবা কবুল করার ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ



{আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলছি- আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ

সকল মানুষ সমান

"প্রতিটি মানুষ জন্ম গ্রহণ করে স্বাধীন অবস্থায়। মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সবাই সমান। সবার আছে একটি বিবেক ও একটি হৃদয়। তাদের উচিৎ একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব পূর্ণ হৃদ্যতার আচরণ করা।"

মানবাধিকার সংস্থার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের প্রথম ধারা

করল? সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ট। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেনঃ তোকে সময় দেয়া হল। সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথেচলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়োনা তাহলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ বললেনঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা এক অপরের শত্রু তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। বললেনঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরন করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।} [আ'রাফ ১১-২৫]



আমাদের বার্তা

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার যাকে ইচ্ছা হয় তাকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়ার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসা এবং সব ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়ের দিকে নিয়ে আসার জন্য।"

রেবয়ী বিন আমের
রাসূলুল্লাহ [সাঃ] এর সাহাবী

তিনি মানুষকে উত্তম আকৃতি দিয়ে বানিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাতে রূহ ফুঁৎকার করেছেন, ফলে সুন্দর অবয়বে মানুষ সৃষ্টি হলো। সে শোনতে পায়, , দেখতে পায়, নড়াচড়া করতে পারে ও কথা বলতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।} [মু'মিনুনঃ ১৪]

যা কিছু জানার প্রয়োজন, তার সব কিছুই তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে এমন কিছু গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী দান করেছেন যা তিনি অন্য কোন প্রাণীকে দান করেননি। সেগুলো হলোঃ বিবেক, জ্ঞান বুদ্ধি, বর্ণনাশক্তি, কথা বলা, সুন্দর ও উত্তম চেহারা সুরত, মর্যাদাবান রূপ আবয়ব, সুঠাম দেহ ও চিন্তা গবেষণা দ্বারা জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি। তিনি তাদেরকে উত্তম চরিত্র ও ভাল গুনাবলীর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, তাদেরকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর সম্মানিত করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলের জন্য এ সম্মানের অন্যতম নিদর্শন হলো: আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মানব আদম [আঃ] কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?} [ছোয়াদঃ ৭৫]



আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতর অবয়বে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।} [ত্বীনঃ ৭]

তিনি আরো বলেনঃ {তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।} [তাগাবুনঃ ৩]





কোন মাধ্যম নেই

"এখানে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল, মানুষ ও তার প্রতিপালকের মাঝে মাধ্যম না থাকা। আর তা পেয়েছে কার্যকারী বুদ্ধির আধিকারিরা।"

ডিনেট

ফরাসি চিত্রশিল্পী এবং চিন্তাবিদ

আল্লাহ তায়া'লা আদম [আঃ] কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেনঃ {স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল।} [বনী ইসরাইলঃ ৬১]

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে বিবেক, চিন্তাভাবনা শক্তি, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টশক্তি ও অন্যান্য অনুভূতি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।} [নাহলঃ ৭৮]

আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে তাঁর রূহ হতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এভাবে তাদের মাঝে উন্নত আত্মা বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো।} [ছোয়াদঃ ৭২]

ইহা মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান, এজন্যই মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করতে হয়। অতএব, যার মধ্যে মহান আল্লাহ পাকের রূহের ফুঁৎকার রয়েছে তাঁর উপরে সীমালঙ্ঘন করা কিভাবে সমীচীন হবে?!!। তিনি ফেরেশতা ও জীন জাতিকে বাদ দিয়ে মানুষকে জমিনের বুকেখলিফা বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।} [বাকারাঃ ৩০]

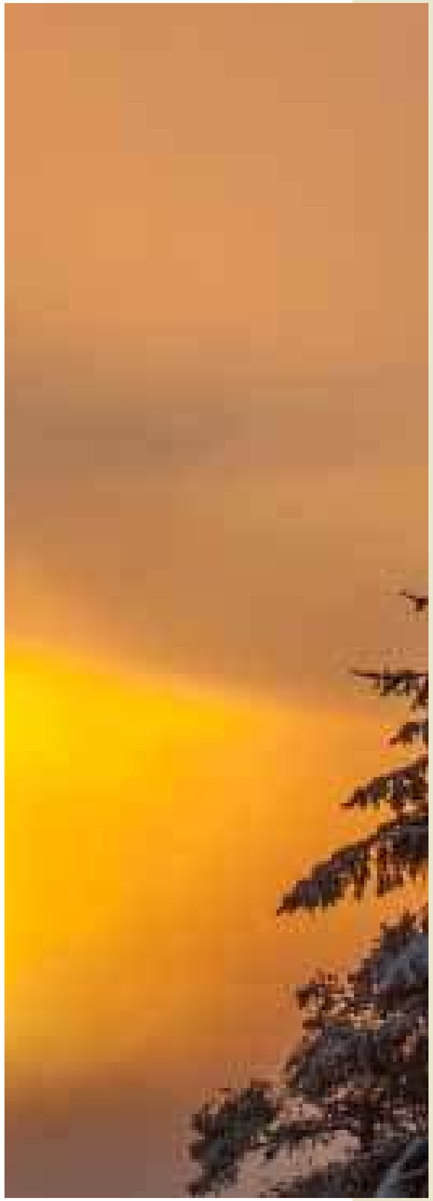
ইহা মানুষের জন্য এক মহা সম্মান যা সেসব ফেরেশতারাও পায়নি যারা আল্লাহ তাআলার আদেশের অবাধ্য হয়না এবং সদা সর্বদা আল্লাহর তাসবিহ তাহলীল ও জিকিরে মশগুল থেকে।

-আল্লাহ তায়া'লা এ মানুষের জন্য আসমান ও জমিনের সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। এর মধ্যকার চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ নক্ষত্র, ছায়াপথ নিহারীকা ইত্যাদি সব কিছু মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{

{এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [জাসিয়াঃ ১৩]



মাখলুকাতের যতই মর্যাদা হোক না কেন, সে যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, নিষেধ করেছেন। ইহা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা। যেহেতু তিনি তাকে মানুষের দাসত্ব হতে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে এসেছেন। অতএব আল্লাহর এ ইবাদত ও দাসত্ব অন্যের ইবাদত ও দাসত্ব হতে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা লাভ। এজন্যই তিনি তাঁর ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোন কোন মানুষ বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে ওসিলা বা মাধ্যম স্থির করেছে এবং সে মাধ্যমকে তারা ইলাহের কিছু গুণে গুণান্বিত করেছে। এজন্যই আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানিত করেছেন এভাবে যে, মানুষ ও আল্লাহর মাঝে কোন মধ্যস্থতা নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।} [তাওবাঃ ৩১]



বস্তুগত উপকরণাদি গ্রহনের সাথে সাথে তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে শংকা, উদ্বেগ, হতাশা ও বিষন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। তাকদীরের উপর বিশ্বাসের ফলে ঈমানদারলোক নিরাপদ ও নিরাপত্তায় থাকে, সম্মান ও মর্যাদার অনুভূতি নিয়ে থাকে। আর কোন কিছু হারালে যতক্ষণ সে উপকরণ অবলম্বনে অবহেলা করেনা ততক্ষণ সে দুঃখ-চিন্তাগ্রস্থ বা নিরাশায় পতিত হয়না। কেননা এ সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।} [হাদীদঃ ২২]

মু'মিনের এ বিশ্বাস তাকে আত্মিক সমতা, প্রকৃত স্থিরতা ও অনেক প্রশান্তি দান করে। কেননা কোন বালা মুসিবত তাকে প্রভাবিত বা আতংকিত করতে পারেনা। যেমনিভাবে কোন নেয়ামত ও খুশি তাকে অহংকারী ও ঔদ্ধত্য করেনা।

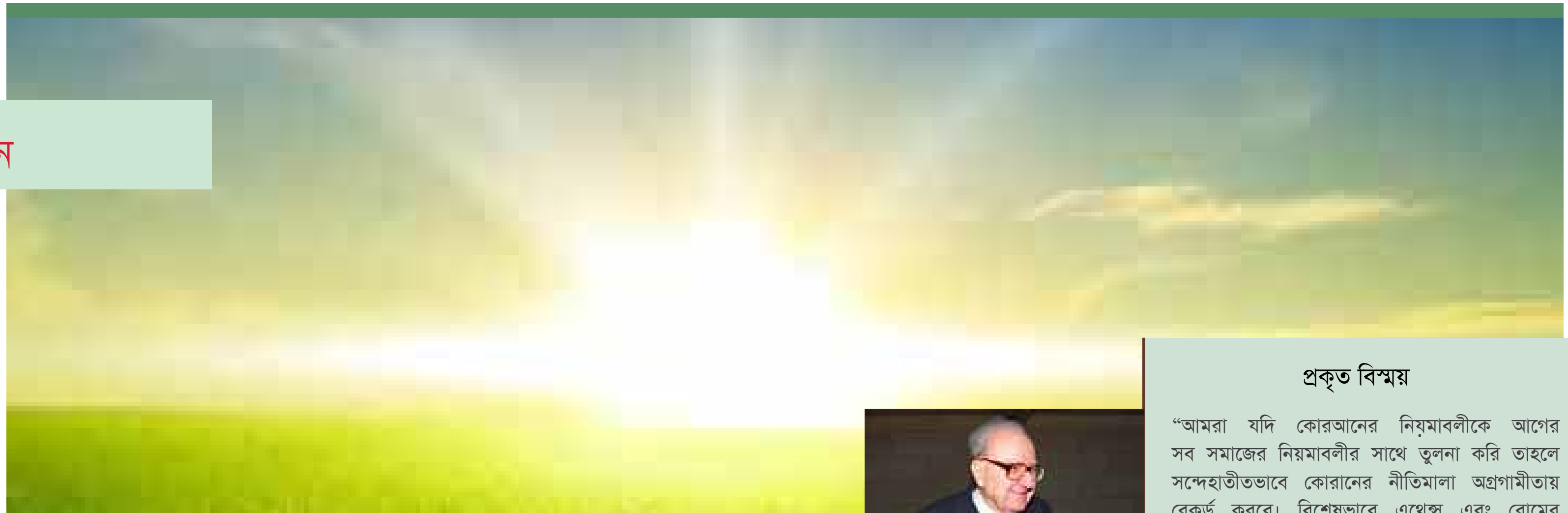
মানুষের বিবেককে মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা মানুষের বিবেক ও চিন্তাশক্তিকে অনেক মূল্যবানকরেছেন, তিনি তাকে চিন্তা ও গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে বিবেকের মাধ্যমে দলিল পেশ করাকে তিনি ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমুহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রর্দশনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না।} [ইউনুসঃ ১০১]

তিনি বিবেককে সম্মান করার জন্য এবং ইহার হেফাযত ও ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। অন্যের অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামির মাধ্যমে বিবেককে অসার করতে নিষেধ করেছেন। এজন্যই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাতিত কাউকে শরীয়তের হুকুম দেয়া হয়নি। এমনিভাবে বিবেককে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার একত্ববাদের উপর প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বরং কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তিনি বিবেকের আশ্রয় নিতে বলেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।} [বাকারাঃ ১১১]

তিনি বিবেককে কুসংস্কার, ভন্ডামী, ভেলকিবাজি, জ্বীনের দ্বারা তদবীর ও ইহার সদৃশ যা কিছু আছে তা থেকে মুক্তিদান করেছেন। প্রত্যেক মানুষই তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবে, অন্যের কাজের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।।} [ফাতিরঃ ১৮]

মানুষের এ মর্যাদা একটি বড় ব্যাপার, এর দ্বারা তিনি মানবজাতিকে অন্যের বোঝা থেকে মুক্তি দান করেছেন।



নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদাদান

বনী আদমকে সম্মান ও মর্যাদাপ্রদান একজাতির উপর সীমিত নয়, বরং তিনি নারী পুরুষ সবাইকেই সমানভাবে মর্যাদা ও সম্মানদান করেছেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী।} [বাকারাঃ ২২৮]

আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।} [তাওবাঃ ৭১]

আখেরাতের প্রতিদানে নারী পুরুষ থেকে ব্যাতিক্রম হবেনা। সকলে কর্ম অনুযায়ী সমান প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া [এই বলে] কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।} [আলে ইমরানঃ ১৯৫]

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেনঃ {যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও নষ্ট হবে না।} [নিসাঃ ১২৪]

আল্লাহ তায়া’লা নারীকে মানুষরূপে সম্মানিত করেছেন, যেহেতু তিনি তাদেরকে পুরুষের ন্যায় সাওয়াব ও শাস্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্বশীল ও যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এমনকি মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রথম হুকুমও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একত্রে ছিল। আল্লাহ তায়া’লা প্রথম মানুষ আদম ও তার স্ত্রী হাওয়া [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।} [বাকারাঃ ৩৫]

এমনিভাবে আল্লাহ তায়া’লা আদম [আঃ] এর জান্নাত থেকে বের হওয়া ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের দুঃখ দুর্দশার জন্য নারীকে দায়ী করেননি, যেমনিভাবে কোন কোন ধর্মে তা করা হয়েছে। বরং আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন যে, আদম [আঃ] নিজেই সে ব্যাপারে প্রথম দায়ী। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।} [ত্বহাঃ ১১৫]

{অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে {গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথ ভ্রষ্ঠ হয়ে গেল। এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন।} [ত্বহাঃ ১২১-১২২]

সমান অধিকার

“অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ও ছাত্র পরিষদ গুলোতে ছাত্র ছাত্রীর মাঝে সমতা বিধান করেনি। পরে ১৯৬৪এর ২৬শে জুলাইর একটি সিদ্ধান্তে তা করা হয়। “





প্রকৃত বিস্ময়

“আমরা যদি কোরআনের নিয়মাবলীকে আগের সব সমাজের নিয়মাবলীর সাথে তুলনা করি তাহলে সন্দেহাতীতভাবে কোরানের নীতিমালা অগ্রগামীতায় রেকর্ড করবে। বিশেষভাবে এথেন্স এবং রোমের তুলনায়। যেখানে নারীরা ছিল স্পষ্টভাবে নীচু।”

ফরাসি দার্শনিক

রজার গারুডি

মানব রচিতআইনে নারী

“রোমে নারী বিষয়ক গবেষণার একটি বড় সমাবেশ হয়েছিল । এতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী এমন বস্তু যার আত্মা নেই। এই কারণে সে পরকালের জীবন লাভ করবেনা । সে অপবিত্র, তাই তার উচিত গোস্ত না খাওয়া, না হাসা, বরং তার উচিৎ কথা না বলা। এবং তার উচিৎ প্রার্থনা, উপাসনা, ও সেবার মাঝে সময় অতিবাহিত করা। সে সব থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য তারা নারীর মুখে লোহার তালা লাগিয়েছিল। উচু থেকে নিচু সব পরিবারের নারীরাই পথে ঘাটে, সকাল সন্ধ্যা, ঘরে বাইরে তালা মুখে রেখে চলাফেরা করত। তাছাড়া শারীরিক নানা নির্যাতন তো ছিলই। কারণ, নারী হল [তাদের দৃষ্টিতে] প্ররোচনার উপকরণ। শয়তান হৃদয়কে কলুষিত করতে নারীকে ব্যবহার করে।”

তাদের নিকট নারী

ভারতের প্রাচীন ধর্মে রয়েছেঃ মহামারী, মৃত্যু, নরক, বিষ, সাপ, ও আগুন নারী থেকে উত্তম। নারীর বেচে থাকার অধিকার শেষ হয়ে যায় তাঁর মুনিব ও মালিক স্বামীর জীবনাবসানের মাধ্যমে। স্বামীর দেহ যখন দাহন করতে দেখবে তখন সে যদি আগুনে ঝাপিয়ে পড়বে, না হয় সে অনন্ত অভিশাপে নিমজ্জিত হবে।”

এমনিভাবে মানুষ হিসেবে নারী পুরুষ সকলেই সমান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।} [হুজরাতঃ ১৩]

নারী পুরুষ উভয়েই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সমানভাবে অংশীদারঃ

সামাজিক ও নাগরিক দায়বদ্ধতা বিশেষ করে বস্তুগত অধিকারঃ নারীর আভ্যন্তরীন ব্যক্তিত্বই হলো সম্মানিত ও মূল্যবান। আল্লাহ তাআলা হুকুম-আহকাম ওয়াজিব ও আদায়ের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সবাইকে সমান করেছেন। নারীকে লেনদেন, বেচাকেনা সব কাজেই পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। এসব সামাজিক ও নাগরিক অধিকার তাদের আবশ্যকীয় প্রাপ্য, তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন শর্ত ও বাঁধা দেয়া যাবেনা। তবে হ্যাঁ যেসব শর্তাবলী পুরুষদের ক্ষেত্রে ও হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।}[নিসাঃ ৩২]

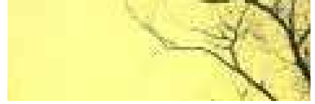
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে তাদের অধিকার রেখেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।}[নিসাঃ ৭]

ভাল বা খারাপ কাজের প্রতিদান ও শাস্তির ক্ষেত্রে শরিয়তে তাদের অবস্থা পুরুষের মতই করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {৫ পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।}[মায়েদাঃ ৩৮]

এমনিভাবে পরকালের প্রতিদানেও উভয়ের সমান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [নাহলঃ ৯৭]

তারা উভয়ে উভয়ের বন্ধু ও সাহায্যকারী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।|} [তাওবাঃ ৭২]

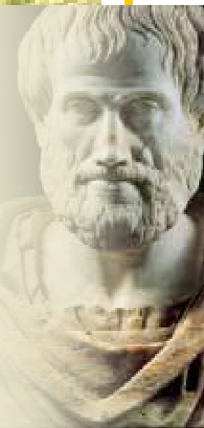
নারীর সাথে কোমল আচরণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যুদ্ধে নারীকে হত্যা করা হারাম করেছেন। হায়েজগ্রস্থ নারীদের সাথে একত্রে খাওয়া- দাওয়া করার এবং সহবাস ছাড়া মেলামেশা করতে আদেশ দিয়েছেন। ইহুদীরা এসব করতে নিষেধ করত, তারা নারীকে হায়েজ অবস্থায় দূরে সরিয়ে রাখত, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে খাওয়া- দাওয়া করত না।





এ কেমন অত্যাচার?!

“পরুষের তুলনায় নারী হল, মুনিবের তুলনায় দাসের মত। বুদ্ধির কাজের তুলনায় হাতের কাজের মত। গ্রিকের তুলনায় বর্বরের মত। নারী হল, উন্নতির সোপানের নিম্ন ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা ভাংগা পা। “

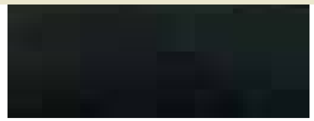


অ্যারিস্টটল
গ্রিক দার্শনিক



ফরাসি নারী

“৫৮৬ খৃঃ ফ্রান্সের একটি রাজ্যে সম্মেলন হয়েছিল। এতে নারী নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, নারী কি মানুষ না অমানুষ? আলোচনার শেষে তারা সিদ্ধান্ত করে, নারীরা মানুষ তবে তাদের কে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের সেবার জন্য। ১৯৩৮ সালে আইন করে রহিত করা হয় নারীদের কিছু আর্থিক লেনদেন নিষেধের আইন। এতে ফ্রান্সের নারীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজের নামে ব্যাংকে একাউন্ট খোলার সুযোগ পেল নারীরা।”



অধিকার বঞ্চিত নারী

“আমি এবং আমার হৃদয় ঘুরেছি জানতে, অনুসন্ধান করতে, অর্জন করতে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি, এবং জানানোর জন্য যে, অনিষ্ট হল অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতা হল মত্ততা। তখন মৃত্যুর চেয়ে বেশী তিক্ত দেখতে পেলাম নারীকে। যে হল জাল এবং যার হৃদয় হল ফাঁদ এবং যার দুটি হাত হল বেড়ি। “

বাইবেল





সমান সমান

“ইসলামের ছায়ায় নারী ফিরে পেয়েছে তার স্বাধীনতা, অর্জন করেছে উচু মর্যাদা। ইসলামই নারীকে পুরুষের সমমান ও সহজাত মনে করে। নারী পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। ইসলাম নারী শিক্ষা এবং নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। ইসলাম তাদেরকে মালিকানার অধীকার দিয়েছে এবং তাদেরকে মালিকানাধীন সম্পদে খরচের স্বাধীনতা দিয়েছে। তেমনি ভাবে তাদেরকে দিয়েছে বিয়ে চুড়ান্ত করার অধিকার, এবং চিন্তা ও বাক স্বাধীনতা।”

মোনা ম্যাকলোসকি
জার্মান কূটনৈতিক

নারীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম কর্তৃক সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ তিনি বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি”। [তিরমিজি, ইমাম তিরমিজি বলেনঃ হাদিসটি হাসান ও সহীহ]।

রাসুলের [সাঃ] এর যুগে কোন এক নারীকে প্রহর করা হলে তিনি খুবই রাগান্বিত হন। তিনি বললেনঃ «তোমাদের কেহ কেহ তার স্ত্রীকে দাস-দাসীর মত প্রহার করে অতঃপর দিনের শেষে কিভাবে তার সাথে মিলিত হবে!»(বুখারী)

যখন একদল মহিলা রাসুলের [সাঃ] নিকট তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছিলেন, তখন রাসুল [সাঃ] বললেনঃ «অনেকের স্ত্রী তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে মুহাম্মদের পরিবারে এসেছে, সে সব স্বামীরা উত্তম লোকদের অন্তর্ভূক্ত নয়।» (আবু দাউদ)

ইসলাম নারীকে যে পরিমান মর্যাদা দিয়েছে পুরুষকে ততখানি দেয়নি। আল্লাহ তায়া’লা মায়ের সাথে পিতার চেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। এক লোক রাসুলের [সাঃ] নিকট এসে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বললঃ তারপর কে? নবী করিম [সাঃ] বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তারপর তোমার বাবা। [বুখারী ও মুসলিম]।



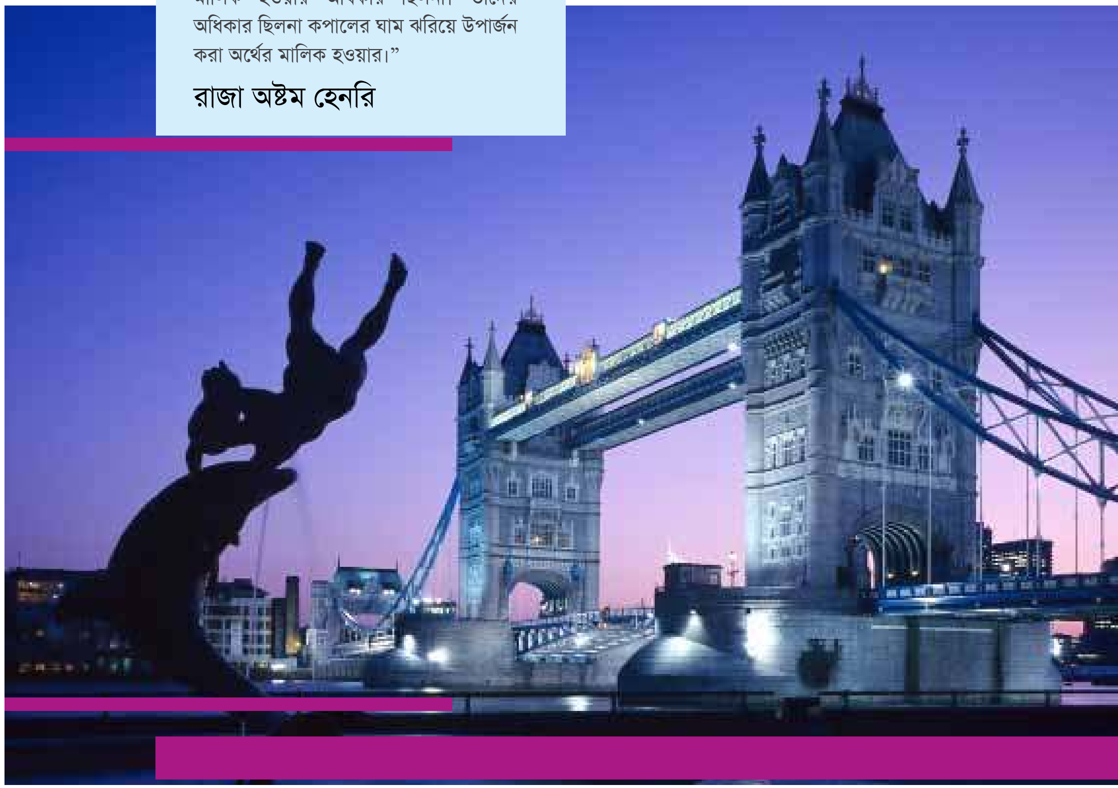
মানবরচিত আইন জুলুমপূর্ণ

“রাজা অষ্টম হেনরি মহিলাদের জন্য পবিত্র বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করে একটি আদেশ জারি করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে নারীরা সাধারণ ইংরেজ আইনে প্রায় ১৮৫০ সাল নাগাদ নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতনা। তাদের কোন ব্যক্তিগত অধিকার ছিলনা। নিজের পোশাকের মালিক হওয়ার অধিকার ছিলনা। তাদের অধিকার ছিলনা কপালের ঘাম ঝরিয়ে উপার্জন করা অর্থের মালিক হওয়ার।”

রাজা অষ্টম হেনরি

পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানের পালন পালনের জন্য অধিক সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। রাসুল [সাঃ] বলেছেনঃ «যাদেরকে কন্যা সন্তান দান করা হয়েছে, অতঃপর তাদেরকে সুন্দরভাবে লালন পালন করেছে, সে সব কন্যা সন্তান তাদেরকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে রাখবে।» (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি [সাঃ] আরো বলেছেনঃ «হে আল্লাহ আমি দুই দুর্বলের জটিলতা নিরসণের ব্যাপারে আপনার নিকট প্রার্থণা করছি, তারা হলঃ ইয়াতীম ও নারীঅনেকের স্ত্রী তাদ » (হাদিসটি হাসান, ইমাম নাসাঈ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।)





মানব সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ তায়া'লা মহাবিশ্বের সব কিছুকে যে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, সব মাখলুকাতের উপর যাকে মর্যাদা দান করেছেন, তাদেরকে এক মহান উদ্দেশ্য ও হিকমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনর্থক কাজ হতে পুতঃপবিত্র। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, [তারা বলে] পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।} [আলে ইমরানঃ ১৯০-১৯১]

আল্লাহ তায়া'লা দুষ্ট কাফিরদের ধারণা সম্পর্কে বলেনঃ

{আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দূর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম।} [ছোয়াদঃ ২৭]

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে অন্যান্য জীব জানোয়ারের মত খাওয়া, পান করা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করেননি। তিনি মানুষকে সব প্রাণীর উপর মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার রবের সাথে কুফুরী করে। সে ভুলে যায় তার সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। অস্বীকার করে তার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেন তার সব চিন্তাভাবনা দুনিয়ার ভোগবিলাস লাভের জন্য। এ সব লোকের জীবন হলো জন্তু জানোয়ারের জীবনের মতো, বরং সেগুলোর থেকেও অনেক অধম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।} [মুহাম্মদঃ ১২]



আল্লাহ্‌র দিকে

"ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এক যোগে লড়াই করছে সংশয়, অবিশ্বাস ও কুসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধের এক স্লোগান ছিল "আল্লাহর দিকে" এবং তা সর্বাদা থাকবে।"

মার্কস প্লাঙ্ক
কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা

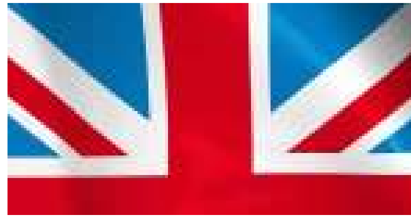
আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।} [হিজরঃ ৩]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।} [আ'রাফঃ ১৭৯]

সকল মানুষই জানে তার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক একটা হিকমতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। চক্ষু দেখার জন্য, কান শুনার জন্য...এভাবে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এটা কি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিকমতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে?! অথবা সে তার স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিতে রাজী নয় যখন তিনি তাকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন?!

তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করয়েছেন? কেন আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন? কেন পৃথিবীর সব কিছু আমাদের আয়াত্তাধীন করে দেয়া হয়েছে? আল্লাহ তায়া'লা এ ব্যাপারে বলেনঃ {আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।} [জারিয়াতঃ ৫৬]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।} [মুলকঃ ১-২]



স্পষ্ট প্রমান

"পরাক্রমশালী কোন স্রষ্টা ছাড়া জীনের সুচনা কিংবা এর স্থায়িত্ব মানুষ কল্পনা করতে পারেনা। আমি বিশ্বাস করি যে, দার্শনিকগন জীবন সম্বন্ধে তাদের দর্শন গবেষণায় এ জগতে ছড়িয়ে থাকা স্পষ্ট প্রমান থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে।

ম্যাগ্নিস্মাক্লিয়াস
ব্রিটিশ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য



জ্ঞানীদের নিকট একথা স্পষ্ট যে, যিনি যে জিনিস তৈরি করেন তিনি উক্ত জিনিসের হিকমত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত থাকেন। আল্লাহ পাক সুমহান। তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ভাল জানেন তাদের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে। শুধু নামাজ রোজা ছাড়াও ইবাদতের ব্যাপক অর্থ রয়েছে। বরং তাতে সমস্ত পৃথিবীর আবাদও শামিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল।} [হুদঃ ৬১]

মানুষের পুরো জীবনটাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।} [আনআ'মঃ ১৬২-১৬৩]

ইবাদাতের মর্ম সামগ্রিক

রাসুল সঃ এরশাদ করেন, যখন কেয়ামত হবে তখন তোমাদের কারো হাতে যদি একটি চারা থাকে তাহলে সে যেন তা রোপণ করে নেয়। [আহমদ বর্ননা করেছেন]

তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের কেউ তার কামবাসনা পূরণ করবে আর এতে তার জন্য সাওয়াব থাকবে?! রাসুল সঃ বললেন, «বল দেখি, সে যদি ঐ বাসনা হারাম পন্থায় পূরণ করত তাহলে কি তার পাপ হতনা? একই ভাবে যদি হালাল ভাবে সে বাসনা পূরণ করে তাহলে সে সাওয়াব পাবে।» (মুসলিম শরীফ)

হাদিস শরীফ



অতঃপর হে মানুষ......

পুরো জাহান যখন তোমার জন্য আয়াত্বাধীন করে দেয়া হলো, যখন তোমার সামনে সব ধরনের দলিল প্রমাণ পেশ করা হলো যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যখন তুমি জানতে পারলে যে আসমান জমিন সৃষ্টির চেয়ে মৃত্যুর পরে তোমাকে পুনঃরায় সৃষ্টি করা আরো সহজ, যখন তুমি জানতে পারলে আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন, তোমার জন্য মহাবিশ্বকে আয়াত্তাধীন করে দিয়েছেন, তারপরেও তুমি তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত কেন? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।} [ইনফিতারঃ ৬-৮]

তোমাকে সর্বশেষে তোমার পালনকর্তার সাথে মিলিত হতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ, তোমাকে তোমরা পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে। এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া, হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে, এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।} [ইনশিকাকঃ ৬-১২]

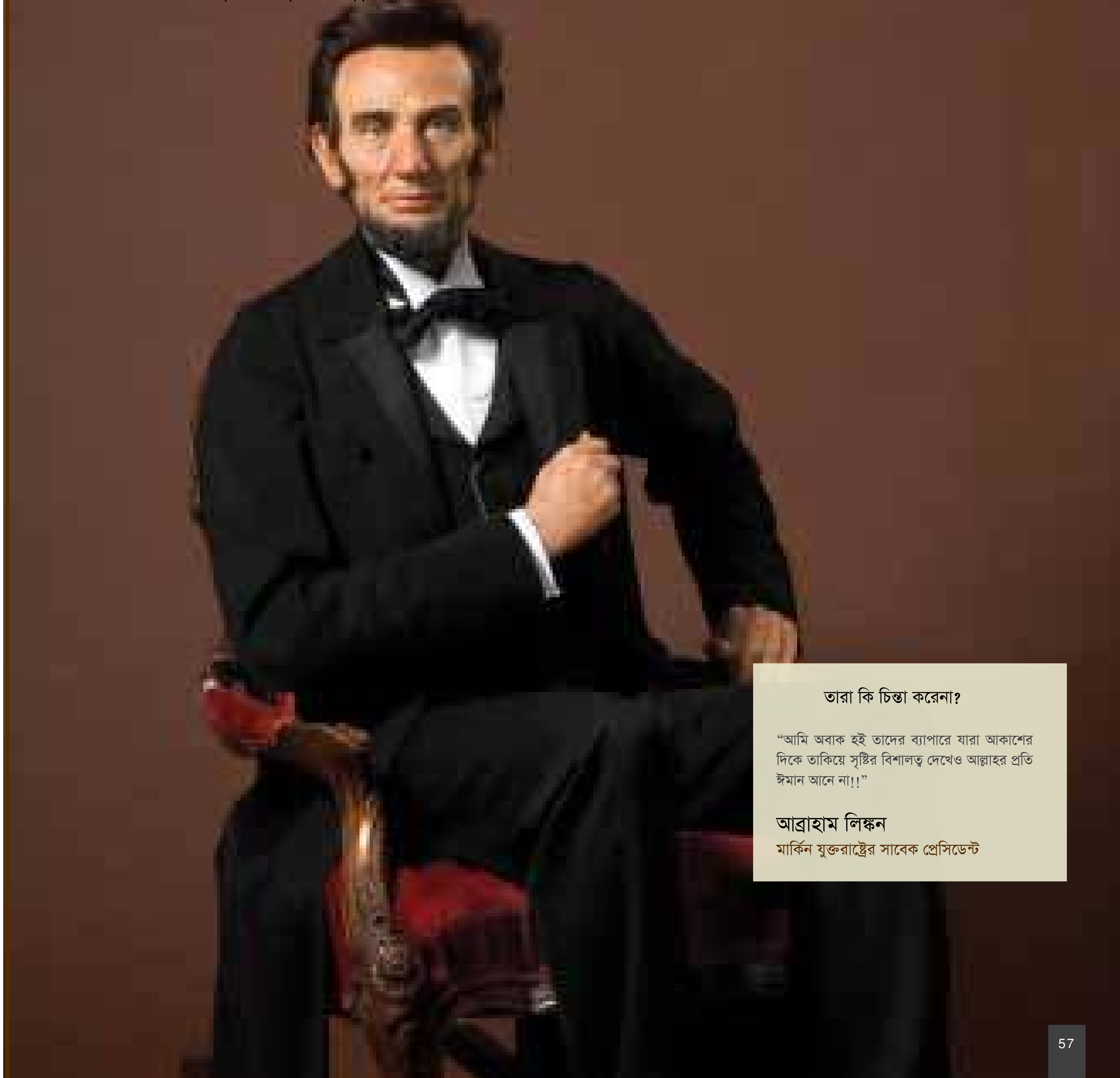
আল্লাহ তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তির পথে চলো। এতে তোমার জীবন সুখী হবে, শান্তি পাবে এবং মৃত্যুর পরে পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে সুখী হবে। এমনিভাবে সারা জাহান তার রবের ইবাদত করে। সব সৃষ্টজীব আল্লাহর তাছবীহ ও প্রশংসা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমন্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমন্ডলে।} [জুমআঃ ১]

তাঁর মহিমায় সবাই সিজদা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি।} [হাজ্বঃ ১৮]

বরং এ জাহানের সবাই তাদের অবস্থানুযায়ী তাদের রবের সালাতও তাছবীহ পড়ে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখ না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে।} [নুরঃ ৪১]

তাহলে তোমার কি উচিত হবে এ মহিমান্বিত দৃশ্য থেকে আলাদা থাকা? এতে তুমি অপমানিত হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।} [হাজ্বঃ ১৮]

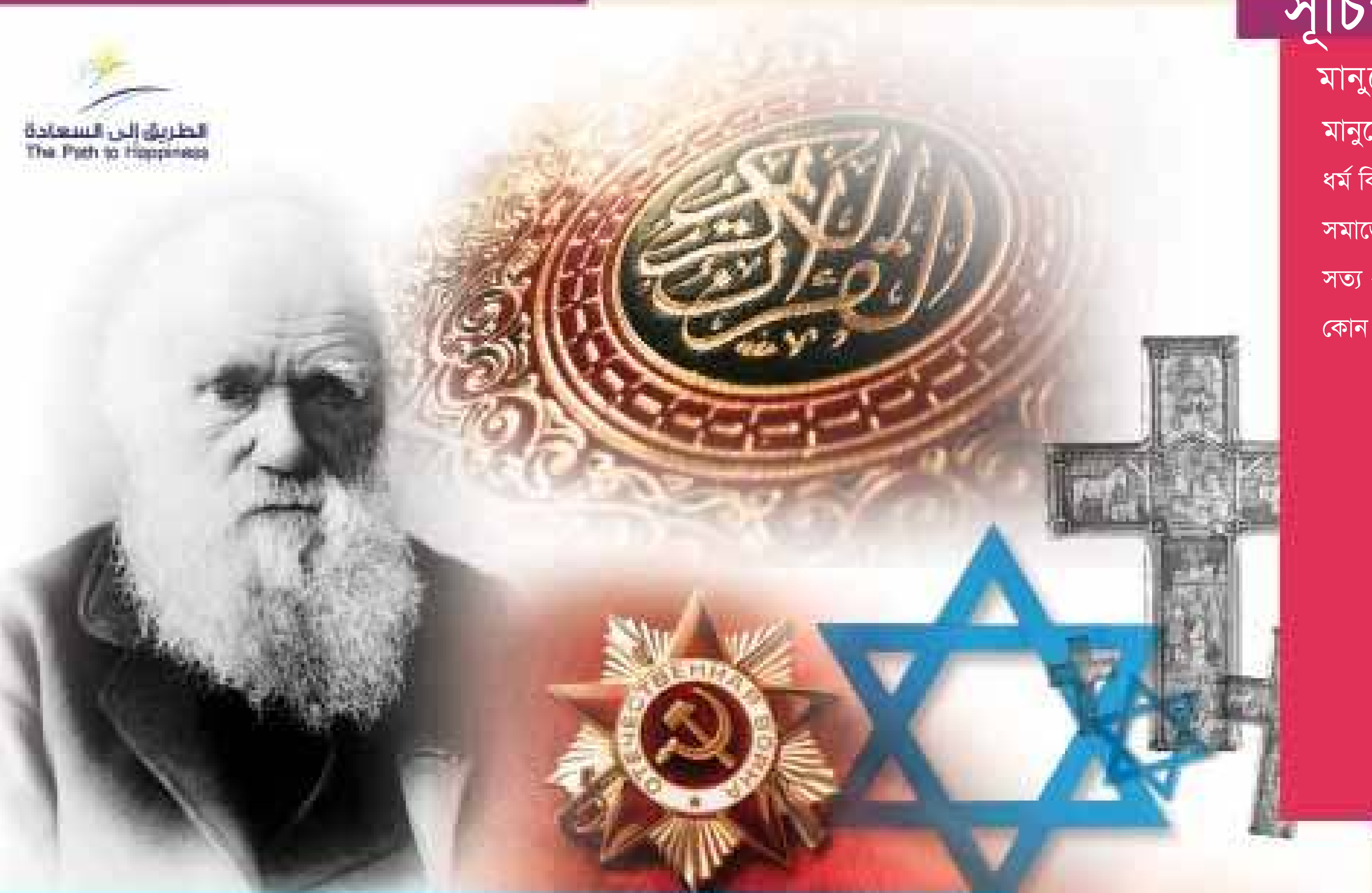


তারা কি চিন্তা করেনা?

"আমি অবাক হই তাদের ব্যাপারে যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টির বিশালত্ব দেখেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না!!"

আব্রাহাম লিঙ্কন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট



সূচিপত্র

মানুষের জন্য কি ধর্মের প্রয়োজন?

মানুষের জন্য কি ধর্মের প্রয়োজন?

ধর্ম কি আবশ্যক?

মানুষ ধর্ম ছাড়া কোনভাবেই বাস করতে পারেনা।

মানুষ যেভাবে স্বভাবগতভাবেই সামাজিক, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বসবাস করতে পারেনা, সেভাবে সে স্বভাবগতভাবেই ধার্মিক, সে ধর্ম ছাড়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনা। ধার্মিকতা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার।

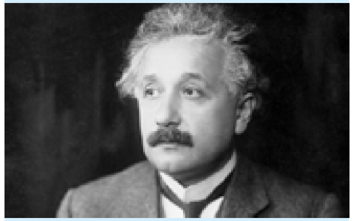
কষ্ট ও বিপদে আপদে পড়লে মানুষ আল্লাহ তায়া'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এটাই তার ধার্মিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে।} [আনকাবুতঃ ৬৫]

শক্তিশালি ফলাফল

ঈমানই হল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব চেয়ে শক্তিশালী ও মহৎ ফলাফল।

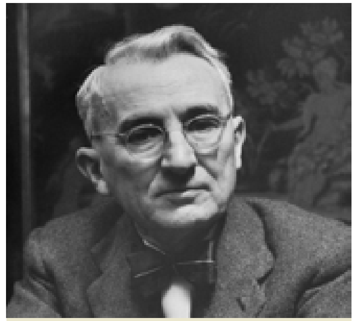
আইনস্টাইন

পদার্থবিজ্ঞানী



যেমনিভাবে কোন যন্ত্রের তৈরিকারক ঐ যন্ত্র ও উহার প্রয়োজন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত, তেমনিভাবে মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি ও তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? তিনি তো সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [মুলকঃ ১৪]

কেননা স্রষ্টা দয়ালু, ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। তিনি মানুষের জন্য এমন শরিয়তের প্রবর্তন করেছেন যা তাদের অন্তরকে জাগ্রত করে ও তাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে ঈমানদারগণ,আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর,যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়,যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।} [আনফালঃ ২৪]



ধার্মিক ও রোগী

আমি খুব স্মরণ করি সে সব দিনগুলো যখন মানুষ শুধু বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ নিয়েই আলোচনা করত। কিন্তু এখন সে তর্ক চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কারণ, সর্বাধুনিক মনো বিজ্ঞান ধর্মের মৌলিক নিয়ম নীতি প্রচার করে, কিন্তু কেন?! কারণ, মানসিক ডাক্তারগন মনে করেন যে, মজবুত ঈমান, ধর্মাচার, ও প্রার্থনা উদ্বেগ, ভয় ও স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা দমন করার জন্য, এবং আমরা যে সব রোগে ভুগছি এর অর্ধেক নিরাময় করার জন্য যথেষ্ট। তাই ডঃ এ এ ব্রেল বলেছেন, সত্যিকার দ্বীনদার ব্যক্তি কখনো মানসিক রোগে ভোগে না।

ডেল কার্নেগী

মার্কিন লেখক

এজন্যই যারা নিজেদের স্বভাবজাতের বিরোধিতা করে মূলতঃ নিজেরাই নিজেদের মিথ্যাচার ও অস্বীকৃতি সম্পর্কে {তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান সত্য বলে পরিণাম কেমন হয়েছিল?} [নামলঃ ১৪]

আর এ সব কিছু স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যখন সে বিপদ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন,বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি অ তোমরা সত্যবাদী হও। বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে।} [আন'আমঃ ৪১-৪২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।} [যুমারঃ ৯]



গভীর হোন

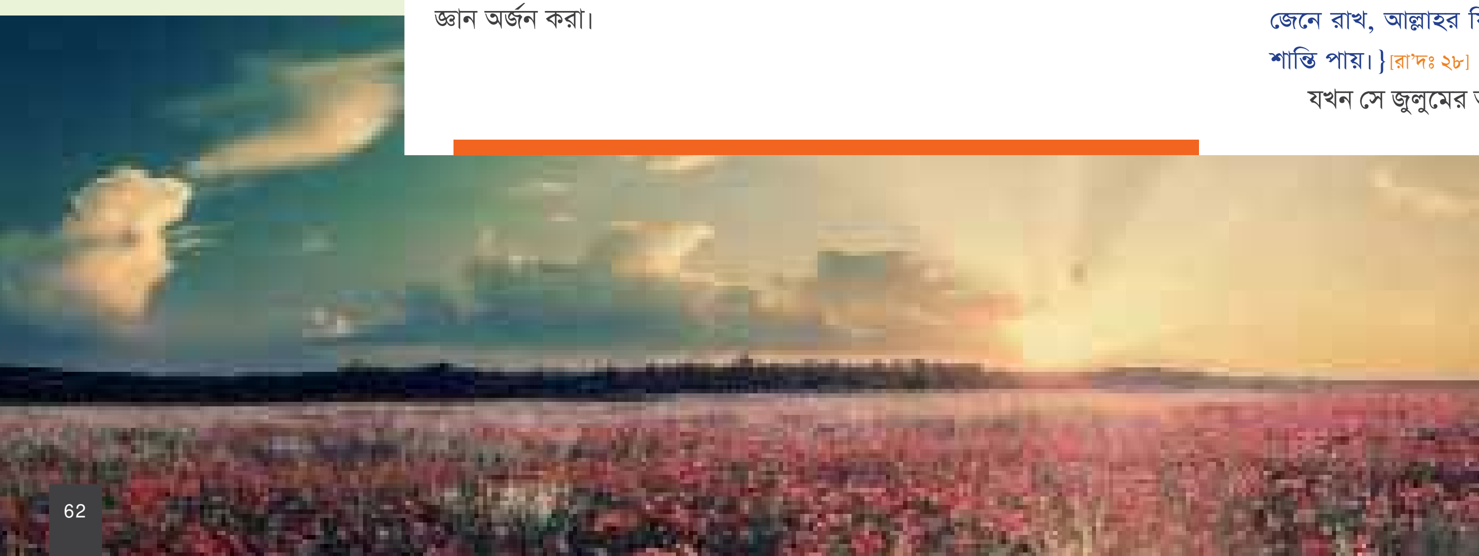
দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেছেন, " অল্প দর্শনই মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে দর্শনে গভীরতা ধর্মের পথে তাকে ফিরিয়ে আনে।

ডেল কার্নেগী
মার্কিন লেখক

সমস্ত মানবই স্বভাবগতভাবেই সে আল্লাহর ইবাদত স্বীকার করে যার হাতে রয়েছে কল্যাণ, অকল্যাণ, যিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, যা চান তাই করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।} [আন'আমঃ ১৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন,তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতিত।} [ফাতিরঃ ২]

মানুষের দু'টি শক্তি রয়েছে। জ্ঞান শক্তি, আরেকটি হলো ইচ্ছাশক্তি। এ দুটোতে তার চেষ্টানুযায়ী সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছায় এবং এভাবেই মানুষ সৌভাগ্য লাভ করে। প্রথমটি অর্থাৎ জ্ঞানের শক্তি হলোঃ আল্লাহ সম্পর্কে তার জ্ঞান, তার সুন্দর নাম ও গুণাবলী, তার আদেশ, নিষেধ, আচরণ, নৈতিকতা,কিভাবে তার নিকটবর্তীজনের পথে চলা যায়,তার পথে চলা ব্যক্তিদের পথে চলে কিভাবে মর্যাদা সুউচ্চ করা যায় তাঁর জ্ঞান এবং মানবাত্মার গভীরের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ইহার রোগব্যাধি,প্রতিরোধ, ক্ষতিকর জিনিস ও যে সব কিছু তার মাঝে ও তার প্রতিপালকের মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করে ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করা।



এছাড়াও খোদাভীরুদের আখলাক ধারণ করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করা, এতে তার আত্মা সুউচ্চ ও মহান আত্মায় পরিণত হয়। অর্থহীন পার্থিব সব কিছু ও ভোগ বিলাস থেকে দূরে থাকা। এসব কিছুর উপর ভিত্তি করে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর স্তর এবংতাঁর স্থান ও মর্যাদা নির্ধারন হয়, বরং এতে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি অর্জিত হয়।

বরং এ সব জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছাশক্তির জন্য পাথেয় ও অবলম্বন, যেহেতু এতে আছে হেদায়েত এবং দৃঢ়তা ও সঠিকপথ । আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{হে ঈমানদারগণ,আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর,যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।} [আনফালঃ ২৪]

নাস্তিকেরা আত্মিক পরিতৃপ্তি ছাড়াও দৈহিক শান্তির ব্যাপারেও তাদের দৈন্যতা স্বীকার করে।তারা যতই ভ্রান্ত কথা সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করুকনা কেন কিন্তু মানুষের প্রকৃত শান্তির জন্য কোন কিছুই পেশ করতে পারেনি।

বিপদে আপদে, বালামুসিবতে মানুষ কার নিকট আশ্রয় পার্থনা করে?! সে শক্ত ভিত্তির কাছে আশ্রয় চায়,আল্লাহ তায়া'লার নিকট আশ্রয় চায়। যেহেতু তার কাছেই রয়েছে সর্বশক্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য্য, উত্তম ভরসা ও সব কাজ তার নিকটই সোপর্দ করা হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।} [রা'দঃ ২৮]

যখন সে জুলুমের আগুনে দগ্ধ হয় এবং তার তিক্ততা অনুভব করে তখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ মহাবিশ্বের একজন প্রতিপালক আছেন, তিনি বিলম্বে হলেও মাজলুমকে সাহায্য করেন, আখেরাতের দিবসে প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্মের ফলাফল পাবে, সৎ কর্মশীলকে পুরুস্কার দেয়া হবে আর অসৎ কর্মকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। তখন আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর উপর ভরসা পেয়ে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ



স্পষ্ট সত্য

আমার ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের গবেষণা ছিল, শিক্ষা ও জাতী গঠন বিষয়ে। আমি আবিস্কার করেছিলাম যে, ইসলামের মূল রুকন গুলো সামাজিক আর্থিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে জাতীর পুনর্গঠনের জন্য একটি বড় ও মূল্যবান ভিত্তি ও রূপরেখা তুলে ধরে।

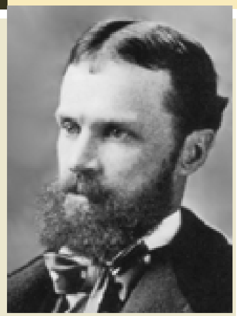
ডঃ ডগলাস
রেজিনার মেয়র



ধার্মিকতা রোগের জন্য প্রতিকার

মানসিক ডাক্তাররা মনে করেন যে, মজবুত বিশ্বাস, ধর্মাচার, উদ্বেগ ও স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা দমন করার জন্য এবং এসব রোগ নিরাময় করার জন্য যথেষ্ট।

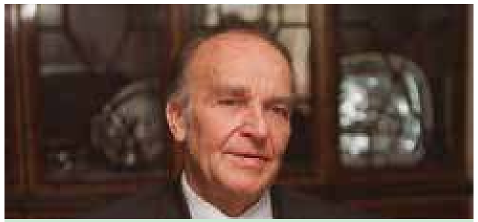
ডেল কার্নেগী
মার্কিন লেখক



নিজেই নিজের চিকিৎসা করুন

মানসিক দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হল, আল্লাহর উপর ঈমান।

উইলিয়াম জেমস
মার্কিন মনোবিজ্ঞানী



দুয়ের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য

“বস্তুবাদ সবসময় জন্তু ও মানুষের যৌথ দিক গুলোকেই সমর্থন করে, পক্ষান্তরে ধর্ম জোর দেয় এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক বিষয়গুলোর উপর। “

আলী ইযযাত বিগোভিচ
সাবেক বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

{যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোযখ। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান!} [আলে ইমরানঃ ১৬২]

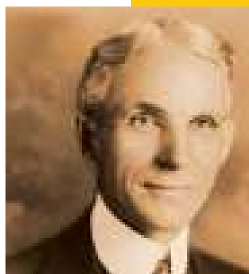
পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচিতি পেলনা, তার উপর ঈমান আনলনা, সে সব শক্তি হারিয়ে ফেলে, আরাম, আত্মবিশ্বাস ও সুখ-শান্তি সব কিছুই হারিয়ে ফেলে। তখন সে উদ্বেগ ও দুঃখের ভিতর ঘুরতে থাকে। আত্মিক কোন স্থিরতা বা অভ্যন্তরীণ কোন শান্তি থাকেনা। তার সব লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায় ভোগ বিলাস, ক্ষুধা নিরারণ ও সম্পদ অর্জন। সে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য জানেনা, জানেনা তার জীবনের লক্ষ্য, বরং দিশেহারা জীবন যাপন করে, যৌনলালসা পূরণের মাধ্যমে শান্তি তালাশ করে। এমনকি তারা জন্তু জানোয়ারের মতই আচরণ করে বরং তাদের চেয়েও অধম জীবন যাপন করে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।} [ফুরকানঃ ৪৪]

মানসিক বিপর্যয় ও অন্তরের অস্থিরতায় নিপতিত হয়ে সে মুসীবতগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।} [ত্বহাঃ ১২৪]



উপদেশ দাতা ডাক্তারগন

“মানসিক ডাক্তাররা নতুন ধরনের উপদেশদাতা। তারা পরকালে জাহান্নামের শাস্তির আশংকায় আমাদেরকে ধর্মাচারের প্রতি উৎসাহিত করেন না। তারা ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করেন এই জীবনে প্রদত্ত নরকের আশংকায়। তা হল জঠরাঘাত, স্নায়ুবৈকল্য এবং পাগলামির নরক।”

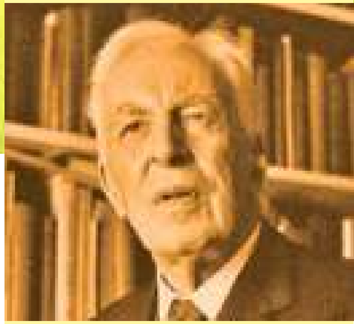


হেনরি ফোর্ড
আমেরিকান ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা

অতএব যারা তাদের রবের পরিচয় পেয়েছে, তার মহানতা জানতে পেরেছে, স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে, সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় থাকে, তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করে, তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করে, আর জানে যে, তাঁর ছোট বড়, সুক্ষ্ম অসুক্ষ্ম সব কাজেই সব সময়ই তার রবের মুখাপেক্ষী, আর যারা এসব জানেনা এ দু’য়ের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {হে মানুষ,তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।} [ফাতিরঃ ১৫]



পরিশেষে দুশ্চিন্তা ও বিভ্রান্তি তাকে দূর্ভাগ্য ও কষ্টের নির্মমতায় নিক্ষেপ করে, সে অন্ধের মত এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে, অন্তর সন্দেহ ও হয়রানিতে ভরপুর হয়ে যায়। যখনই শান্তির অনুসন্ধান করে তখন শান্তির নামে শুধু মরিচিকাই পেয়ে থাকে। যদিও দুনিয়ার ভোগ ও আনন্দ লাভ করে, যদিও তারা অনেক বড় পদে অধিষ্ট, কিন্তু যে আল্লাহর পরিচয় পেলনা সে কিই বা লাভ করল? আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেল সে কি কিছু হারিয়েছে?!



ধর্মই জীবন

“ধর্ম হল মানব স্বভাবের আবশ্যক ঝোক। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের ধর্মশূন্যতা তাকে ধাবিত করে এক আত্মিক হতাশার দিকে। যা তাকে এমন জায়গায় ধর্মীয় সান্তনা খুঁজতে বাধ্য করে যেখানে সান্তনার কিছুই নেই। “

আর্নল্ড টয়নবি

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক



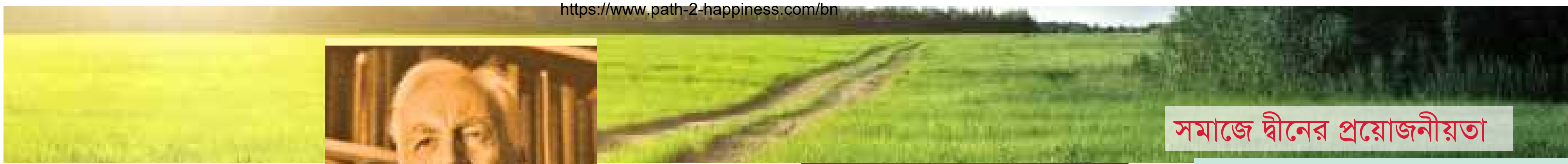
দুশ্চিন্তার যুগ

“আমরা উদ্বেগের যুগে বাস করি। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে কিন্তু তার সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করেনি। বিপরীতে বৃদ্ধি করেছে মানুষের উদ্বেগ, হতাশা এবং অনেক মানসিক রোগ যা এই জীবনের সুন্দর গুলোকে লীন করে দিয়েছে।”

রেনেডোলো

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক





সমাজে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তির জন্য যখন দ্বীন বা ধর্ম অত্যাবশ্যক তখন সমাজের জন্য দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।কেননা ধর্ম হলো সমাজ রক্ষার ঢাল স্বরূপ। যেহেতু পরস্পরের ভালকাজে সহযোগীতা ছাড়া মানবজীবন চলতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।} [মায়েদাঃ ২]

আর এ সহযোগীতা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়া সম্ভব নয়, যা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য, ও অধিকার ইত্যাদি নির্ধারণ করে দিবে।

এ ব্যবস্থা এমন একজনের পক্ষ থেকে আসতে হবে যিনি মানবজাতির সব ধরনের প্রয়োজন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন,তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [মুলকঃ ১৪]

যখনই মানবজাতি দ্বীন, শরিয়ত ও ইহার ব্যবস্থাপনা থেকে পথচ্যুত হবে, তখনই সে সন্দেহ, ভ্রষ্টতা, ঘুর্ণিপাক, অস্থিরতা, দুঃখ ও দুর্দশায় পতিত হবে।

দ্বীনের শক্তির মত কোন শক্তি পৃথিবীর বুকে নেই, তদ্রুপ দ্বীনের নিয়মকানুনের মত সম্মানযোগ্য কোন কানুনও নেই। সমাজের নিরাপত্তা ও

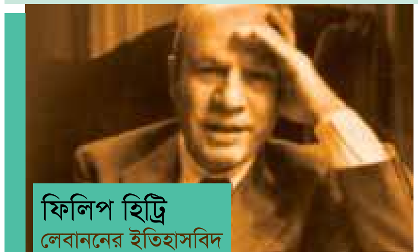


স্পষ্ট প্রমান

“আমাদের পছন্দের সব কিছু ম্লান হয়ে যাওয়া এবং বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিল্পের স্বাধীনতা শেষ হয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু ধর্মাচার মুছে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং যে বস্তুবাদ মানুষকে জাগতিক জীবনের হীন অঙ্গনেই কোনঠাসা করে রাখতে চায় তার অসারতার স্পষ্ট প্রমান হয়ে ধর্ম টিকে থাকবে।

আর্নেস্ট রিনান

ফরাসি ইতিহাসবিদ



ফিলিপ হিট্টি

লেবাননের ইতিহাসবিদ

সত্য শরিয়া

“ইসলামই শরিয়া ধর্মীয় কি এবং পার্থিব কি এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করেনা। তা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য বিবৃত করে সুবিন্যস্ত করে। একই ভাবে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কও বিবৃত করে। দীন দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর সব বিধি নিষেধ কোরআনে বিদ্যমান আছে। কোরআনে ছয় হাজার বা তারও বেশী আয়াত আছে। এর মাঝে প্রায় এক হাজার আয়াত শরিয়তের বিধি-বিধান সংক্রান্ত।”

এমন ধর্ম খাম-খেয়ালীর কোন জায়গা নেই

“আমরা মনে করি, মুহাম্মাদ সঃ মদিনাতে যে উষ্ণ স্বাগতম পেয়েছিলেন এর অন্যতম কারণ হল, মদিনার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে মনে হয়েছে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া হল, মদিনায় বিরাজমান বিশৃঙ্খলার সমাধান। কারণ তারা ইসলামে দেখতে পেয়েছিল জীবনের শক্ত নিয়ন্ত্রণ, এবং মানুষের অবাধ প্রবৃত্তি একটি সুবিন্যস্ত নিয়ম নীতির আওতাধিন। তা এমন ক্ষমতা কর্তৃক প্রণীত যা ব্যক্তি প্রবৃত্তির উর্ধ্বে। “

টমাস আর্নল্ড

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



শান্তির গ্যারান্টি একমাত্র দ্বীনই দিতে পারে। দ্বীনই পারে সমাজে আরাম ও শান্তি দিতে। এর গুরু রহস্য হলো, মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা, যেহেতু তার চলাফেরা, আচার আচরণ ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে এমন জিনিস যা শ্রবণ ও দৃষ্টির বাইরে।আর তা হলো, এমন ঈমানী বিশ্বাস যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, অঙ্গ প্রতঙ্গকে পবিত্র করে এবং তাকে প্রকাশ্য বিষয়গুলোর মত গোপনীয় সব বিষয়েও সচেতন করে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ

{যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল,তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন।} [ত্বহাঃ ৭]

অতএব মানুষ সর্বদাই তার সঠিক বা ভ্রান্ত আকিদার দ্বারা পরিচালিত। যখন তার আক্বীদা সঠিক হবে, তখন তার সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আর যখন তার আক্বীদা ভ্রষ্ট হবে তখন তার সব কিছুই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট হবে। মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা বিধানের ক্ষেত্রে দ্বীন হলো উত্তম রক্ষক। এজন্যই ইহা সমাজের জন্য আবশ্যক। একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যে, শরীরে কৃলবের যেমন স্থান তেমনি সমাজে দ্বীনের স্থান।

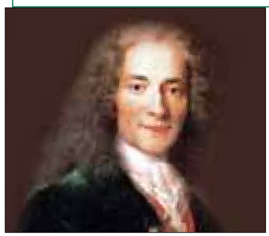
দ্বীনের যখন এত গুরুত্ব , আবার দেখা যায় বিশ্বে নানা ধর্ম ও মতবাদ রয়েছে এবংপ্রত্যেক জাতিই তাদের ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট আছে; তাহলে কোনটি সঠিক দ্বীন যা মানবাত্মার সব ধরণের প্রয়োজন মিটাতে পারে। আর সঠিক দ্বীনের শর্তাবলী ও নিয়মাবলীই বা কি?

আপনাদের বিবেগ কোথায়?

“কেন তোমরা আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি কর? তিনি যদি না থাকতেন তবে আমার স্ত্রী আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং আমার সেবক আমাকে চুরি করে নিয়ে যেত।”

ভলতেয়ার

ফরাসি দার্শনিক





সত্য ধর্মের শর্ত ও নিয়মাবলী

সর্বদা প্রত্যেক আক্বীদায় বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, সে যে বিশ্বাস করে সেটাই গ্রহণযোগ্য ও সত্য, অন্যেরটা মিথ্যা। এ ক্ষেত্রে নিজেদেরটা নির্ভুল প্রমাণ করতে প্রত্যেক আক্বীদার লোকেরা নানারকম যুক্তি দিয়ে থাকে। মানবরচিত ভ্রান্ত আক্বীদা বা ভ্রষ্ট রূপান্তরিত আক্বীদার লোকেরা নিজেদের আক্বীদাকে নির্ভুল প্রমাণ করতে বলে থাকেন, আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে এ আক্বীদার উপর পেয়েছি, তাই আমরা তাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ{এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না।} [যুখরুফঃ ২৩-২৪]

আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা’আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। বস্তুতঃ এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির মুক, এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না।} [বাকারাঃ ১৭০-১৭১]

তারা তাদের এ অবস্থানকে দৃঢ় করতে জ্ঞানহীনভাবে কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই অন্ধ অনুসরণের উপর নির্ভর করে। অথবা মিথ্যা, ভ্রান্ত, পরস্পর বিরোধপূর্ণ যার কোন সনদ ও দলিল নাই এমন সব সংবাদ ও রেওয়াতের উপর নির্ভর করে। ফলে এসব ধর্ম, মতবাদ ও বিশ্বাসের কোন দলিল প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।

সত্য যেহেতু একটিই, একাধিক হতে পারেনা, তাই সব আক্বীদার লোকেরাই সঠিক তা বলাও অসম্ভব। কেননা এতে সত্য পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে। আর ইহা সুস্থ বিবেক অস্বীকার করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [নিসাঃ ৮২]

তাহলে সত্য ধর্ম কোনটি? এর বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী কি যাতে আমরা হুকুম দিতে পারি এ আক্বীদার বিশ্বাসীরা সত্য ও সঠিক আর ইহা ছাড়া অন্যরা ভ্রান্ত ও বাতিল -যাদের মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী পাওয়া যাবেনা-।

সত্য ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী হলোঃ।

।প্রথমতঃ ধর্মটির মূল উৎস হবে খোদা প্রদত্ত। অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসবে। আল্লাহ তায়া'লা ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবী রাসুলের দ্বারা বান্দাহদের কাছে তার বাণী অবতীর্ণ করবেন। কেননা সত্য ধর্ম হলো এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়া'লার প্রেরিত ধর্ম। তিনি তাদের কাছে যে ধর্ম প্রেরণ করেছেন কিয়ামতের দিবসে সে ব্যাপারে সৃষ্টিকূলের কাছ থেকে হিসেব নিবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি,ইসমাঈল,ইব্রাহীম,ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব,ইউনূস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল,প্রাজ্ঞ।} [নিসাঃ ১৬৩-১৬৫]

এর উপর ভিত্তি করে বলতে পারি, যে সব ধর্মকে আল্লাহর দিকে নিসবত বা সম্পর্কিত না করে কোন ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত করা হয় তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বাতিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যেসব ধর্ম মানুষের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, মানুষ এতে কোন কিছু সংযোগ করে, ইহাকে সজ্জিত করে সে ধর্মও দ্বিধাহীনভাবে বাতিল। কেননা যে ব্যক্তি ধর্মটি উন্নত ও পরিবর্তন করল সে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর চেয়ে বেশী জ্ঞাত নন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [মুলকঃ ১৪]

একত্ববাদ

ইসলামের মৌলিক বাস্তবতা হল একত্ববাদ। আল্লাহ এক, মুহাম্মদ সঃ আল্লাহর তায়ালার রাসুল। এতে শিরকের কোন জায়গা নেই। তাই এতে নেই কোন পিতা, নেই কোন পুত্র। ঐশ্বী ও পার্থিব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলতে কোন ভাগ নেই। এখানে এক জগত এক ধর্ম।

মিখাইল হিমষ
ইংরেজ লেখক





তা নাহলে উন্নয়নকারী বা শরিয়ত প্রবর্তকই রব ও ইলাহ হতেন, যিনি সৃষ্টির ভাল মন্দ সম্পর্কে জানবেন। আল্লাহ তায়া’লা এমন শরীক হতে অনেক উর্ধ্বে। তিনি বলেনঃ {তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।} [আলে ইমরানঃ ৮৩]

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেনঃ {অতএব,তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে।} [নিসাঃ ৬৫]

দ্বিতীয়তঃ ধর্মটি এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করবে। শিরককে হারাম করবে। তাওহীদের প্রতি দাওয়াত সব নবী রাসুলেরই মূল দাওয়াত ছিল। শিরক ও পৌত্তলিকতা সুস্থ স্বভাব ও জ্ঞানবান বিবেক অস্বীকার করে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।} [আম্বিয়াঃ ২৫]

প্রত্যেক নবীই তাদের জাতিকে বলেছেনঃ {সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।} [আ'রাফঃ ৫৯]

অতএব, যে ধর্মই শিরককে মেনে নেয় বা আল্লাহর সাথে কোন নবী রাসুল, ফেরেশতা, অলী, মানুষ বা পাথর ইত্যাদির অংশীদার করে সে সব ধর্ম বাতিল। কেননা ইবাদত শুধুমাত্র এক আল্লাহর, যার কোন শরিক নেই। পৌত্তলিকতা ও শিরক স্পষ্ট ভ্রান্ততা, ভ্রষ্টতা। যে কোন ধর্মই এমনকি যদিও



ইহা অসম্ভব ব্যাপার ও শিরক।

“ছোট শিশুদের কাছেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগাম প্রবণতা আছে। কারণ তারা মনে করে, এ জগতের সব কিছু কোন কারণে সৃজিত হয়েছে। বরং আমরা যদি কিছু শিশুকে একাকী কোন দীপে ফেলে আসি , তারা নিজে নিজে বেড়ে ওঠে তাহলেও তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। “

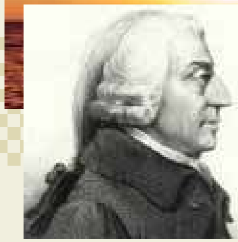
গ্যাষ্টন ব্যারেট

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক গবেষক

তা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে যদি এতে শিরক প্রবেশ করে তাহলে তা বাতিল। আল্লাহ তায়া’লা এ ব্যাপারে উদাহরণ পেশ করে বলেনঃ {হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর,মহাপরাক্রমশীল।} [হাজ্বঃ ৭৩-৭৪]

তৃতীয়তঃ ইহা সুস্থ স্বভাবের সাথে একমত হতে হবে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [রূমঃ ৩০]

আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাব ফিতরত হলো যে স্বভাবের উপর মহান আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইহা তার সৃষ্টির অংশ হয়ে যায়। যেহেতু দ্বীন মানুষের স্বভাবের উপযোগী হবেনা এটা হতে পারেনা। তা নাহলে সৃষ্টিকর্তা উক্ত দ্বীনের প্রবর্তক নয়।



কুসংস্কারের প্রতিষেধক

“বিজ্ঞান হল বিষাক্ত কুসংস্কারের প্রতিষেধক”

অ্যাডাম স্মিথ

স্কটিশ দার্শনিক





প্রমাণ দাও

“প্রজ্ঞাবান হল সে ব্যক্তি যে প্রমানের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাস করে।”

ডেভিড হিউম

স্কটিশ দার্শনিক

নীতির মাধ্যমে মানুষ

“নীতিহিন ব্যক্তি হল এমন হিংস্র জন্তু যাকে এ জগতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।”

অ্যালবার্ট কামু

ফরাসি দার্শনিক



চতুর্থতঃ সুস্থ আকল বা বিবেকের সাথে একমত হতে হবে। কেননা সত্য ধর্ম আল্লাহর শরিয়ত, আর সুস্থ বিবেকও আল্লাহর সৃষ্টি, তাই আল্লাহর শরিয়ত ও আল্লাহর সৃষ্টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হবে এটা অসম্ভব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।} [হাজ্বঃ ৪৬]

তিনি আরো বলেনঃ {নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক [বৃষ্টি] বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এগুলো আল্লাহর আয়াত,যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। অতএব, আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে।} [জাসিয়াঃ ৩-৬]

সত্য ধর্ম কাল্পনিকতা, কুসংস্কার বা পরস্পর অসঙ্গতি দ্বারা পূর্ণ থাকতে পারেনা। ইহা সুস্থ বিবেকের পরিপন্থী। এক সময়

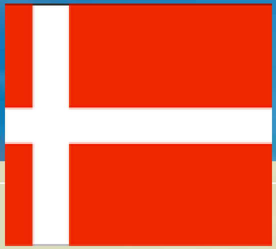


একটি আদেশ দিবেন আবার অন্য সময় অন্য আরেকটি আদেশ দিবেন, একটি জিনিসকে হারাম করবেন, অতঃপর তা একদলের জন্য জন্য তা জায়েজ করবেন, আবার অন্যদের জন্য হারাম করবেন, অথবা সদৃশ বিষয়ে পার্থক্য করবেন, বা বিরোধপূর্ণ দুটি বিষয় একত্রিত করবেন সত্য ধর্ম কখনোই এরূপ হতে পারেনা।

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত,তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [নিসাঃ ৮২]

বরং সুস্পষ্ট দলিল প্রমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দিন,তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।} [বাকারাঃ ১১১]

পঞ্চমতঃ সদাচরণ এবং সৎকর্মের দিকে আহ্বানকারী হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তাএই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা,সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা,অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।} [নাহলঃ ৯০]

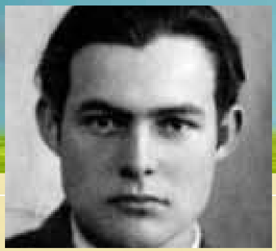


বাস্তববাদী হোন

“জীবনের প্রতি বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিক পরামর্শ, এবং আত্মপরিশুদ্ধি, দয়া ও কল্যাণমুখী গভীর মানবিকবোধের প্রতি আহবান সহ আরো বিভিন্ন উপকরণ আমার কাছে ইসলাম ধর্মের সত্যতার সব চেয়ে বড় প্রমান।”

জুল

ডেনিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



নীতিতে প্রশান্তি

“আমার জানা মতে নৈতিক কাজ হল, যা করার পর প্রশান্তি অনুভব করবে। আর অনৈতিক হল, যা করার পর অস্বস্তি বোধ করবে।”

আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে

আমেরিকান লেখক

অতএব যে সব ধর্ম মিথ্যাচার, হত্যা, জুলুম, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, অবাধ্যতা ইত্যাদির দিকে ডাকে তা কখনই ধর্ম হতে পারেনা।

ষষ্ঠতঃ মানুষের সাথে তার স্রষ্টার সম্পর্ক ও সৃষ্টির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক গঠন করবে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ

{তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে,তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।} [ইউসুফঃ ৪০]

তাই সত্য ধর্ম স্রষ্টার প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, এমনিভাবে সৃষ্টজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক গঠন নিয়ন্ত্রণ করবে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্নীয়,এতীম-মিসকীন,প্রতিবেশী,অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।} [নিসাঃ ৩৬]

সপ্তমতঃ মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দিবে। জাতি, বর্ণ ও গোত্রভেদে কোন পার্থক্য করবেনা। সম্মান ও পার্থক্যের মাপকাঠি হবে মানুষের অর্জন ও তার কর্ম তথা জ্ঞান ও খোদাভীতি। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি।} [বনী ইসরাইলঃ ৭০]

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেনঃ {হে মানব,আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ,সবকিছুর খবর রাখেন।} [হুজুরাতঃ ১৩]

অষ্টমতঃ ধর্মটি সরল সঠিক পথ দেখাবে, যেপথে কোন বক্রতা নেই। এতে থাকবে মানুষের মুক্তি, ইহা হবে তাদের জন্য আলোকবর্তিকা ও পথপ্রদর্শক। জীন জাতি যখন কোরআন শ্রবণ করে পরস্পরে আলোচনা করতেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তারা বলল,হে আমাদের সম্প্রদায়,আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে।} [আহকাফঃ ৩০]

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেনঃ {আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।} [বনী ইসরাইলঃ ৮২]

এ আলোকবর্তীকা ও পথ প্রদর্শক মানুষকে অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতা থেকে আনুগত্যের আলো এবং দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির পথে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।} [মায়েদাঃ ১৫]



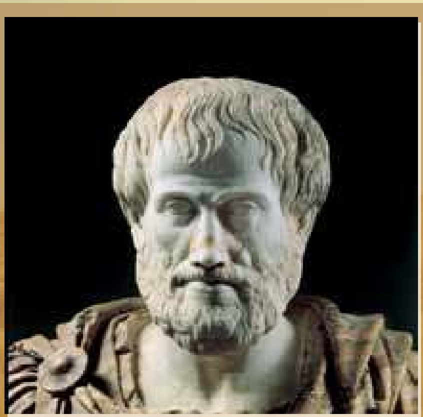
উত্তম উত্তরাধিকার

“ইসলাম সভ্য জগতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন যা দিয়েছে তা হল এর ধর্মীয় আইন, যাকে শরীয়া বলা হয়। ইসলামই শরীয়া সে ক্ষেত্রে এক অনন্য জিনিস। তা হল ঐশী বিধিবিধান যা মুসলিমের জীনকে সর্বাঙ্গিন ভাবে সুশৃঙ্খলিত করে। এতে আছে এবাদত ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধান। আরো আছে দেশ পরিচালনা ও আইনের মূলনীতি। “

জার্মান প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

জোসেফ শ্যাক্ট

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী,চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। } [বাকারাঃ ২৫৬-২৫৭]



অসমতা

"সবচেয়ে খারাপ ধরনের অসমতা হল, অসম বস্তুগুলোর মাঝে সমতার প্রচেষ্টা চালানো।"

অ্যারিস্টটল

গ্রিক দার্শনিক



আল্লাহর সাহায্য কামনা করো

"এখন যে হাজার হাজার ব্যথিত মানুষ মানসিক হাসপাতাল গুলোতে চিৎকার করছে, তারা যদি অবলম্বন ও সহযোগী হীনভাবে একাকী জীবন যুদ্ধে অবতীর্ন না হয়ে প্রভুর সাহায্য কামনা করতো তাহলে তাদের মুক্তির হয়তো সম্ভাবনা ছিল।"।

ডেল কার্নেগী

মার্কিন লেখক

কোন ধর্ম আমাদের প্রয়োজন?

কোন ধর্মেউপরোল্লিখিত সত্য ধর্মের মাপকাঠিগুলো বাস্তবায়িত হয়?

মূল উৎস হিসেবে ধর্মকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথমটিঃ দুনিয়ার মানব রচিত ধর্ম যা আসমানী ধর্ম নয়। যার নিয়মকানুন নির্ধারণ করেছে মানুষ, মানুষের হাতেই তা উন্নতি লাভ করেছে। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ নয়। যেমনঃ বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, মাজুসি ও পৌত্তলিক ধর্ম। এ সব ধর্ম সত্য ধর্মের থেকে অনেক দূরে, তাদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী এ সব ধর্মের আবিষ্কার হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?} [জাসিয়াঃ ২৩]

এ সব ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম নয়। বরং মানুষের খেয়াল খুশীর ধর্ম। এজন্যই এসব ধর্ম অনেক কুসংস্কার, ভণ্ডামি, শ্রেণী বিন্যাস ও অসঙ্গতিতে ভরপুর। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [নিসাঃ ৮২]



কিন্তু আল্লাহ এক

গবেষকরা পার্থিব সকল ধর্মের উপাস্যদের পরিসংখ্যান করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন। প্রাচীন মিশরের উপাস্য হল ৮০০ থেকেও বেশী। হিন্দুদের উপাস্য ১০০০০ থেকেও বেশী। আর উপাস্যের এমন অংশীদারিত্ব ছিল গ্রীসে বৌদ্ধ ধর্মে ও আন্যান্য পার্থিব ধর্মাবলম্বীদের নিকট।

দ্বিতীয়টিঃ আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত আসমানী ধর্ম। যেমনঃ {ইহুদী, খৃষ্টান, ও ইসলাম ধর্ম। এ সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য আল্লাহ তায়া'লা শরিয়ত প্রেরণ করেছেন এবং উক্ত শরিয়তকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।} [শুরাঃ ১৩]

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীতে মানব রচিত ধর্মগুলো নানা চিন্তা ভাবনা ও মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত, যা মানুষের ইচ্ছামত যা তাদের উপযোগী তা প্রবর্তন করে থাকে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে যখন দেখে এ সব কিছু মানুষের জন্য উপযোগী নয় তখন তারা ইহার উন্নয়ন করতে চেষ্টা করে। এভাবেই তারা সর্বদা দিশেহারা ও অস্থিরতায় থাকে। এসব শরিয়তের বৈশিষ্ট্য হলোঃ

শিরকঃ প্রত্যেক দিনই তারা নতুন নতুন ইলাহ তৈরি করে। তাদের ইলাহগণ নিজেদের হাতের তৈরি। তারা লক্ষ্য ও চিন্তা করেনা যে আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ থাকা অসম্ভব, কেননা এতে উভয়ের মাঝে দ্বন্ধ অনিবার্য। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।} [মু'মিনুনঃ ৯১-৯২]

শ্রেণী বিন্যাসঃ যে সব ধর্ম আসমানী নয় তা মানুষের মাঝে অনেক শ্রেণী ও স্তর করে থাকে। কেননা ইহার প্রবর্তকেরা নিজেদের জন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বানায় যা অন্যদের মাঝে নেই। যাতে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে ও অন্যরা তাদের উপসনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ





সত্য শরিয়া

"আমি ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছি, মানুষের যেটা দরকার তা হল, ঐশী জীবন ব্যবস্থা। যা সত্যকে সত্যায়িত করবে আর ভ্রান্তিকে অবদমিত করবে।"

টলষ্টয়
রুশ সাহিত্যিক

{হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ,সবকিছুর খবর রাখেন।} [হুজুরাতঃ ১৩]

আল্লাহ তায়া'লা কারো দিকে উপহাস ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।} [হুজুরাতঃ ১১]

এজন্যই আল্লাহর কাছে সাদা কালো, জাতি উপজাতি, গোত্র ইত্যাদির কোন মূল্য নেই, অন্যদিকে মানব রচিত ধর্মগুলোতে ভয়ানক শ্রেণী বিন্যাস দেখা যায়।

স্বভাবজাতের বিপরীত হওয়াঃ মানব রচিত ধর্মগুলো স্বাভাবিক স্বভাবের বিপরীত হবে। মানুষকে সেসব কাজ করতে বাধ্য করবে যা তাদের করা সমূচীন নয়। স্বাভাবিক স্বভাব ও সুস্থ বিবেকের বৈপরিত্যে অনেক কাজ করতে বলা হবে। এর অনুসারীরা সরল সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে, তারা সঠিক পথকে অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [রূমঃ ৩০]



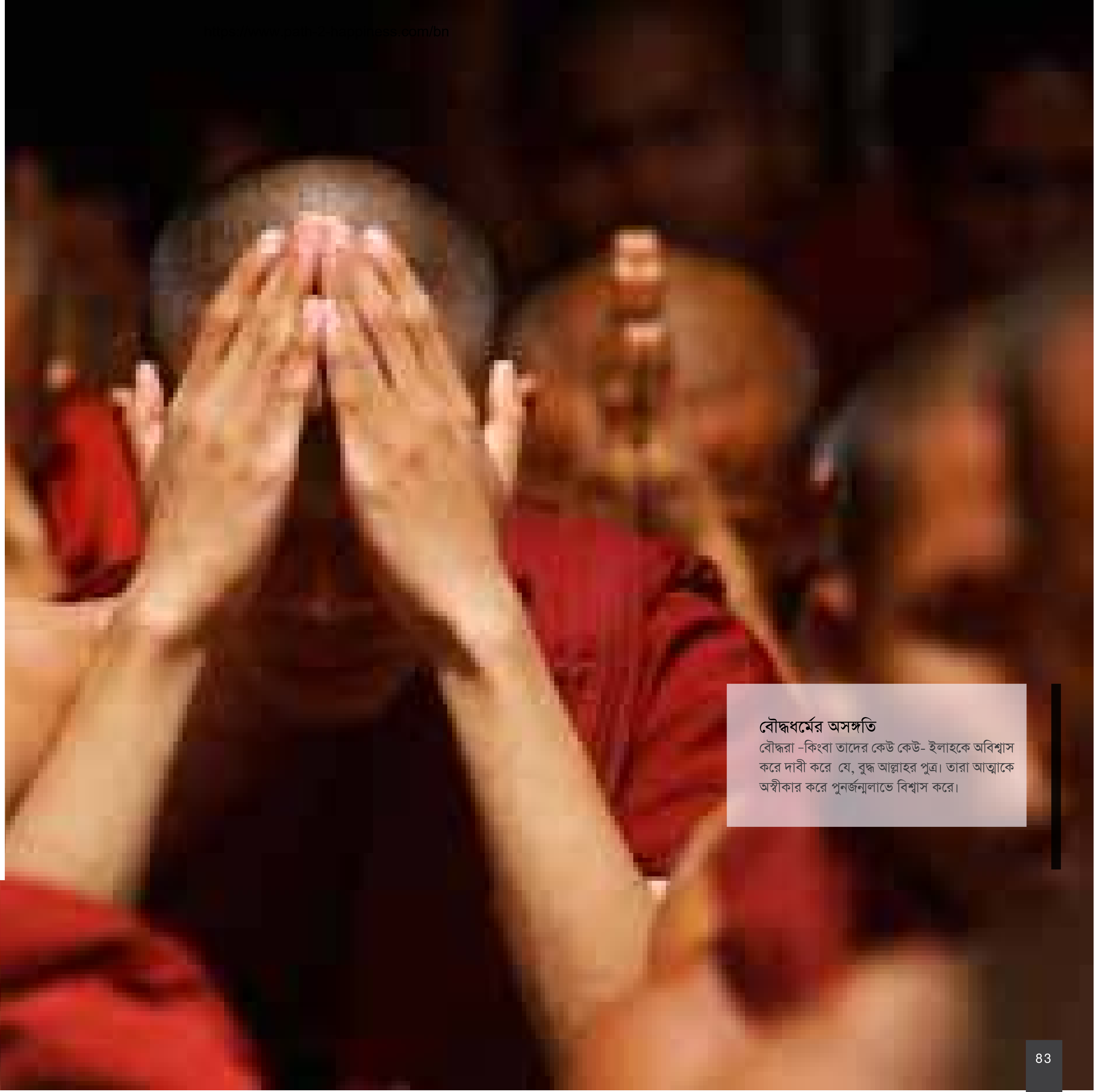
অন্যায্য শ্রেণীবিন্যাস

হিন্দু স্তরবিন্যাস নিম্নরূপঃ সাদা স্তর, এতে পরিগণিত হয় ধর্ম গুরু ও পণ্ডিত বর্গ। লাল স্তর, এতে পরিগণিত হয় রাজা বাদশা ও অশ্বারোহীরা। হলুদ স্তর, এতে পরিগণিত হয়, কৃষক ও বণিকরা। কাল স্তর, এতে পরিগণিত হয়, হস্তকলা ও খুদ্র শিল্পজীবীরা। আর পঞ্চম স্তর কিংবা অচ্ছুত স্তর নামে যা পরিচিত এতে পরিগণিত হয় নিন্ম পেশাজীবীরা। উচু শ্রেণী নিচু শ্রেনীকে দাস মনে করে আর নিচু শ্রিনী উচু শ্রেণীর সেবা করে।

কুসংস্কারঃ ইহা কাল্পনিক ও ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাস যার কোন বিবেক প্রসূত বা যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক কোন কারণ নেই। মানব রচিত ধর্মগুলো কুসংস্কার ও কল্পকাহিনীতে ভরপুর, যার কোন দলিল নেই। একটি কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে আরেকটি কুসংস্কার তৈরি করে। আল্লাহ তায়া'লা যথার্থই বলেছেনঃ {বলুন,তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।}{ }[নমলঃ ৬৪]

বৈপরীত্যঃ এসব ধর্মগুলো বৈপরীত্যে ভরপুর। প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠী পরস্পর বিরোধী কাজ কর্ম করে নিজেদের ধর্মের উন্নয়ন করে। আল্লাহ তায়া'লা যথার্থই বলেছেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।}[নিসাঃ ৮২]

অন্যদিকে আসমানী ধর্মগুলো আল্লাহ তায়া'লার নেয়ামত যা তিনি মানব জাতিকে দান করেছেন। যাতে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হন ও সঠিক পথের দিশা পান। কুসংস্কার, শিরক, স্বভাব ও বিবেকের বৈপরীত্য ইত্যাদিতে ঘূর্ণায়মানদের বিরুদ্ধে যাতে দলিল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নবী রাসুল প্রেরণ করে তাদের কাছে এ ধর্মপৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল,প্রাজ্ঞ।}[নিসাঃ ১৬৫]



বৌদ্ধধর্মের অসঙ্গতি

বৌদ্ধরা -কিংবা তাদের কেউ কেউ- ইলাহকে অবিশ্বাস করে দাবী করে যে, বুদ্ধ আল্লাহর পুত্র। তারা আত্মাকে অস্বীকার করে পুনর্জন্মলাভে বিশ্বাস করে।

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness



নবী ও রাসুলগণ

সূচিপত্র

নবী ও রাসুলগণ



নবী ও রাসুলগণ

মানুষের জন্য কি নবী রাসুলের প্রয়োজনীয়তা আছে?

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সুস্থ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সত্য মিথ্যা নিরুপন করতে বিবেক দান করেছেন। যেহেতু মানুষের বিবেকবুদ্ধি ভুল ত্রুটি, অপূর্নাঙ্গতা, প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরায়নতা ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়; বরং এতে ভিন্নতা ও বৈপরীতও দেখা যায়। কেউ একটা জিনিসকে ভাল মনে করেন অন্যদিকে আরেকজন সেটাকে খারাপ মনে করেন। বরং একই ব্যক্তি স্থান, কাল পাত্রভেদে তার মত পরিবর্তন করে করে থাকেন। অপর দিকে যেহেতু মানুষের বিবেক অদৃশ্য জিনিস বুঝতে এভাবে ভিন্ন হয়ে থাকে তখন অদৃশ্য বিষয় যা অনেক সময় জ্ঞান বুঝতে অক্ষম বুঝতে কতটা বেগ পাবে?! সে সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আদেশ নিষেধ বুঝতে আরো বেশী অক্ষম। কেননা মানুষ আল্লাহকে তো সরাসরি দেখতেও পায়না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।} [শুরাঃ ৫১]

এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর ও বান্দাহর মাঝে দূত হিসেবে তাঁর সৃষ্টির সর্বোত্তম বান্দাহদের থেকে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা।} [হাজ্বঃ ৭৫]

তারা মানুষদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তার পথ দেখান। তাদেরকে অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। যাতে করে নবী রাসুলদের পরে আল্লাহর কাছে মানুষের কোন অজুহাত বা প্রমাণ না থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।} [নিসাঃ ১৬৫]

সাদামাটা হোন

"মুহাম্মাদ যখন মর্যাদার চূড়ায় তখনও তিনি সাদামাটা অবস্থা বজায় রেখেছিলেন। তাই যখন তিনি কোন কক্ষে কোন সমাবেশে উপস্থিত হতেন তখন তার সম্মানে দাঁড়ালে কিংবা বেশি স্বাগত জানালে তিনি তা অপছন্দ করতেন। "

ওয়াশিংটন আইরায়ভিং

আমেরিকান কূটনীতিক ও লেখক



তাই নবী রাসুল প্রেরণ মানুষের জন্য আল্লাহ তায়া'লার অনেক বড় নেয়ামত। যাতে তারা মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন সেসব জিনিস যা তাদের উপকারী ও তাদেরকে নানা পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।} [আলে ইমরানঃ ১৬৪]

আল্লাহর বড় নেয়ামত হলো তিনি মানুষের মধ্যে নবী রাসুল {পাঠিয়েছেন আবার নবী-রাসূলদেরকে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করেছেন।} মানুষের জন্য নবী রাসুল প্রেরণের এ নিয়ামত আরো বেশী স্পষ্ট হয় যেহেতু তারা আল্লাহর ভাষায় মানুষকে সম্বোধন করেছেন। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব, গুনাবলী তাদেরকে বর্ণনা করেছেন। উলুহিয়্যাতের মূল ও ইহার বৈশিষ্ট্যাবলী মানুষকে জানিয়েছেন। অতঃপর তারা এ ক্ষুদ্র নগণ্য মানুষের মর্যাদা, তাদের জীবন, চলাফেরা ও বসবাস ইত্যাদি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদির দিকে আহবান করেছেন। আসমান ও জমিনের চেয়ে বিস্তৃত জান্নাতের দিকে ডেকেছেন। এসব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাহর জন্য বহমান নিয়ামত, ইহ তাঁর অনুগ্রহ ও দান। বরং নবী রাসুলগণ মানুষকে পবিত্র করেছেন, তাদের মর্যাদা বুলন্দ করেছেন, তাদের অন্তর, ধ্যান ধারণা ও অনুভূতিকে পবিত্র করেছেন, তারা তাদের ঘর বাড়ি, সম্মান, ধন সম্পদ ইত্যাদি পবিত্র করেছেন। তাদের জীবন, সমাজ জীবন ব্যবস্থাকেও পবিত্র করেছেন। শিরক, পৌত্তিকতা, কল্পকাহিনী ও পৌরাণিক গল্প ইত্যাদির অপবিত্রিতা থেকে মানুষকে পবিত্র করেছেন। জীবন যাপনের জন্য আরো যা কিছু আছে যেমনঃ আচার অনুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি, ঐতিহ্য এককথায় সব ধরণের মানবতাবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। তারা জাহেলী যুগের অপবিত্রতা যা মানুষের অনুভূতি, অনুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও

মৌলিকধারণাকে কলুষিত করেছে তা থেকে মানুষকে পবিত্র করেছেন। জাহেলিয়াত তো জাহেলিয়াতই, সব জাহেলী যুগেই রয়েছে অন্ধকার ও অপবিত্রতা, যা কোন সময় ও স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়, যখনই মানুষের অন্তর এক আল্লাহর বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই তাদের জীবন জাহেলী যুগের ধ্যান ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তখন মানুষকে এ অন্ধকার থেকে মুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। জাহেলী যুগ বলতে সব জাহেলীয়াতকে বুঝায় যা আগের যমানায় হোক বা বর্তমান যমানায় হোক। যেখানেই আখলাক চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়েছে তাই জাহেলী যুগ, চাই সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হোক, শিল্প উৎপাদন হোক,বা সাংস্কৃতির সমৃদ্ধি হোক। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।} [জুমআঃ ২]

এখানে পথ ভ্রষ্টতা বলতে মানুষের ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের ভ্রষ্টতাকে বুঝানো হয়েছে। জীবনের সব ধরণের অর্থের ভ্রষ্টতা, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ভ্রষ্টতা, অভ্যাস ও আচার আচরণের ভ্রষ্টতা, জীবন ব্যবস্থা ও অবস্থানের ভ্রষ্টতা, সমাজ ও আখলাকের ভ্রষ্টতা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

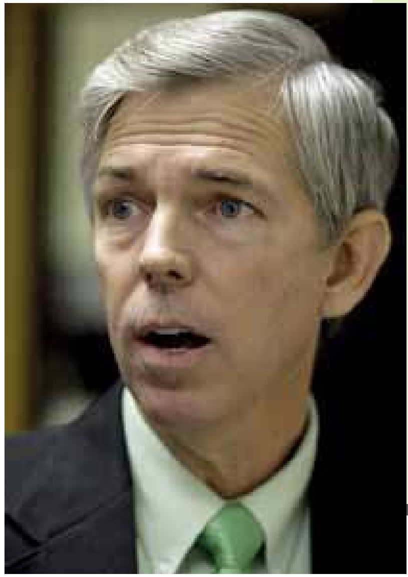


মানুষ হিংস্র, ধর্ম যদি তাকে নিরস্ত না করে

ডেভিড বার্টন রচিত [আমেরিকা প্রার্থনা করে বা না করে]গ্রন্থে প্রকাশিত আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চালানো পরিসংখ্যান মোতাবেক
- ৮০% মার্কিন নারী মিন্মে একবার জীবনে ধর্ষণের শিকার হয়।
- দৈনিক ১৯০০ জন নারী ধর্ষিত হয়। যার ফলে ৩০% জন মার্কিন যুবতী চৌদ্দ বছর বয়সে গর্ভ কিংবা গর্ভপাত কিংবা প্রসবের মুখোমুখী হয়।
- ৬১% ধর্ষণ ঘটে আঠার বছরের কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে।
- ২৯% ধর্ষন হয় ১১ বছরের কম শিশুদের ক্ষেত্রে।

ডেভিড বার্টন

আমেরিকান লেখক



নবুয়াত ও রিসালাতের হাক্বিকত

আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম নেয়ামত হলো তিনি নবী রাসুলগণকে মানুষের মধ্য থেকেই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।} [নাহলঃ ৪৩]

তারা স্বজাতির ভাষায় কথা বলেছেন, যাতে তাদের ভাষা স্বীয় সম্প্রদায়ের বোধগাম্য হয়, তাদের কথার অর্থ বুঝতে পারেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।} [ইবারাহীমঃ ৪]

আম্বিয়া ও রাসুলগণ পূর্ণ জ্ঞান ও সুস্থ স্বভাব, সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা ও মানবিক সব ধরণের ত্রুটি থেকে মুক্ত ইত্যাদি গুনে গুণান্বিত ছিলেন। সে সব শারীরিক দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন যা মানুষের চোখে পড়ে ও সুরুচির পরিপন্থী। আল্লাহ তায়া'লা নিজেই তাদেরকে পবিত্র ও শ্রেষ্ট চরিত্রবান করেছেন। চারিত্রিক দিক থেকে তারা সবচেয়ে পরিপূর্ণ, অন্তরের দিকে সবচেয়ে পবিত্র ও সবচেয়ে সম্মানিত। আল্লাহ তায়া'লা তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের সব গুন দান করেছেন।



উত্তম গুনের যা কিছু আছে সবই দিয়েছেন, তিনি তাদের মাঝে দান করেছেন ধৈর্য, জ্ঞান, উদারতা, সম্মান, দানশীলতা, বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা। যাতে এসব আখলাকের কারণে তারা নিজ জাতির কাছে আলাদা বৈশিষ্ট্যে পরিচিত হন। রাসুলগণ হলেন আল্লাহ তায়া'লার সর্বোত্তম সৃষ্টি, তিনি তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন তার রিসালাত ও আমানত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ এ বিষয়ে সুপারিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।} [আন'আমঃ ১২৪]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম [আঃ] নূহ [আঃ]- ও ইব্রাহীম [আঃ] এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন।} [আলে ইমরানঃ ৩৩]

আল্লাহ তায়া'লা ঈসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত। যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।} [আলে ইমরানঃ ৪৫-৪৬]

মুহাম্মদ [সাঃ] নবুয়্যাত প্রাপ্তির আগে নিজ জাতির নিকট "আল আমিন" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, আল্লাহ তায়া'লা তার গুন বর্ণনা করে বলেনঃ {আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [কালমঃ ৪]

এসব নবী রাসুলগণ যদিও সর্বোত্তম গুনের অধিকারী ছিলেন কিন্তু তারা সকলেই মানুষ ছিলেন, মানুষের সব ধরণের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তারা ক্ষুধার্ত হতেন, রোগাক্রান্ত হতেন, খেতেন ও ঘুমাতেন, বিবাহ করতেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।} [রা'দঃ ৩৮]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।} [যুমারঃ ৩০]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রাসুল মুহাম্মদ [সাঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন।} [আহযাবঃ ৩৭]

এজন্যই তারা নির্যাতিত হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন এমনকি নিজ দেশ থেকেও বিতাড়িত হয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।} [আনফালঃ ৩০]



নবী রাসুলের আলামত ও লক্ষণসমূহঃ

কিন্তু দুনিয়া ও আখেরাতের শেষ পরিণাম, সাহায্য ও বিজয় তাদেরই হয়েছে। আলাহ তায়া'লা যাদেরকে বান্দাহদের কাছে নবী রাসুল করে পাঠিয়েছেন তাদেরকে চেনা ও তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই কিছু দলিল-প্রমাণ ও লক্ষণ থাকতে হবে। এগুলো প্রমাণ করবে যে, তারা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত, যাতে তারা মানুষের বিপক্ষে কিয়ামতের দিনে সাক্ষ্য দিতে পারেন। আর তাদেরকে সত্যায়ণ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেন মানুষের কোন ওযর না থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি।} [হাদীদঃ ২৫]

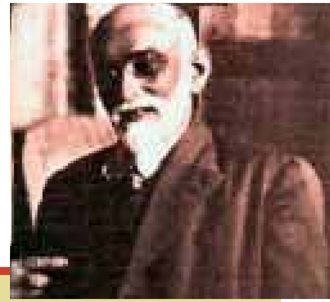
নবী রাসুলের সত্যতা প্রমাণে অনেক দলিল প্রমাণ ও আলামত রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো হলোঃ

১- আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুলদেরকে মুজিযা ও নিদর্শন দিয়ে শক্তিশালী করেন। মুজিযা হলো, আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুলদের মাধ্যমে এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটান যা বিশ্বের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ও মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমনঃ মূছা [আঃ] এর লাঠি, যা



সাপে পরিণত হত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? তিনি বললেনঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজ ও চলে। আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ বললেনঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শন রূপে; কোন দোষ ছাড়াই। এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই।} [ত্বহাঃ ১৭-২৩]

ঈসা [আঃ] এর মু'জিযা ছিল তিনি কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ করতেন। আল্লাহ তায়া'লা মারিয়ামের [আঃ] ভাষায় ঈসা [আঃ] এর জন্মের সুসংবাদ সম্পর্কে এভাবে বলেনঃ {তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত, ইঞ্জিল। আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমুহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা- তাঁর এবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ। } [আলে ইমরানঃ ৪৭-৫১]



চিরন্তন অলৌকিক ঘটনা

মুহাম্মদের সঃ এর আগের নবীদের মুজিযাগুলো বাস্তবে ছিল সাময়িক। পক্ষান্তরে আমরা কোরানকে বলতে পারি চিরন্তন মুজিযা। কারণ তার প্রভাব সার্বক্ষণিক ও বিরামহীন। যে কোন মুমিন সহজেই আল্লাহর কিতাব শুধু তেলাওয়াত করেই সে মুজিযা অনুধাবন করতে পারবে। এ মুজিযাতেই আমরা খুঁজে পাই ইসলাম যে বিপুল প্রসার লাভ করেছে এর গ্রহণযোগ্য কারণ। যার কারণ ইউরোপীরা জানে না। কারণ তারা কোরআন জানে না। কিংবা তারা প্রাণহীন কিছু তর্জমা থেকে কোরআন শিখে। তা ছাড়া অনুবাদে সুক্ষ্মতার অভাব তো আছেই।

এটিন ডেন

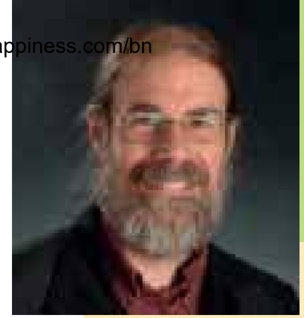
ফরাসি চিত্রশিল্পী এবং চিন্তাবিদ



আর মুহাম্মদ [সাঃ] এর সবচেয়ে বড় মুজিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন। যদিও তিনি আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর ছিলেন, লেখাপড়া জানতেননা। অথচ কোরআনের মত মহাগ্রন্থ তিনি আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে আসেন, এটাই তার সবচেয়ে বড় মুজিযা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।} [বনী ইস্রাইলঃ ৮৮-৮৯]

এছাড়াও নবী রাসুলদের অসংখ্য মু'জিযা রয়েছে। নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তিন ধরণের মু'জিযা দান করেছেনঃ জ্ঞান, কুদরত ও সম্পদ। ইলম ও জ্ঞানের মধ্যে রয়েছেঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, যেমনঃ ঈসা [আঃ] এর জাতিরা কি খেয়েছে ও কি ঘরে জমা করে রেখেছে তা তিনি বলে দিতে পারতেন। আমাদের রাসুল [সাঃ] পূর্ববর্তী উম্মতের সম্পর্কে নানা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি কিয়ামতের আলামত ও ফিতনা সম্পর্কে যে সব সংবাদ দিয়েছেন। কুদরতের মধ্যে রয়েছেঃ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে আরোগ্য করা, মৃত্যুকে জীবিত করা, রাসুল [সাঃ] কে মানুষের সব ধরণের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।} [মায়েদাঃ ৬৭]





সত্য খ্রিস্টান ধর্ম

যীশুর অগ্রসুসংবাদ মোতাবেক মুহাম্মদ সঃ খৃষ্টান ধর্মকে এর যে আসল বিশুদ্ধ রূপে পুনস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তা পোলসের ছড়ানো গোপন দীক্ষা ও বিভিন্ন খৃষ্টান পক্ষপাতী কর্তৃক অনুপ্রবেশ ঘটানো জঘন্য অনেক ভুল ভ্রান্তির পরিপন্থী। মুহাম্মদের পরম ইচ্ছা ও আকাংখা ছিল ইব্রাহীমী ধর্মের বরকত শুধু তার কাওমের জন্যই যেন সীমিত না হয়, বরং এ বরকত যেন সব মানুষকে শামিল করে। তার ধর্মের মাধ্যমেই মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ সুপথে আসে এবং সভ্য হয়। এ ধর্মের আবির্ভাব না হলে তারা অসভ্যতা ও মুর্খতার মাঝেই নিমজ্জিত থাকত। ইসলাম ধর্মে আচরিত এই ভ্রাতৃত্বও তাদের মাঝে সৃষ্টি হত না।

লেইটনে

ইংরেজ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

উক্ত তিন ধরণের মু'জিযা - ইলম, কুদরত ও সম্পদ- কোনাটাই আল্লাহর হুকুম ছাড়া সংঘটিত হতনা।

২-পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক পরবর্তী নবীগণের আগমনের সুসংবাদ দেওয়াঃ

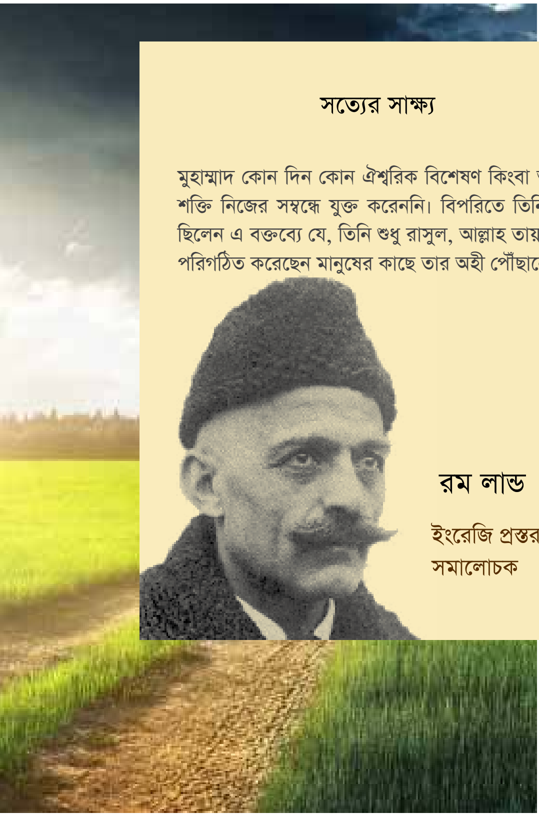
নবীদের নবুয়্যাতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ হলো, পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক পরবর্তী নবীগণের আগমনের সুসংবাদ দেওয়া। আল্লাহ তায়া'লা প্রত্যেক নবী রাসুলের থেকে অঙ্গিকার নিয়েছেন যে, মুহাম্মদ [সাঃ] যদি তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হয় তবে তার উপর ঈমান আনবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর আল্লাহ যখন নবীগনের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।} [আলে ইমরানঃ ৮১]

৩- নবী রাসুলদের আচরণবিধি ও দৃষ্টিভঙ্গিঃ

নবী রাসুলগণ স্বজাতির সাথে মেলামেশা ও লেনদেন করতেন। এভাবে তারা মানুষকে তাদের জীবনচরিত শিক্ষা দিতেন। তাদের সততা তারা বুঝতে পারত। যখন লোকজন পূতঃপবিত্র মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসা [আঃ] সম্পর্কে অপবাদ দিতে লাগল তখন আল্লাহ তায়া'লা তাদের সততা প্রকাশ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে

উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।} [মারইয়ামঃ ২৭-৩৩]

এভাবেই ঈসা [আঃ] দোলনায় কথা বলেছেন। কুরাইশরা নবুয়াতের পূর্বে মুহাম্মদ [সাঃ] কে তার সততা ও আমানতদারীতার জন্য "আল আমিন" বলে ডাকত, আল কোরআন রাসুলের সত্যতা প্রমাণে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছে। কেননা রাসুলের [সাঃ] জীবন চরিত্রই হলো সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দাও, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরেকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না?} [ইউনুসঃ ১৬]



সত্যের সাক্ষ্য

মুহাম্মাদ কোন দিন কোন ঐশ্বরিক বিশেষণ কিংবা অলৌকিক শক্তি নিজের সম্বন্ধে যুক্ত করেননি। বিপরিতে তিনি উৎসাহী ছিলেন এ বক্তব্যে যে, তিনি শুধু রাসুল, আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিগঠিত করেছেন মানুষের কাছে তার অহী পৌঁছানোর জন্য।

রম লান্ড

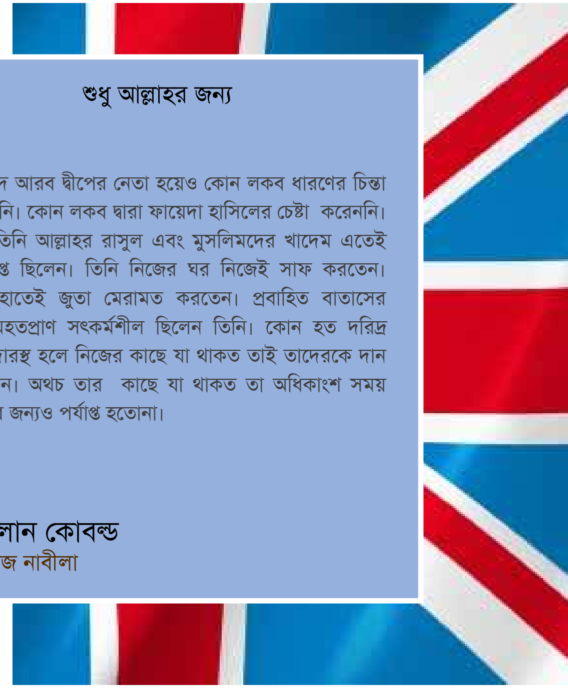
ইংরেজি প্রস্তর শিল্পী ও সমালোচক

৪- রাসুলদের দাওয়াত পর্যবেক্ষণঃ

নবীদের সত্যতার আরেকটি প্রমাণ হলো সব নবী রাসুলের দাওয়াতের মূল ছিল একই। সব নবী রাসুলগণ তাওহীদের দিকে ডেকেছেন। কেননা ইহাই মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, রাসুলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ইহাই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।} [আম্বিয়াঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে?} [যুখরুফঃ ৪৫]



শুধু আল্লাহর জন্য

মুহাম্মদ আরব দ্বীপের নেতা হয়েও কোন লকব ধারণের চিন্তা করেননি। কোন লকব দ্বারা ফায়েদা হাসিলের চেষ্টা করেননি। বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং মুসলিমদের খাদেম এতেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। তিনি নিজের ঘর নিজেই সাফ করতেন। নিজ হাতেই জুতা মেরামত করতেন। প্রবাহিত বাতাসের মত মহতপ্রাণ সৎকর্মশীল ছিলেন তিনি। কোন হত দরিদ্র তার দারস্থ হলে নিজের কাছে যা থাকত তাই তাদেরকে দান করতেন। অথচ তার কাছে যা থাকত তা অধিকাংশ সময় নিজের জন্যও পর্যাপ্ত হতোনা।

ইভলান কোবল্ড

ইংরেজ নাবীলা

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।} [নাহলঃ ৩৬]

এদিকেই মুহাম্মদ [সাঃ] তার উম্মতকে ডেকেছেন, রাসুলগণ মানুষের মতই মানুষ, তবে তাদেরকে ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ আমি ও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।} [কাহফঃ ১১০]

অতএব, তারা ক্ষমতা বা পদের জন্য লোকদেরকে ডাকতেননা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আপনি বলুনঃ {আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?} [আন'আমঃ ৫০]

তারা দাওয়াতের বিনিময়ে লোকদের থেকে কিছুই প্রত্যাশা করতেননা। আল্লাহ তায়া'লা তার নবী নুহ, হুদ, সালেহ, লুত ও শোয়াইব [আঃ] সম্পর্কে বলেন, তারা তাদের জাতিকে বলেছিলেনঃ {আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।} [শুয়ারাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০]

মুহাম্মদ [সাঃ] তার জাতিকে বলেছিলেনঃ {বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।} [ছোয়াদঃ ৮৬]

৫- আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ঃ

নবী রাসুলদের সত্যতার আরেকটি প্রমাণ হল, আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে সাহায্য করেন ও তিনি নিজেই তাদেরকে হিফাযত করেন। কেননা একজন যদি দাবী করে যে, সে আল্লাহর নবী বা রাসুল আর আল্লাহ পাক যদি তাকে সাহায্য ও হেফাযত না করে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব! বরং তাদের প্রয়োজনে আল্লাহ তায়া'লা তার আযাব ও শাস্তিও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।} [নাহলঃ ১১৬]

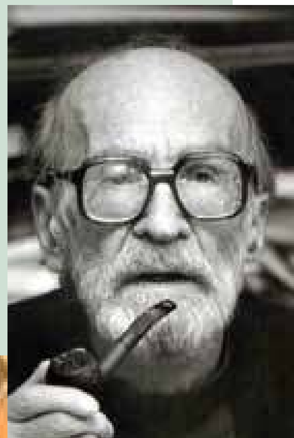
আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।} [আল হাক্কাঃ ৪৪-৪৬]

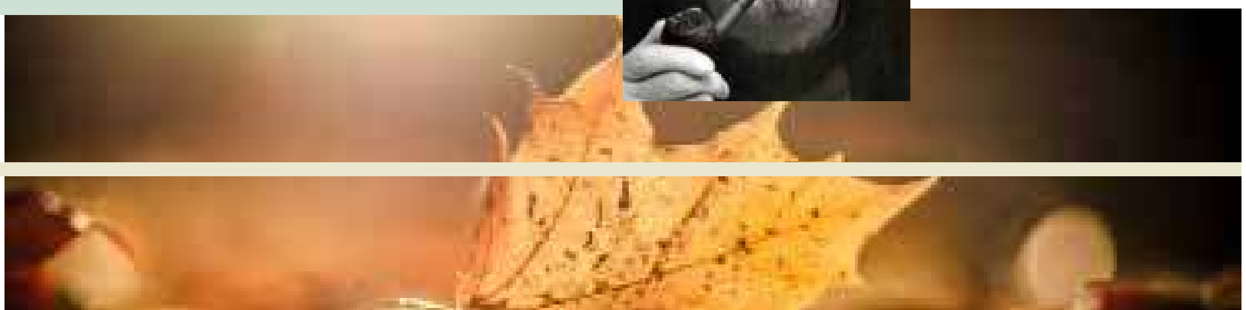
আমি তোমাদের মতই এক জন মানুষ মাত্র

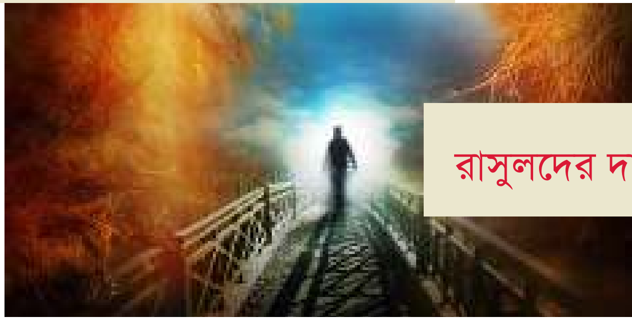
মুহাম্মদ আসলে এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তিনি না হলে ইসলাম ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করত না। তিনি নিঃসংঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন তিনি অন্যদের মত মানুষ। তার শেষ হল মৃত্যু। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থণা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি যে কোন বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তা থেকে নিজেকে পবিত্র করার জন্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিলেনঃ হে মানব সকল, আমি যদি কাউকে প্রহার করে থাকি তাহলে এই আমার পিঠ, প্রতিশোধ নিয়ে নাও, আর যদি কারো মাল ছিনিয়ে থাকি তাহলে আমার মাল তার মালিকানাধীন।

হেনরি সিরোয়া

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ







রাসুলদের দাওয়াতের মূলনীতিঃ

মূলনীতির দিকে বিবেচনায় সব নবী রাসুলগণের দাওয়াত একই ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।} [শুরাঃ ১৩]

এজন্যই সব আম্বিয়াদের ধর্ম এক ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন।} [মু'মিনুনঃ ৫১-৫২]

যদিও তাদের শরিয়ত ভিন্ন ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।} [মায়েদাঃ ৪৮]

যদি তাদের শরিয়ত মূলনীতির বিপরীত হত তাহলে আল্লাহর হিকমত, উদ্দেশ্য ও তার দয়া থেকে বেরিয়ে যেত, তাই এক নবী যে উসুল নিয়ে এসেছেন অন্য নবী আরেক উসুল নিয়ে আসা অসম্ভব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত।} [মু'মিনুনঃ ৭১]

যে সব বিষয়ে সব নবী রাসুলগণ একমত ছিলেন তা হলোঃ

আল্লাহর প্রতি ঈমান, তার ফেরেশতা, কিতাব, নবী রাসুলগণ, আখেরাত, তাকদীরের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।} [বাকারাঃ ২৮৫]

এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ যার কোন শরিক নেই, স্ত্রী, ছেলে সন্তান, অংশীদার, সমকক্ষ, মূর্তিপূজাঁ, দেবদেবীর পূজাঁ আর্চণা থেকে তাঁকে পুতঃপবিত্র মনে করা আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর। }[আম্বিয়াঃ ২৫]

এমনিভাবে তার দেয়া সরল সঠিক পথে চলার নির্দেশ, ভিন্ন ও বক্র পথে না চলা, অঙ্গিকার পূরণ, ওজন ও হিসেবে সঠিকভাবে দেয়া, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করা, কথা ও কাজে সততা বজায় রাখা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের অশ্লীল কাজ বর্জন, সন্তানদেরকে হত্যা না করা, অধিকার ছাড়া কাউকে হত্যা না করা, সুদ ও ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ না করা, অপচায় না করা, অহংকার না করা, অসৎভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস না করা।

পরকালের প্রতি ঈমান আনা, প্রত্যেক মানুষই অনিবার্যভাবে জানে যে, কোন একদিন সে মৃত্যু বরণ করবে, কিন্তু মরণের পরে তার গন্তব্য কোথায়? সে কি সুখী হবে নাকি হতভাগা হবে? সব আম্বিয়া ও রাসুলগণ তার জাতিকে একথা বলেছেন যে, তারা মৃত্যুর পরে আবার পুনঃজীবিত হবে, সবাই নিজ কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। ভাল কাজের ভাল প্রতিদান আর খারাপ কাজের খারাপ প্রতিদান পাবে। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ও হিসেবের ব্যাপারটা সুস্থ মস্তিষ্ক ও বিবেক স্বীকার করে। এ ব্যাপারটা আসমানী শরিয়ত শুধু জোড়ালোভাবে সমর্থন করে। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করে খামাখা ছেড়ে দেননি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দূর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম। }[ছোয়াদঃ ২৭]

বরং তাদেরকে একটা মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। }[যারিয়াতঃ ৫৬]

তাই এ মহাবিজ্ঞ স্রষ্টার জন্য এটা ঠিক হবেনা যে, যারা তার অনুগত আর যারা তার অবাধ্য সকলকে সমানভাবে ছেড়ে দিবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সম্মান করে দেব। }[ছোয়াদঃ ২৮]

এজন্যই তার পূর্ণ হিকমত ও মহাকুদতের বহিঃপ্রকাশ হলো কিয়ামতের দিনে সব সৃষ্টিকুলকে পুনঃরায় জীবিত করবেন, যাতে প্রত্যেকে যার যার কর্মের প্রতিফল ভোগ করতে পারে, ফলে সৎকর্মশীল পুরুষ্কার ও অন্যায়কারী আযাব ভোগ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন] তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রনাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল। }[ইউনুসঃ ৪]

এজন্যই মৃত্যুর পরে হিসেব নিকাশের জন্য আবার জীবিত করা আল্লাহর পক্ষে আরো সহজতর, তিনি কি আসমান জমিন সৃষ্টি করেননি?! তিনি যখন সৃষ্টিকূল কোন নমুনা ছাড়া প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, পুনঃরায় সৃষ্টি করা কি তার পক্ষে সম্ভব নয়?! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।} [আহক্বাফঃ ৩৩]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ তিনি মহাস্রষ্টা,সর্বজ্ঞ। }[ইয়াছিনঃ ৮১]

প্রথম সৃষ্টিকারীর পক্ষে পুনঃরায় সৃষ্টি করা অধিকতর সহজ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। }[রূমঃ ২৭]

বরং আল্লাহর আদেশে ইবরাহিম [আঃ] এর সামনে মৃত্যু ব্যক্তি দুনিয়াতেই জীবিত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন। }[বাকারাঃ ২৬০]

বরং ঈসা [আঃ] এর দ্বারা আল্লাহর আদেশে একাজ সংঘটিত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ যখন আল্লাহ বলবেনঃ

আসল নির্ভেজাল

ইসলাম মুহাম্মদের নিজের পক্ষ থেকে আগত কোন নতুন ধর্ম নয়। বরং যখন যীশুর আকাশে উত্তোলনের ছয়শ বছর পর জমিনে সে দ্বীন প্রচার হল, তখন তা সে অহি প্রচার করেছে যা সাবেক সব আসমানী ধর্মের মাঝে ছিল। তিনি তাকে তার নির্ভেজাল আসল রূপে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহ যত নবী পাঠিয়েছেন সবাই মুসলিম ছিলেন এবং তাদের বার্তাও সর্বদা এক ছিল।

ডেবোরা পটার

আমেরিকান মহিলা সাংবাদিক



{হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।} [মায়েদাঃ ১১০]

সত্য তাওহীদ

রাসুলে আরাবী মুহাম্মদ সঃ তার রবের সাথে নিজের গভীর সম্পর্কের ফলে উদ্দীপক কণ্ঠে আহবান করেছিলেন মুর্তি পূজক ও বিকৃত ধর্মের অনুসারী ইহুদি নাসারাদেরকে বিশুদ্ধতম একত্ব বাদের আকিদার দিকে। সৃষ্টি কর্তার সাথে অন্য উপাস্যের অংশিদারিত্বের দিকে ধাবিত করে মানুষের এমন কিছু পশ্চাতমুখিতার সাথে উন্মুক্ত লড়াইয়ে নেমেছিলেন।



লোরা ভিসিয়া ভাগ্লেরী
ইতালিয়ান মহিলা প্রাচ্যবিদ





উচ্চ সাহসী নবী রাসুলগণের ইতিহাস

মানুষ প্রথমে হেদাতেতের উপরই ছিল, অতপর তারা পরস্পরে বিরোধ করে, ফলে তাদেরকে শিক্ষাদীক্ষা ও আখেরাতের ভয় প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুল প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।} [জুম'আঃ ২]

কিন্তু লোকজন রাসুলদের দাওয়াতে দু'ভাগ হয়ে যায়, একদল রাসুলদেরকে বিশ্বাস করেন, তাদের উপর ঈমান আনেন, অন্যদল তাদেরকে মিথ্যারোপ করেন, তাদের প্রেরিত বিষয়ে অস্বীকার করেন। তারা সীমালঙ্ঘন করে নবী রাসুলদেরকে মিথ্যারোপ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।} [বাকারাঃ ২১৩]

তারা অহংকারবশত ও নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসারে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।} [বাকারাঃ ৮৭]



অথচ আল্লাহ তায়া'লা তাদের সকলের উপর ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।} [বাকারাঃ ১৩৬]

তিনি অঙ্গিকার করেছেন, যারাই রাসুলদের উপর ঈমান আনবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সফলতা পাবে। আর যারা তাদেরকে অস্বীকার করবে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ ও দুর্ভাগা হবে। যারা ঈমান এনেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।} [মায়েদাঃ ৫৬]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তণস্থল।} [রা'দঃ ২৮-২৯]

আর যারা কুফুরী করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল।} [নূরঃ ৫৭]

প্রত্যেক নবীরই শত্রু ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না।} [আন'আমঃ ১১২]

মিথ্যাবাদীরা নবীদেরকে অহহেলা, শত্রুতা, অবজ্ঞা, ব্যঙ্গ ও উপহাস করেছে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি।} [হিজরঃ ১১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।} [যুখরুফঃ ৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।} [আন'আমঃ ১০]

তারা নবীদেরকে দেশ থেকে ত্যাগ বা ধর্ম ত্যাগের হুমকি দিয়েছে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।} [ইবরাহীমঃ ১৩]

এমনকি তাদের হুমকি হত্যা পর্যন্ত পৌঁছেছে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল} [সূরা আল-মু'মিনঃ ৫]

অর্থাৎ তাদেরকে হত্যার চেষ্টা করে, এমনকি কতিপয় আম্বিয়াকে হত্যাও করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।} [বাকারাঃ ৮৭]

আল্লাহ তায়া'লা মিথ্যাবাদীদেরকে ধ্বংস করেছেন, তিনি নবীদের ধর্মকে বিজয়ী করেছেন, যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।} [মুজাদিলাঃ ২১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়।} [ছফফাতঃ ১৭১-১৭২]

তিনি নবী রাসুলদেরকে রক্ষা করেছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।} [নামলঃ ৫৩]



মার্সেল বয়যার্ড
ফরাসি চিন্তাবিদ

একই প্রদীপ থেকে...

আগের সব আসমানি ধর্ম বাতিল করা মহাম্মদ সঃ এর ধর্মের বিষয় ছিলনা। বরং তা আসমানী গ্রন্থ সমূহে যে বিকৃতি ও লজ্জন যুক্ত হয়েছে তা শুদ্ধ করে সে সব গ্রন্থকে স্বীকৃতি দেয়। সাবেক সব রাসুলের শিক্ষাকে সব ধরণের অসামাঞ্জস্যতা থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং এতে সম্প্রসারণ ও পূর্ণতা দান করা তার দায়িত্ব। যাতে তা স্থান কাল নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম।} [ফুসসিলাতঃ ১৮]

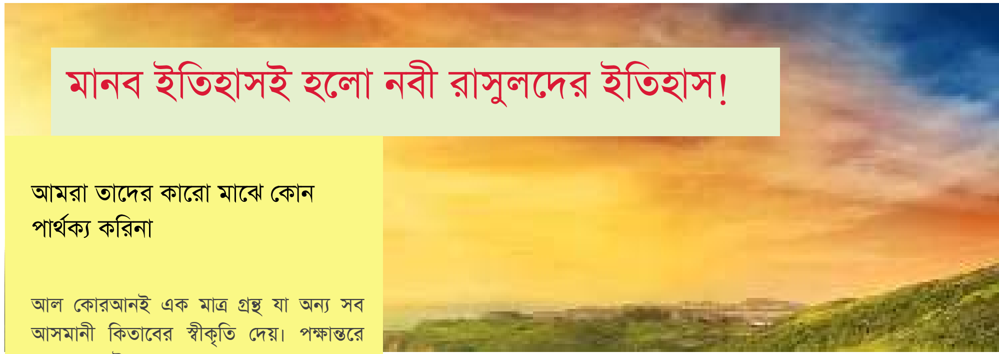
প্রত্যেক নবী তার স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছেন, তাদের যা উপযোগী তা নিয়ে ও তাদেরকে পবিত্র করতে। যে ব্যক্তি কোন একজন রাসুলকে অস্বীকার করল সে যেন সব রাসুলকেই অস্বীকার করল, অতঃএব যে ঈসা [আঃ] এর উপর ঈমান আনলনা, সে মূলত মূছা [আঃ] এর উপরও ঈমান আনেনি, আর মুহাম্মদ [সাঃ] এসেছেন ঈসা ও মূছা [আঃ] এর শরিয়তকে রহিত করতে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।} [মায়েদাঃ ৪৮]

আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ [সাঃ] এর উপর ঈমান আনলনা সে মূলত ঈসা [আঃ] এর উপরও ঈমান আনেনি।

খাতেমুন্নাবীয়্যীন ও মুরসালীন সব জাতি ও সবযুগের নবী হওয়া জরুরী, তিনি কোন সময় বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়, তা না হলে মানবজাতি অহীর মর্যাদা হারাবে, মুহাম্মদ [সাঃ] ছিলেন খাতেমুন্নাবীয়্যীন ও মুরসালীন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।} [আহযাবঃ ৪০]

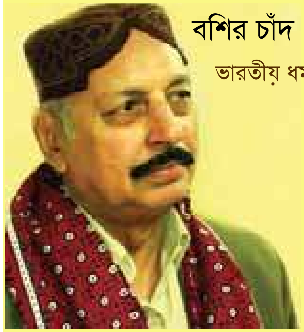


মানব ইতিহাসই হলো নবী রাসুলদের ইতিহাস!



আমরা তাদের কারো মাঝে কোন পার্থক্য করিনা

আল কোরআনই এক মাত্র গ্রন্থ যা অন্য সব আসমানী কিতাবের স্বীকৃতি দেয়। পক্ষান্তরে দেখতে পাই অন্য সব গ্রন্থ একে অপরকে অস্বীকার করে।



বশির চাঁদ

ভারতীয় ধর্মপ্রচারক

আমরা আল্লাহ তায়া'লার মানব সৃষ্টির ইতিহাস থেকে শুরু করে আদম [আঃ] কে জান্নাত থেকে বের করে জমিনে পাঠানো পর্যন্ত আলোচনা করব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ {আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ [সেগুলো ব্যতীত] নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর! এবং যখন আমি হযরত আদম [আঃ]-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে [নির্দেশ] পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের

অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর হযরত আদম [আঃ] স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি [করুণাভরে] লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না [কোন কারণে] তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে থাকবে।}[বাকারাঃ ৩০-৩৯]



তন্মধ্যেঃ

অতঃপর মানুষ যখন পরস্পরে বিরোধ করতে শুরু করল, সত্য ও হেদায়েত থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, তখনই আল্লাহ তায়া'লা ধারাবাহিকভাবে নবী রাসুলদেরকে তার শরিয়ত নিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।}[শুরাঃ ১৩]

হযরত ইদ্রিস [আঃ] থেকে শুরু করে নুহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, মূছা , ঈসা ও মুহাম্মদ [সালাওয়াতুল্লাহি আলাহিম আজমাইন] পর্যন্ত আল্লাহর সব নবী রাসুলরা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে এসেছেন।

আল্লাহ তায়া'লা তাদের কাহিনী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এখানে কিছু কাহিনী উল্লেখ করব, কেননা তাদের কাহিনীগুলোতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।}[ইউসুফঃ ১১১]

১- নূহআলাহিস সালামঃ

তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইতিপূর্বে ঈমানদার ছিলেন, এক আল্লাহর ইবাদত করত, পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা ভাল কাজ করতেন, সে সব লোক মারা গেলেন। লোকজন তাদের সততা ও আখলাকের কারণে চিন্তিত হলেন। তারা সে সব লোকের মূর্তি বানালো, তারা তাদের নামকরণ করলঃ ওয়াদ, সুয়া'হ, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর ইত্যাদি। লোকজন এ সব মূর্তির কথা ভুলে গেল, তারা এগুলোকে সে সব মৃত্যু সৎ লোকের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করতে লাগল। শহরের লোকজন ঐ সব মৃত্যু ব্যক্তিদের সম্মানে এসব চিত্রগুলোকে সম্মান করতে লাগল। এভাবে যুগের পর যুগ চলতে লাগল, এক সময় পিতাদের মৃত্যু হলো ও সন্তানেরা বৃদ্ধ হলো, তারা এসব মূর্তিগুলোকে আরো সম্মান করে নিজেদের কাছে নিয়ে এলো, তাদের সামনে রাখল, এভাবে মূর্তিগুলো ঐ সম্প্রদায়ের নিকট অনেক সম্মানের পাত্রে পরিণত হল। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম এলো, তারা এসবের ইবাদত করা শুরু করল, বলতে লাগল যে, এসব ইলাহদের সিজদা করতে হয়, তাদের সামনে নতজানু হতে হয়, ফলে তারা সে সবের ইবাদত করত। এভাবেই তাদের অনেকে পথভ্রষ্ট হলো।

এমতাবস্থায় তাদের নিকট হযরত নূহ[আঃ] কে পাঠালেন, তিনি তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, মূর্তির পূজাঁ করতে নিষেধ করলেন, তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করলেন, নূহ[আঃ] জাতির কাছে এসে বললেনঃ {সে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই।}[মু'মিনুনঃ ২৩]

লোকেরা তাঁকে মিথ্যারোপ করল, তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযব থেকে সতর্ক করলেন, তিনি বললেনঃ {আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করি।}[শুয়ারাঃ ১৩৫]

তারা জবাবে বললঃ {তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বললঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি।}[আ'রাফঃ ৬০]

নূহ[আঃ] তাদেরকে প্রতিউত্তরে বললনেঃ {সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না।}[আ'রাফঃ ৬১-৬২]

নূহ[আঃ] এর কথা শুনে লোকজন আশ্চর্য হলো, তারা বলতে লাগলঃ তুমি তো আমাদের মতই মানুষ, কিভাবে তুমি আল্লাহ নিকট হতে প্রেরিত হলে? আর যে সব লোক তোমার অনুসরণ

করে তারা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক, আমাদের উপর তাদের কোন মর্যাদা নেই, তুমি আমাদের থেকে বেশি মাল ও সম্মানের অধিকারীও নও, আমরা মনে করি তোমরা যা দাবী কর তা মিথ্যা। সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলতে লাগলঃ {এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। সে তো এক উম্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়।} [মু'মিনুনঃ ২৪-২৫]

সম্প্রদায়ের লোকজন একে অন্যকে মূর্তি পূজাঁ করতে উৎসাহিত করলঃ {তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।} [নূহঃ ২৩]

নূহ[আঃ] তাদেরকে বললেনঃ {তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে।} [আ'রাফঃ ৬৩]

নূহ[আঃ] নম্র ও উদারভাবে বলতে লাগলেন, কিন্তু এতে সম্প্রদায়ের লোকদের অহংকারই বৃদ্ধি পেল, কিন্তু তিনি তাদেরকে সব সময় ডাকতে লাগলেন, তিনি বললেনঃ {সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।} [নূহঃ ৫-৭]



তাদেরকে সম্ভাব্য সব ধরণের পদ্ধতিতে ডাকলেনঃ {অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।} [নূহঃ ৯-১০]

কেউ কেউ তুচ্ছ ওযরও পেশ করতে লাগল, তারা বললঃ তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা?} [শুয়ারাঃ ১১১]

এদের জবাবে নূহ[আঃ] উদার ও উপদেশের ভাষায় বললেনঃ {নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার?} [শুয়ারাঃ ১১২]

তাদেরকে বললেনঃ {তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে!} [শুয়ারাঃ ১১৩]

নূহ [আঃ] আরো বললেনঃ {আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। [শুয়ারাঃ ১১৪] আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না} [হুদঃ ২৯]

আমি কিভাবে সে সব লোকদেরকে তাড়িয়ে দিব যারা আমার উপর ঈমান আনল, আমাকে সাহায্য করল, আমার দাওয়াতি কাজ প্রসারে সহযোগীতা করল। তিনি তাদেরকে বললেনঃ {আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?} [হুদঃ ৩০] {

{আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।} [শুয়ারাঃ ১১৫]

তিনি ধনী গরিব, সম্মানীত নিম্নশ্রেণী, ছোট বড়, সাদা কালো কোন ভেদাভেদ না করে সব মানুষকে সতর্ক করলেন... তার জাতি যখন তার আনিত সব দলিল প্রত্যাখ্যান করল, তারা জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিল। {তারা বলল, হে নূহ যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।} [শুয়ারাঃ ১১৬]



শেষ রেসালাত

মুহাম্মদ তো সেই রাসুল যিনি ইসলাম নিয়ে এসেছেন। এর মাধ্যমে তিনি হন মহা বার্তা বহনকারীদের ধারাবাহিকতার শেষ পর্ব।

উলফ পিয়ার ব্যারন

অস্ট্রিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

যখন নূহ [আঃ] নিশ্চিত হলেন যে, তার জাতি যুক্তিসংগত দাওয়াত গ্রহণ করেবেনা, তারা হেদায়েতের পথে চলবেনা, তখন তিনি সীমালংঘনকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়া করতে লাগলেন। {নূহ বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। [শুয়ারাঃ ১১৭] অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।} [শুয়ারাঃ ১১৮]

তিনি স্বজাতিকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন, কিন্তু এতে তাদের কুফুরীই বেড়ে চলল। তারা পরস্পর বলতে লাগলঃ {এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।} [হুদঃ ৩২]

নূহ [আঃ] তাদেরকে বললেন, আযাবের ব্যাপারটা আমার হাতে নয়। {তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন।} [হুদঃ ৩৩] {আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না।} [হুদঃ ৩৪]

তখন আল্লাহ তায়া'লা অহী নাযিল করেন, {যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেনা এতএব তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না।} [হুদঃ ৩৬]

সব ধরনের দলিল তাদের নিকট পেশ করা হলো, তখন আর কোন ওযর বাকী রইলনা। দাওয়াতী কাজ প্রায় দশ শতাব্দী পর্যন্ত চলল, নূহ[আঃ] তাদের থেকে নিরশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ {নূহ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের।} [নূহঃ ২৬-২৭]

দাম্ভিকতা এবং ইতিহাস বিকৃতি

মধ্যযুগে খৃষ্টানেরা মানবজাতির মাঝে উচ্চ-নিম্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবিন্যাস করত। সিফরে কাতবীনে এ ধরণের শ্রেণী বিন্যাসের কথা উল্লেখ আছে। তারা ইহাকে নতুন স্তরে ভাগ করত। তারা বিশ্বাস করত যে, ধর্মযাজকেরা নূহ [আঃ] এর সন্তান সামের বংশধর থেকে, সেনাবাহিনী ও বীরেরা ইয়াফেসের বংশধর থেকে ও গরীব মিসকিনেরা হামের বংশধর থেকে। এমনকি ১৯৬৪ সালে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সিনেটর বার্ড রবার্ট আমেরিকার রাজনীতিতে শ্রেণী বিন্যাসে নূহ [আঃ] এর উক্ত ঘটনাকে তাদের দলিল হিসেবে ব্যবহার করল।



তখন আল্লাহ তায়া'লা তাকে কিস্তি তৈরি করতে বললেন। {অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর।} [মু'মিনুনঃ ২৭]

তিনি কিস্তি তৈরি শুরু করলেনঃ {তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত।} [হুদঃ ৩৮]

নূহ [আঃ] তাদেরকে শিষ্টাচার ও নরম্ভাভাষায় জবাব দিয়েছেন। {তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের উপহাস করছি।} [হুদঃ ৩৮]

পরে তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় ও হুমকি দিলেন, {অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে-লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে।} [হুদঃ ৩৯]

কাজ দ্রুত এগিয়ে চল, কিস্তি তৈরি শেষ হলো, অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা নূহ [আঃ] কে ঈমানদার ও প্রত্যেক প্রাণী থেকে একজোড়া করে কিস্তিতে উঠাতে নির্দেশ দিলেন। {অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বহেুই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদি দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।} [হুদঃ ৪০]

তিনি ঈমানদার ও প্রত্যেক প্রাণী থেকে একজোড়া করে কিস্তিতে উঠালেন। {আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহন কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ন, মেহেরবান।} [হুদঃ ৪১]

নূহ [আঃ] যখন ঈমানদার ও প্রত্যেক প্রাণী থেকে একজোড়া করে কিস্তিতে আরোহণ করলেন তখন আকাশ থেকে মুশল ধারে বৃষ্টি ঝড়তে শুরু করল, জমিন থেকে পানি নির্গত হতে লাগল। {তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। এবং ভুমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকম্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। যা চলত আমার দৃষ্টি সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যখ্যান করা হয়েছিল।} [কামারঃ ১১-১৪]

নূহ [আঃ] তার বেঈমান ছেলেকে দেখল পানিতে ডুবা থেকে ভাগার চেষ্টা করছে, তিনি তাকে ডাকলেনঃ {তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না।} [হুদঃ ৪২]

তিনি ছেলে ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানাল, বাবার নসিহত শুনলনা, সে নূহ [আঃ] কে এ বলে জবাব দিলঃ {সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।} [হুদঃ ৪৩]

তখন নূহ [আঃ] তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেনঃ {নূহ [আঃ] বল্লেন আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন।} [হুদঃ ৪৩]

এরপরে কি হলো? {এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল।} [হুদঃ ৪৩]

নূহ [আঃ] ছেলের প্রতি আসক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে তাকে রক্ষার জন্য দোয়া করতে লাগলেন, যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা তার পরিবার পরিজনকে হেফাযত করার ওয়াদা করেছেন। অতঃপর নূহ[আঃ] বললেনঃ {আর নূহ [আঃ] তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন- হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।} [হুদঃ ৪৫]

নবীদেরকে তাচ্ছিল্য করা

নূহ [আঃ] কৃষিকাজ করতেন। তিনি আঙ্গুরের চাষ করতেন। আঙ্গুর থেকে মাদক তৈরি করতেন, তিনি মদ খেতেন ও মাতাল হতেন। তাঁর ছোট ছেলে হাম তাঁকে ভৎসণা করত। একদা মাতাল হলে তিনি উলঙ্গ হয়ে যায়, তখন হামের অন্য দুই ভাই পিতার গায়ে চাদর দিয়ে দেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে তখন হাম যা করেছে তা জানতে পেলেন, তিনি হামের সন্তান কিন'আনকে লা'নাত দেন ও বদদোয়া করেন, তিনি বললেনঃ তাঁর বংশধরেরা দাস হবে। তিনি সাম ও ইয়াফেসকে দোয়া করেন। [দশম সিহাহ]
এ ঘটনার ব্যাখ্যায় তালমূদ বাবেলীতে সিনহাদ্রীন অধ্যয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, কিনান বা হাম নূহ [আঃ] কে খাসী করে তাঁর সাথে খারাপ কাজ করত। আল্লাহর নবীদের ব্যাপারে এ ধরণের জঘন্য কাজের অপবাদ দেয়া থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।



তখন আল্লাহ তায়া'লা জবাবে বললেন, তিনি যে পরিবারের ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন তারা হলেন ঈমানদারগণ। {আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার!} [হুদঃ ৪৬]

তাই দ্বীনের মধ্যে কোন মধ্যস্থতা নেই যে সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে, এক আল্লাহর উপর ঈমান না আনলে সন্তান হলেও কোন লাভ নেই।

জমিন যখন পানিতে একেবারেই ডুবে গেল, তখন সব কাফির ধ্বংস হলো। {আর নির্দেশ দেয়া হল-হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল।} [হুদঃ ৪৪]

এরপরে জমিন তার পানি শুকিয়ে নিল, আসমানকে বলা হলোঃ {আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও।} [হুদঃ ৪৪]

বৃষ্টি বর্ষণ থামাও, বৃষ্টি থামল। {আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল।} [হুদঃ ৪৪]

যে পাহাড়ে কিস্তি ভিড়ল, তখন নূহ [আঃ] কে আল্লাহ বললেনঃ {হুকুম হল-হে নূহ [আঃ]! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুণ।} [হুদঃ ৪৮]

নূহ[আঃ] ও ঈমানদারেরা কিস্তি থেকে নামল, তারা শহর গড়ে তুলল, গাছপালা রোপণ করল, যেসব পশুপাখি তাদের সাথে ছিল সেগুলো ছেড়ে দিল, এভাবে জমিন আবাদ করা শুরু করল, লোকজন সন্তান সন্তুতি জন্ম দেয়া শুরু করল।





২- ইবরাহীম [আঃ]

ইবরাহীম [আঃ] তাওহীদের নবী, তাঁর পুরা জীবনীতে ইহাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর গুন বর্ণনা করে বলেনঃ {নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।} [নাহলঃ ১২০]

তিনি মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত পালিত হন, এমনকি তাঁর পিতা ছিলেন একজন মূর্তিপূজঁক, নির্মাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। ইবরাহীম [আঃ] তাঁর পিতা ও জাতির সাথে সংলাপ করেনঃ {স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেনঃ তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট।} [আন'আমঃ ৭৪]

তিনি তাঁর জাতির শিরকীর সব ধরণের দলিল প্রমাণ অস্বীকার করেন ও খন্ডণ করেন, তিনি আল্লাহর নিদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলতেনঃ {অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল, বললঃ ইহা আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল।} [আন'আমঃ ৭৬]

অর্থাৎ ডুবে যাওয়া {তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল।} [আন'আমঃ ৭৬-৭৭]

সুর্য যখন দিগন্তে উদিত হত তখন কতিপয় লোক তার ইবাদত করত। {বললঃ এটি আমার প্রতিপালক।} [আন'আমঃ ৭৭]

তিনি তাদের এ কাজ অস্বীকার করেন, ইহার পূজা করায় তিনি আশ্চর্য হতেন, দিশেহারা হয়ে তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকতেন, {অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল।} [আন'আমঃ ৭৭]

যখন দিগন্তে অস্ত যেত, তখন তিনি জাতির কাছে গিয়ে বললেনঃ {তখন বলল যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল।} [আন'আমঃ ৭৭-৭৮]

তিনি দেখলেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা সুর্যের সামনে সিজদায় নত হয়ে থাকতঃ {বললঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর।} [আন'আমঃ ৭৮]

তিনি তাদের এ কাজ অস্বীকার করেন, ইহার পূজা করায় তিনি আশ্চর্য হয়ে বলতেন, কিভাবে মানুষ সুর্যকে ইলাহ মানে?!! {অতপর যখন তা ডুবে গেল,} [আন'আমঃ ৭৮]

যখন চোখের সামনে থেকে অস্ত হয়ে যেত, তখন সে সব মূর্তিপুজকদের কাছে গিয়ে



বললেনঃ {তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি এক মুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই।} [আন'আমঃ ৭৮-৭৯]

তিনি নম্র, ভদ্র, উদার ও যুক্তির সাথে তার পিতাকে অনেক বুঝালেন, শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন, {হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা,আমি আশঙ্কা করি,দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে।} [মারিয়ামঃ ৪২-৪৫]

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তার পিতার জবাব ছিল খুবই রূঢ়ঃ {পিতা বললঃ যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।} [মারইয়ামঃ ৪৬]

পিতার সাথে ইবরাহীম [আঃ] এর জবাব ছিল খুবই আদব, দয়া ও নম্রভাবে। {ইব্রাহীম বললেনঃ তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।} [মারইয়ামঃ ৪৭-৪৮]

ইবরাহীম [আঃ] তার পিতা ও জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকলেন, শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন, কিন্তু জাতির লোকেরা ইবরাহীম [আঃ] এর দাওয়াতে জবাব দেননি, তারা শিরকেই পড়ে রইল। {তাঁর সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বললঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না তবে আমার পালকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর,অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ।} [আন'আমঃ ৮০-৮১]

একবার তিনি তাদেরকে বললেনঃ {যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর?} } [শুয়ারাঃ ৭০]

তারা জবাব দিলঃ {তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি।} [শুয়ারাঃ ৭১] {ইব্রাহীম [আঃ] বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?} [শুয়ারাঃ ৭২-৭৩]

তারা জ্ঞানহীন, যুক্তিহীন ও শুধু অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে বোকামী জবাব দিল। {তারা বললঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত।} [শুয়ারাঃ ৭৪]

তিনি তাদেরকে দলিল প্রমাণ, যুক্তিসহকারে একচ্ছত্র তাওহীদের জবাব দিলেন, {ইব্রাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? বিশ্বপালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। এবং আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম।} [শুয়ারাঃ ৭৫-৮৬]

ঈদের দিনে ঈদের রীতিনীতি পালন করতে সম্প্রদায়ের লোকজন, তাদের রাজা ও শহরের সবাই ময়দানে উপস্থিত হল, কিন্তু ইবরাহীম [আঃ] তাদের সাথে বের হননি, যখন তারা চলে গেলঃ {অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে, গিয়ে ঢুকল এবং বললঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।} [ছফফাতঃ ৯০-৯৩]

তারা ফিরে এসে দেখল, তাদের মূর্তিগুলো ভঙ্গুর, কিভাবে এগুলো ইলাহ হবেন যে নিজে নিজেকেই হেফাযত করতে পারেনা! তারা দ্রুত এসে বললঃ তারা বললঃ {আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। কতক লোকে বললঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। তারা বললঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। তারা বললঃ হে ইব্রাহীম তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ?} [আম্বিয়াঃ ৫৯-৬২]

তিনি তাদেরকে অকাট্য দলিলের মাধ্যমে জবাব দিলেনঃ {তিনি বললেনঃ না এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে।} [আম্বিয়াঃ ৬৩]

তারা তার দলিলের সামনে নিজেদেরকে নগণ্য মনে করল, {অতঃপর মনে মনে চিন্তা করল এবং বললঃ লোক সকল; তোমরাই বে ইনসাফ। অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে, তুমি তো জান যে, এরা কথা বলেনা।} [আম্বিয়াঃ ৬৪-৬৫]

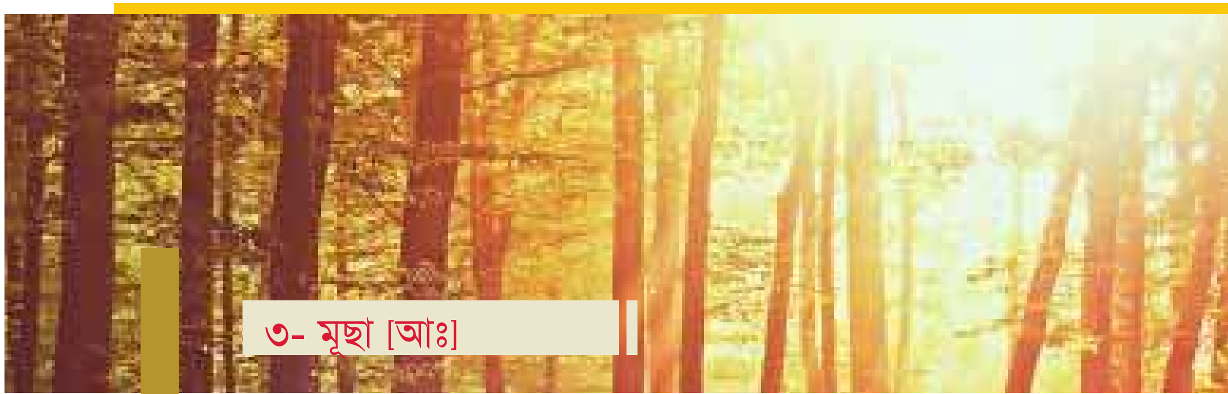
তিনি আরো শক্তিশালী অকাট্য দলিল পেশ করলেনঃ {তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার ও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না?} [আম্বিয়াঃ ৬৬-৬৭]

তারা বিবেক, দলিল, যুক্তি প্রমাণ সব কিছুতে রেহে গিয়ে তার থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইল। {তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।} [আম্বিয়াঃ ৬৮]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে রক্ষা করলেন। {আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম।} [আম্বিয়াঃ ৭০]



ইব্রাহীম খলীল আঃ এর সেজদার স্থান ফিলিস্তিনের খলীল নগরীর মসজিদে ইব্রাহীমে অবস্থিত



৩- মূছা [আঃ]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে রক্ষা করার পরে তিনি আলোচনা করতে তাদের সম্রাটের নিকট গেলেনঃ {তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যাক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।} [বাকারাঃ ২৫৮]

তার অকাট্য দলিল প্রমাণের সামনে মূর্খ বোকা রাজা জবাব দিলঃ {সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি।} [বাকারাঃ ২৫৮]

একজনকে হত্যা করা ও অন্য একজনকে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে যুক্তিহীন জীবন মৃত্যু দানের ব্যাপারে ইবরাহীম [আঃ] যুক্তি তর্ক করতে আসেননি, তাই তিনি বললেনঃ {ইব্রাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সুর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।} [বাকারাঃ ২৫৮]

এবার তার দলিল প্রমাণের সামনে তারা হেরে গেল। এরপরে ইবরাহীম [আঃ] স্বচোক্ষে আল্লাহর কুদরত মৃত্যুকে জীবিত করে দেখতে চাইলেনঃ {আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন।} [বাকারাঃ ২৬০]

আল্লাহ তায়া'লা ইবরাহীম [আঃ] ও তদীয় পুত্র ইসমাইল [আঃ] কে মক্কার কা'বা গৃহকে শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে পবিত্র করতে নির্দেশ দেনঃ {এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। যখন ইব্রাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিধান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা অল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেনঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিলঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু।} [বাকারাঃ ১২৫-১২৮]



বনী ইসরাইল নিজেরা কিতাব পাঠ জানতে পারল যে, ইবরাহীমের [আঃ] বংশধর থেকে একজন বালকের আবির্ভাব হবেন যার হাতে মিশরের সম্রাটের ধ্বংস হবে। বনী ইসরাইলের মাঝে এ সুসংবাদ সকলেরই জ্ঞাত ছিল। এ খবর কতিপয় লোকদের মাধ্যমে ফেরাউনের কানে গেল। সে তখন বনী ইসরাইলের সব পুত্র সন্তান হত্যার নির্দেশ দিল, যাতে করে সে সন্তানের আবির্ভাব না হতে পারে। ফলে বনী ইসরাইলরা ফেরাউনের সময় অনেক জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের মাঝে বসবাস করত। {ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।} [কাসাসঃ ৪]

আল্লাহ তায়া'লা অসহায় বনী ইসরাইলদেরকে দয়া ও রহমত করতে চাইলেনঃ {দেশে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দূর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত।} [কাসাসঃ ৫-৬]

যদিও মূছা [আঃ] এর আবির্ভাব যাতে না হতে পারে সে জন্য ফেরাউন সব ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করল, এমনকি তার লোকেরা গর্ভবর্তীদের কাছে গিয়ে প্রসবের সময় সম্পর্কে খবর নিত, অতঃপর যখনই কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করত তখনই তাকে হত্যা করা হত। কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তার কুদরত দেখাতে চাইলেন, তারা যে কারণে ভয় করত তাই তিনি বাস্তবায়ন করে দেখালেন।

মূছা [আঃ] এর জননী যখন তাকে জন্ম দিলেনঃ আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব।} [কাসাসঃ ৭]

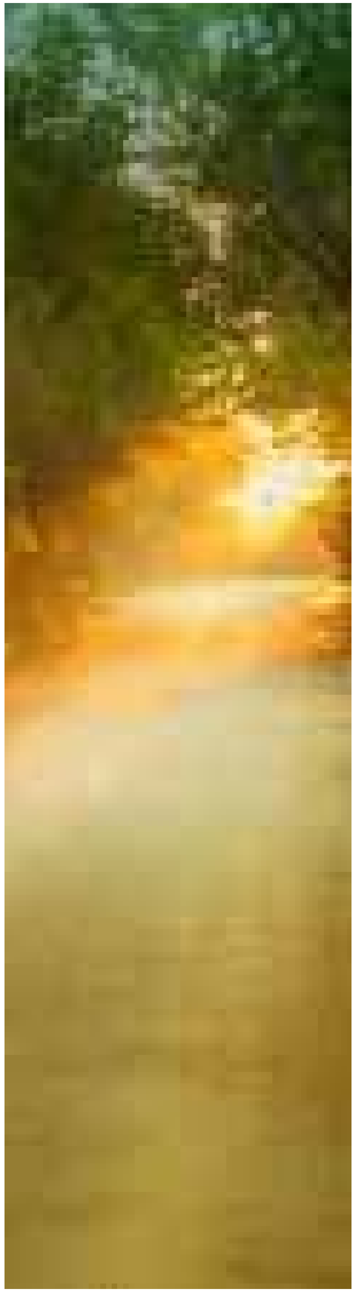
তিনি তার সন্তানের ব্যাপারে ভীত হলেন, তিনি তাকে একটি কাঠের বাক্সে করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। {অতঃপর ফেরাউন পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান, ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল।} [কাসাসঃ ৮]

ফেরাউনের স্ত্রীর মনে মূছা [আঃ] এর প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে দেয়া হলো। {ফেরাউনের স্ত্রী বলল,এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না।} [কাসাসঃ ৯]



আর মূছা [আঃ] এর মাঃ {সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্ববাসীগণের মধ্যে। তিনি মূসার ভগিণীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল।} [কাসাসঃ ১০-১১] {পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।} [কাসাসঃ ১২-১৩]

মূছা [আঃ] অত্যাচারী সীমালঙ্ঘনকারী ফেরাউনের গৃহে বড় হতে লাগলেনঃ {যখন মূসা যৌবনে পদার্পন করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।} [কাসাসঃ ১৪-১৭]



কিন্তু যখন তিনি তার ও বনী ইসরাইলদের শত্রুকে হত্যা করলেনঃ {অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরমর্শ করছে। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।} [কাসাসঃ ১৮-২১]

তখন তিনি মিশর থেকে মাদায়েনের দিকে রওয়ানা হলেন। {যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।} [কাসাসঃ ২২-২৪]



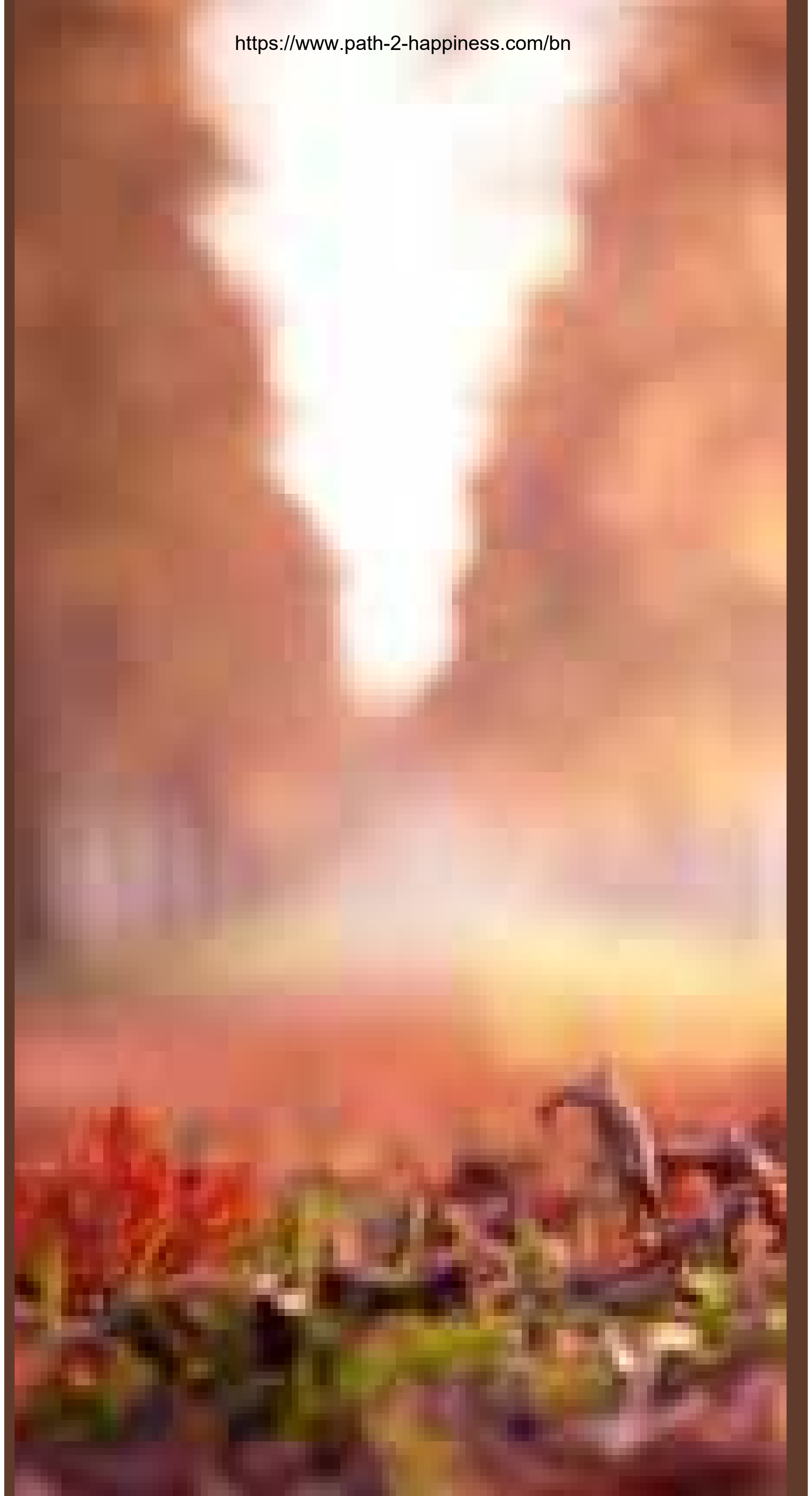
দু'কন্যা তাদের পিতা – আল্লাহর নবী শোয়াইব [আঃ]- কে তার কাজ সম্পর্কে অবহিত করলেন, শোয়াইব [আঃ] এক কন্যাকে মূছা [আঃ] এর নিকট পাঠালেন। {অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন,তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন।} [কাসাসঃ ২৫]

মূছা [আঃ] শোয়াইব [আঃ] নিকট এলেন। {অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।} [কাসাসঃ ২৫]

তার আমানতদারিতা দেখে কন্যাদের একজন বললঃ {বালিকাদ্বয়ের একজন বলল পিতাঃ তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা,আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে,যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।} [কাসাসঃ ২৬]

শোয়াইব [আঃ] মূছা [আঃ] এর কাছে এক কন্যাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করলেনঃ {পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহর উপর ভরসা।} [কাসাসঃ ২৭-২৮]

মূছা [আঃ] সেখানে চুক্তিকৃত নির্ধারিত দিন কাটিয়ে পরিবার নিয়ে দেশে রওয়ানা হলেনঃ {অতঃপর মূসা [আঃ] যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।} [কাসাসঃ ২৯]



তখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেনঃ {যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে মূসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব পালনকর্তা। আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দু'টি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।} [কাসাসঃ ৩০-৩২]

কিন্তু মূছা [আঃ] ইতিপূর্বে তার শত্রুকে হত্যার কারণে ফেরাউনের ভয় পাচ্ছিলেন, এছাড়াও তার জিহ্বার জড়তার কারণেওঃ {মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারুণ, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।} [কাসাসঃ ৩৩-৩৪]

তিনি আল্লাহর কাছে তার ভাই হারুন [আঃ] কে সহযোগী হিসেবে চাইলেনঃ {এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি। এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।} [ত্বহাঃ ২৯-৩৬]

তারা দু'জন যখন ফেরাউনের নিকট গিয়ে , তাকে এক আল্লাহর তাওহীদের দিকে ডাকলেন, যার কোন শরিক নেই, এবং বন্দী বনী ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে দিতে বললেন,



তাদেরকে ছেড়ে দিতে বললেন যেন তারা নিজেদের ইচ্ছামত প্রভুর ইবাদত করতে পারে, তারা যেন তাওহীদের উপর চলতে পারে ও এক আল্লাহর কাছেই নত শিকার করে, তখন এতে ফেরাউন দম্ভ ও অহংকার করল। সে মূছা [আঃ] এর দিকে অবমাননা ও প্রতিশোধের দৃষ্টিতে তাকিয়েবললঃ {ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি সেই- তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন।} [শুয়ারাঃ ১৮-১৯]

মূছা [আঃ] তাকে জবাব দিলেনঃ {মূসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম।} [শুয়ারাঃ ২০]

অর্থাৎ আমার উপর অহী নাযিলের আগে। {অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন।} [শুয়ারাঃ ২১]

এরপরে ফেরাউন তাকে [আঃ] লালন পালনে করেছে বলে যে সব দয়ার কথা বললেন তার উত্তরে তিনি বললেনঃ {আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী-ইসলাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ।} [শুয়ারাঃ ২২]

অর্থাৎ আমাকে লালন পালনের সে সব অনুগ্রহের কথা তুমি বললে , আর আমি নিজে বনী ইসরাইলের একজন যাদেরকে তুমি গোলাম করে রেখেছ, তারা তোমার সব খেদমত করতেছে। অতঃপর ফেরাউন মূছা [আঃ] য রবের দিকে ডাকেন সে রবের ব্যাপারে বলতে বললঃ {ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি?} [শুয়ারাঃ ২৩]

মূছা [আঃ] যথাযথভাবে জবাব দিলেনঃ {মূসা বলল, তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।} [শুয়ারাঃ ২৪]

এতে ফেরাউন উপহাস করতে লাগলঃ {ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না?} [শুয়ারাঃ ২৫]

কিন্তু মূছা [আঃ] তাঁর দাওয়াত চালিয়ে গেলেনঃ {মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা।} [শুয়ারাঃ ২৬]

কিন্তু ফেরাউনের দম্ভ ও অহংকার বেড়েই চললঃ {ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল।} [শুয়ারাঃ ২৭]

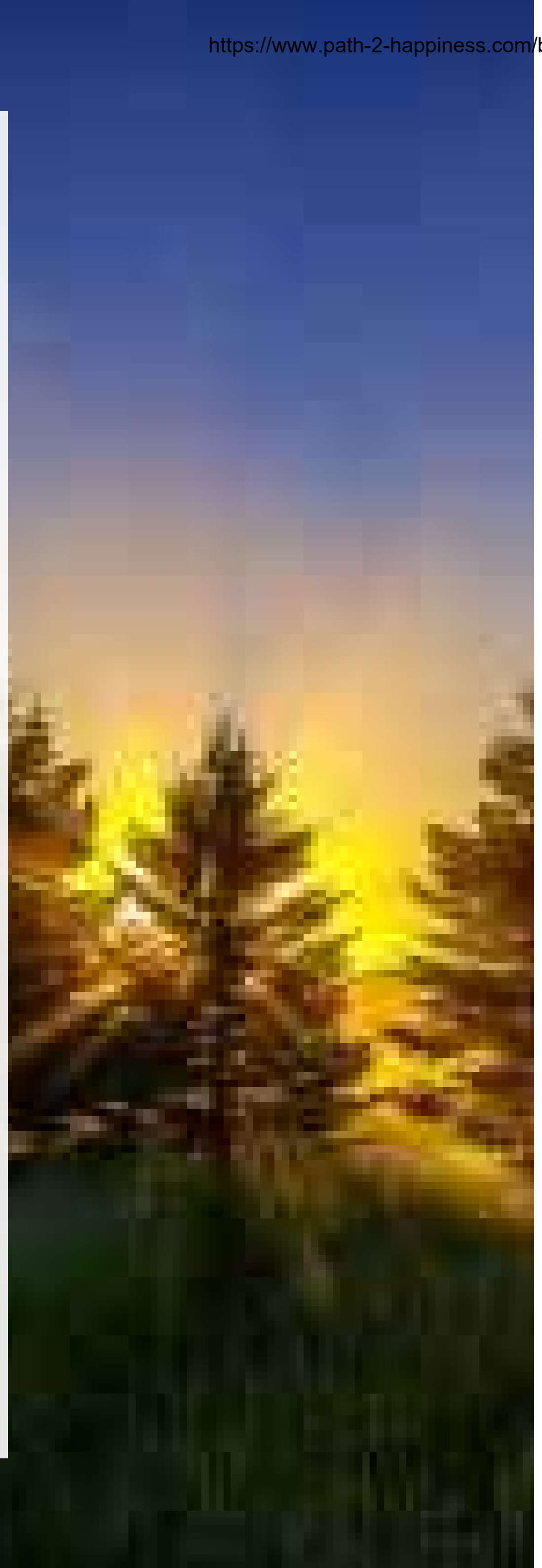
কিন্তু আল্লাহর নবী মূছা [আঃ] তার দাওয়াতি কাজ থেকে ক্ষান্ত হননি। {মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ।} [শুয়ারাঃ ২৮]

অত্যাচারী, অহংকারী দাম্ভিক রাজা ফেরাউন যুক্তি তর্ক, বিবেক বুদ্ধি বাদ দিয়ে হুমকি ধমকি দিতে লাগল। {ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।} [শুয়ারাঃ ২৯]

মূছা [আঃ] কে যেভাবে অবমাননা ও উপহাস দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তেমনিভাবে ফেরাউনের হুমকি ধমকিও তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। {মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো। } [শুয়ারাঃ ৩০-৩৩]

ফেরাউন সাধারণ লোকজনের ঈমান আনার ভয় করছিল। {ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি? তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকর কে উপস্থিত করে।} [শুয়ারাঃ ৩৪-৩৭]

ফেরাউন সব ধরণের দলিল প্রমাণ ও যুক্তি দেখেও অহংকার ও মিথ্যারোপ করতে লাগল,



সে মূছা [আঃ] কে নবী হিসেবে অস্বীকার করলঃ {আমি ফেরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। সে বললঃ হে মূসা, তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে আগমন করেছ? অতএব, আমরাও তোমার মোকাবেলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। মূসা বললঃ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে। অতঃপর ফেরাউন প্রস্থান করল এবং তার সব কলাকৌশল জমা করল অতঃপর উপস্থিত হল।} [ত্বহাঃ ৫৬-৬০][

মূছা [আঃ] তাদের উপর আল্লাহর গযবের আশঙ্কা করেন। {মূসা [আঃ] তাদেরকে বললেনঃ দুর্ভাগ্য তোমাদের; তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদভাবন করে, সেই বিফল মনোরথ হয়েছে।} [ত্বহাঃ ৬১]

তারা পরস্পরে মতবিরোধ করতে লাগল, কেহ কেহ বলল, ইহা কোন যাদুকরের কথা নয়ঃ {অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল।} [ত্বহাঃ ৬২]

কিন্তু পরিশেষে তারা ফিরে এলো, অধিকাংশ লোক বললঃ {তারা বললঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়। অতএব, তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে।} [ত্বহাঃ ৬৩-৬৪]

{তারা বললঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। মূসা বললেনঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো চুটাছুটি করছে।} [ত্বহাঃ ৬৬]

সাধারণ লোকজন যাদুকরের দ্বারা ফিতনায় পড়তে পারে এ আশঙ্কা মূছা [আঃ] করছিলেন। {অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন।} [ত্বহাঃ ৬৭]

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নির্দেশ দেয়া হলোঃ {আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।} [ত্বহাঃ ৬৮-৬৯]

{তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল।} [আ'রাফঃ ১১৭-১১৮]

মজার ব্যাপার হলোঃ {সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।} [আ'রাফঃ ১১৯-১২২] {অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বললঃ আমরা হারুন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।} [ত্বহাঃ ৭০]

ফলে ফেরাউন বোকার মত আবারো হুমকি ধমকি দিলঃ {ফেরাউন বললঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে; দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলে চড়াব।} [ত্বহাঃ ৭১]

তাদের জবাব ছিল ফেরাউনের জন্য আরেক বিস্ময় এবং ঈমান কিভাবে ব্যক্তিকে রূপান্তরিত করে তারই এক বর্ণনাঃ {তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী।} [শুয়ারাঃ ৫০-৫১]

ফেরাউন মু'মিনদেরকে নির্যাতন করতে লাগল। ফলে আল্লাহ তায়া'লা তাকে ও তার লোকজনদেরকে শাস্তি দিলেনঃ {তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহরই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না।} [আ'রাফঃ ১৩০-১৩১]

তারা ঈমান আনেনি, তাওবাও করেনিঃ {তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না। সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ।} [আ'রাফঃ ১৩২-১৩৩]

যখন তাদের উপর আযাব আসেঃ {আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মূসা আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী-ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত-যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানোর উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।} [আ'রাফঃ ১৩৪-১৩৫]

তারা যখন অঙ্গিকারকৃত কিছুই পালন করেনি, বরং ওয়াদা ভঙ্গ করেছেঃ {সুতরাং আমি তাদের কাছে থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল।} [আ'রাফঃ ১৩৬]

মিসরবাসীরা তাদের রাজা ফেরাউনের অনুসরণে যখন কুফুরী, দৃষ্টতা ও অহমিকায় বেড়েই চলল, তারা আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর বিরোধিতা করতে লাগল; অথচ আল্লাহ তায়া'লা মিসরবাসীর নিকট অকাট্য দলিল প্রমাণ পেশ করেন, তাদেরকে এমন মু'জিযা দেখালেন যাতে চক্ষু চমকে যায়, আকল দিশেহারা হয়ে যায়, এতদসত্যেও তারা কুফুরী থেকে ফিরেনি, আল্লাহর পথে আসেনি। ফেরাউনের দলের অল্প সংখ্যক লোক, যাদুকরেরা ও বনী ইসরাইলের সবাই ঈমান আনে। ফেরাউনের অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ে তাদের ঈমান ছিল গোপনে। আল্লাহ তায়া'লা মুসা ও হারুন [আঃ] কে তাদের জাতির জন্য আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বাড়ি বানানোর নির্দেশ দিলেন, যাতে তাদের বাড়িগুলো ফেরাউনের অনুসারীদের বাড়ি থেকে আলাদা দেখায়, যেন তারা নিজেরা নিজেদেরকে চিনতে পারেন ও আল্লাহর আদেশে দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন এবং যেন সে ঘরে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেনঃ {আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাস স্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।} [ইউনুসঃ ৮৭]

অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা তার বান্দাহ মুসা [আঃ] কে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেনঃ {আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।} [শুয়ারাঃ ৫২]

তখন ফেরাউনের প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপঃ অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, নিশ্চয় এরা [বনী-ইসরাঈলরা] ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। এবং আমরা সবাই সদা শংকিত।} [শুয়ারাঃ ৫৩-৫৬]





আর আল্লাহ তায়া'লা চাইলেনঃ {অতঃপর আমি ফেরআউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম। এবং ধন-ভান্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসলাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক।} [শুয়ারাঃ ৫৭-৫৯]

তারা বনী ইসরাইলদেরকে ধাওয়া করতে লাগলঃ {অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।} [শুয়ারাঃ ৬০]

যখন তারা বনী ইসরাইলকে পেলঃ {যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম।} [শুয়ারাঃ ৬১]

কিন্তু আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর আল্লাহর উপর ভরসা, তাকে জানা ও তার উপর তাওক্কুলে ভরপূর জবাব ছিল এরূপঃ {মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।} [শুয়ারাঃ ৬২]

তখন আল্লাহর হেদায়েত ও রহমত নাযিল হলোঃ {অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমূদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জত কললাম। নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।} [শুয়ারাঃ ৬৩-৬৮]

এ ভয়ানক অবস্থায়ঃ {আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশে।।} [ইউনুসঃ ৯০]

ফেরাউন তখন মৃত্যু ও ডুবে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলোঃ {এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।} [ইউনুসঃ ৯০]

কিন্তু সে বিলম্ব করে ফেলেছে; ফলে মৃত্যুর কবলে পতিত হলো। {এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে। এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে।} [ইউনুসঃ ৯১]

শত্রুকে ডুবে মারার দ্বারা আল্লাহ পাক বনী ইসরাইলের উপর তার নিয়ামত পূর্ণ করলেন,

কিন্তু তারা যখন সমুদ্র পার হয়ে ওপাড়ে গেলঃ {বস্তুতঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী-ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপুজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা; আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে।} [আ'রাফঃ ১৩৮]

অর্থাৎ ফেরাউন ও তার দল থেকে রক্ষা করে আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছেন তা ভুলে গিয়ে তারা এমন অদ্ভুত জিনিস চাইলঃ {তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। এরা যে, কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল!} [আ'রাফঃ ১৩৮-১৩৯]

অতঃপর মুসা [আঃ] তার প্রভুর দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে গেলেনঃ {আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ন করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।} [আ'রাফঃ ১৪২]

আল্লাহ তায়া'লা মুসা [আঃ] এর সাথে কথা বললেন, তাকে আল্লাহর কালাম ও রিসালাতের মাধ্যমে খাছ করলেন। {[পরওয়ারদেগার] বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক।} [আ'রাফঃ ১৪৪]

তাকে কতিপয় উপদেশ ও আল্লাহর আহকাম সম্বলিত তাওরাত দান করেছেন। {আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও।} [আ'রাফঃ ১৪৫]

যখন মুসা [আঃ] আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন এবং আল্লাহ তায়া'লা তাকে তাওরাত দান করলেন, তখন তিনি জাতির কাছে ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে দেখতে পেলেনঃ [ ] {আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুতঃ তারা ছিল জালেম। অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।} [আ'রাফঃ ১৪৮-১৪৯]

এ সংবাদ মুসা [আঃ] কে খুবই বিচলিত করলঃ {তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গন্য করো না। মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়।} [আ'রাফঃ ১৫০-১৫১]

গো বাছুর তৈরিকারী সামেরীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বললেনঃ {মূসা বললেন হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি?} [ত্বহাঃ ৯৫]

সে জবাব দিলঃ {সে বললঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল।} [ত্বহাঃ ৯৬]

মুসা [আঃ] এর জবাব ছিল খুবই শক্তিশালী ও শিরক বিরোধী। {মূসা বললেনঃ দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি; আমাকে স্পর্শ করো না, এবং তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা সেটি জালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।} [ত্বহাঃ ৯৭-৯৮]

তাওরাতের খন্ডসমূহ তুলে নেয়ার পর মুসা [আঃ] তাদের নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হলেনঃ {তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে।} [আ'রাফঃ ১৫৪]

বনী ইসরাইলের কেউ কেউ তাওরাত গ্রহণ করতে চায়নি, ফলে আল্লাহ তায়া'লা তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরলেনঃ {আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।} [আ'রাফঃ ১৭১]

তাওরাতের হেদায়েত ও রহমত স্বত্বেও তারা পাহাড় পড়ে যাওয়ার ভয়ে উহা গ্রহণ করল। আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর সাথে বনী ইসরাইলের হঠকারিতা চলতে থাকল। একদা তারা এক লোককে হত্যা করল, সে বনী ইসরাইলের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। একরাতে তার চাচাতো

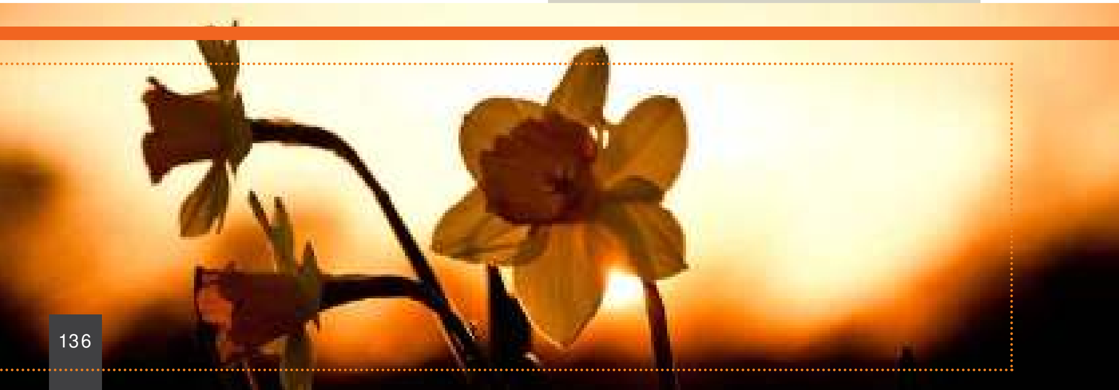
ভাইয়ের ছেলে তাকে হত্যা করে। হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তারা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে থাকে, আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর কাছে বিচার চাইল। তারা অহমিকা ও বেয়াদবীবশে বললঃ হে মুসা [আঃ] আপনি যদি আল্লাহর নবী হন তাহলে আপনার রবকে জিজ্ঞেস করুন কে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে? তখন আল্লাহ তায়া'লা মুসা [আঃ] কে নির্দেশ দিলেনঃ হে মুসা তুমি বনী ইসরাইলকে বল একটা গাভী জবাই করতে, এরপর সে গাভীর একটা অংশ দিয়ে মৃত্যু ব্যক্তিকে আঘাত করলে আমি আমার কুদরতে তাকে জীবিত করে দিব, সে কথা বলবে ও বলে দিবে কে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর।} [বাকারাঃ ৭২-৭৩]

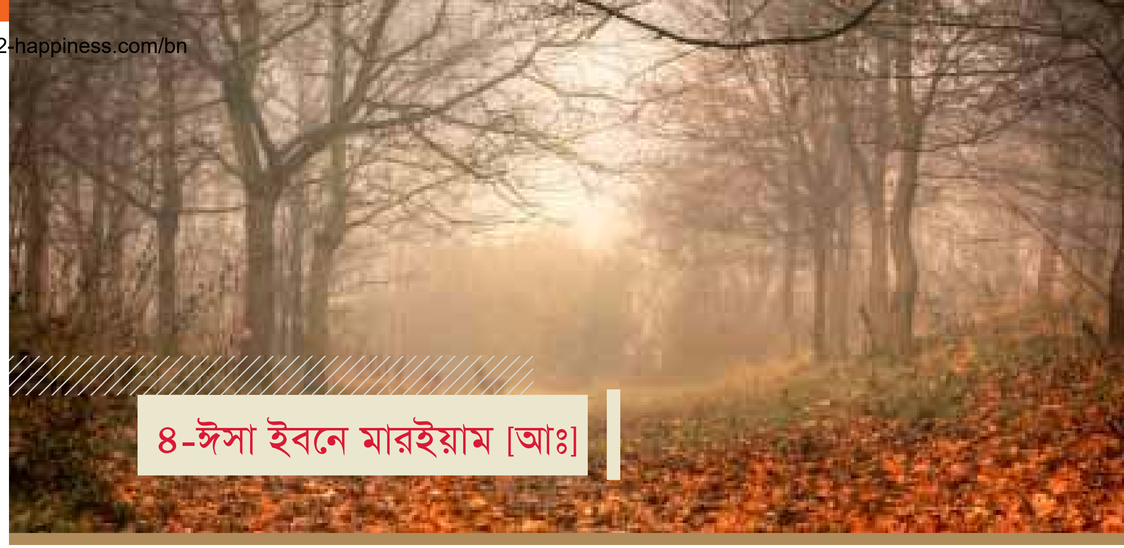
তখন মুসা [আঃ] একটি গাভী জবাই করতে বললেন, তারা যদি গরুর পাল থেকে যে কোন একটি গাভী জবাই করত তা যথেষ্ট হত, কিন্তু তারা গোঁড়ামি ও অহমিকা করল, তখন আল্লাহ তায়া'লা মুসা [আঃ] এর জবানে বললেনঃ {আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল,তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মুসা [আঃ] বললেন,মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।} [বাকারাঃ ৬৭]

তার জাতি বললঃ {তারা বলল,তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর,যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়।} [বাকারাঃ ৬৮]

বাছুর তৈরীকর্তা সামেরী

আল্লাহর নবী হারুন আঃ গোবৎস নির্মাতা ও শিরকের আহ্বায়ক হতে পারেন না। নবী রাসুল গন তো আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বায়ক। যে এর ব্যতিক্রম বর্ণনা করবে সে অবশ্যই বিকৃতকারি। এমনি একটি বর্ননা হলঃ {হারুন তাদেরকে বলল, তোমাদের স্ত্রী, ছেলে মেয়েদের কানে যে সব স্বর্ণালংকার আছে সেগুলো খুলে আমার কাছে নিয়ে আস, গোটা জাতী স্বর্নালংকার খুলে হারুনের কাছে নিয়ে আসল। তিনি তাদের থেকে এসব নিয়েগলিয়ে একটি গোবৎস তৈরি করলেন। তখন তারা বলল, ইসরাইল এটাই তোমার উপাস্য যিনি মিসরের জমিন থেকে তোমাকে তুলে এনেছন।} [আল খুরুজ ২-৪/৩২]





৪-ঈসা ইবনে মারইয়াম [আঃ]

তারা নিজেরা নিজেদের জন্য কঠোরতা করল, ফলে আল্লাহ তায়া'লাও তাদের জন্য কঠিন করে দিলেন। {মূসা [আঃ] বললেন,তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়।} [বাকারাঃ ৬৮]

যা বেশি বয়স্ক ও না, আবার অল্প বয়স্ক ও না। মাঝারি বয়সের। {মূসা [আঃ] বললেন,তিনি বলছেন,সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়-বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল।} [বাকারাঃ ৬৮]

তারা নিজেদের উপর পরিধি সঙ্কুচিত করল। {তারা বলল,তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে,তার রঙ কিরূপ হবে?} [বাকারাঃ ৬৯]

অথচ আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে কোন রঙয়ের ব্যাপারে বলেননি, কোন রঙ নির্দিষ্ট করেননি। {মূসা [আঃ] বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী-যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। } [বাকারাঃ ৬৯]

তারা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করল, এরপর এসে বললঃ {তারা বলল,আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন-তিনি বলে দিন যে,সেটা কিরূপ? কেননা,গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব।} [বাকারাঃ ৭০]

তাদের উত্তরে মুসা [আঃ] বললেনঃ {মূসা [আঃ] বললেন,তিনি বলেন যে,এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়-হবে নিষ্কলঙ্ক,নিখুঁত। তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।} [বাকারাঃ ৭১]

তারা বনী ইসরাইলের সব শহর গ্রাম ঘুরে অনেক কষ্টে ও উচ্চ মূল্য দিয়ে সে গাভী পেল। তারা উহা জবাই করল, যদিও তারা জবাই করতে আগ্রহী ছিলনা। অতঃপর এর একটি অংশ দিয়ে উক্ত মৃত্যু ব্যক্তিকে আঘাত করায় সে আল্লাহর ইচ্ছায় কবর থেকে জীবিত বের হয়ে তাদের সামনে দাঁড়ায়। তখন মুসা [আঃ] তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কে তোমাকে হত্যা করেছে? সে বললঃ এই ব্যক্তিঃ {অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর।} [বাকারাঃ ৭৩]

যখন তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে গেল, সেখানে এক পরাক্রমশালী এক জাতিকে পেলঃ {যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব।} [মায়েদাঃ ২০-২২]

{তারা বললঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।} [মায়েদাঃ ২৪]

আল্লাহ তায়া'লা তাদের এ সিদ্ধানের কারনে ভৎসণা করলেন, জিহাদ ও রাসুলের বিরোধিতা করার ফলে তাদেরকে দিশেহারা হয়ে ময়দান-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি দিলেন। মুসা [আঃ] বললেনঃ {মূসা বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন।} [মায়েদাঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা তার দোয়া কবুল করলেনঃ {বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।} [মায়েদাঃ ২৬]

তারা দিবা রাত্রি, সকাল সন্ধ্যা উদ্দেশ্যহীনভাবে জমিনে ঘুরতো।

হযরত মারইয়ামের পিতা ইমরান বনী ইসরাইলের একজন বুজুর্গ লোক ছিলেন। তিনি দাউদ [আঃ] এর পবিত্র বংশধরের একজন ছিলেন। মারিয়ামের মাতার গর্ভধারণ হচ্ছিলনা। কিন্তু তিনি একটি সন্তানের জন্য খুবই ব্যাকুল ছিলেন। তখন তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেন যে, আল্লাহ পাক যদি তাকে একটি সন্তান দান করেন তবে তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে দান করবেন। {এমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।} [আলে ইমরানঃ ৩৫-৩৬]

আল্লাহ তায়া'লা তার মায়ের মানত কবুল করেন। {অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি।} [আলে ইমরানঃ ৩৭]

তথা সুন্দর, উজ্জ্বল চেহারা ও সৌভাগ্যবান নেককারদের পথ প্রদান করলেন। {আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন।} [আলে ইমরানঃ ৩৭]

নবী গন শ্রেষ্ঠ মানব

নবী রাসুলদের ব্যপারে কিছু বিকৃতি হল, তারা নেশা করেছেন, ব্যভিচার করেছেন, কিংবা নর হত্যার হুকুম দিয়েছেন। এসব এমন বিকৃতি যা সাধারণ নীতিবান মানুষের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। আর মহা মানবদের বেলায় তো বলাই বাহুল্য।
তারা হলেন আল্লাহর নবী। দাউদ আঃ এর ব্যাপারে তওরাতে বিবৃত করা হয়, [স্যামুয়েল [2] 11 / 2-26], এবং নূনের পুত্র ইউশার আঃ ব্যপারে [যিহোশূয় 6/24], এবং মুসা আঃ ব্যপারে [18 টি ইস্যু 31/14] ইত্যাদি যা আল্লাহর রাসুলদের জন্য উপযুক্ত হয়না. “

আল্লাহ তায়া'লা তাকে মহিমান্বিত করেন, তিনি একজন নবীর তত্ত্বাবধানে বড় হন। কেউ কেউ বলেনঃ যাকারিয়া [আঃ] তার খালু বা বোনজামাই ছিলেন। {যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।} [আলে ইমরানঃ ৩৭]

আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও রক্ষনাবেক্ষণ পান। আল্লাহ তায়া'লা তাকে সম্মানিত করেন, তাকে মহানদের মধ্যে নির্বাচিত করেন, তাকে পুতঃপবিত্র করেন, তার সাথে কথা বলেন, তাকে তার ইবাদত করতে নির্দেশ দেনঃ {আর যখন ফেরেশতা বলল হে মারইয়াম!, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর।} [আলে ইমরানঃ ৪২-৪৩]

অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা যখন ঈসা [আঃ] কে এ ধরায় ভুমিষ্ট করাতে চাইলেন, তখন মারইয়াম [আঃ] পরিবার পরিজন থেকে দূরে গেলেন। {এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।} [মারইয়ামঃ ১৬-১৭]

জিব্রাইল [আঃ] কে দেখে মারইয়াম [আঃ] ভীত হলেন, তিনি ভেবেছিলেন, জিব্রাইল [আঃ] তার সাথে খারাপ কিছু করতে চাইছেনঃ {মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব।} [মারইয়ামঃ ১৮-১৯]

চিরকুমারী মারইয়াম [আঃ] এতে আশ্চর্যান্বিত হন। {মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না?} [মারইয়ামঃ ২০]

তখন আল্লাহর দূত জিব্রাইল [আঃ] তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, ইহা আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা, তিনি একে তার একটি নিদর্শন করবেন, যদিও ইহা আল্লাহর জন্য সামান্য একটি ব্যাপার মাত্র। {সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।} [মারইয়ামঃ ২১]

অতঃপর ঈসার [আঃ] জন্মের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা নিদর্শনরুপে বাস্তবায়ন হলো এভাবে যে, তিনিপিতা ছাড়া একজন পবিত্র জননী থেকে ভুমিষ্ট হয়েছেন, যিনি যিনায় লিপ্ত হননি, অথবা কোন অন্যায় কাজও করেননি,- ইহা বান্দাহর জন্য আল্লাহর এক রহমত, তিনি যা ফয়সালা করেন তার বাস্তবায়ন- সুতরাং ঈসা [আঃ] এর জন্ম একটি মু'জিযা, আল্লাহর সৃষ্টির এক মহান নিদর্শন, যেমনিভাবে তিনি আদম [আঃ] কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। {নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। যা তোমার পালকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না।} [আলে ইমরানঃ ৫৯-৬০]

বাইবেলে যীশু দাবি করেন যে প্রভু এক

তার কাছে একজন লেখক এল, ইতিপূর্বে তিনি তাদেরকে বাক বিনিময় করতে শুনেছেন, দেখতে পেয়েছেন যে, সে সুন্দর ভাবে তাদের জবাব দেয়েছে। আসার পর তাকে জিজ্ঞাস করলেন, কোন উপদেশ সবচেয়ে উত্তম? যীশু তাকে উত্তরে বললেন, হে ইস্রাইল শোন, সর্বোত্তম উপদেশ হল, আমাদের উপাস্য রব একক রব। তাই পূর্ণ হৃদয়ে, পূর্ণ স্বত্বায়, পূর্ণ চিন্তায় পূর্ণ শক্তিতে তাকে ভালবাস, এটাই প্রথম উপদেশ, [মার্ক 12/28-35]

তিনি গর্ভবতী হলে সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে দূরে চলে গেলেনঃ {অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।} [মারইয়ামঃ ২২]

প্রসব বেদনা শুরু হলোঃ {রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!} [মারইয়ামঃ ২৩]

তখন ঈসা [আঃ] এর আরেকটি মু'জিযা সংঘটিত হয়ঃ {অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিওঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মানত করছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।} [মারইয়ামঃ ২৪-২৬]

এরপর যখন সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এলেন তখন পুতঃপবিত্র স্বতীসাধ্বী মারইয়ামের জন্য এ সাক্ষাৎ ছিল খুবই কঠিনতম ব্যাপার। {অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী।} [মারইয়ামঃ ২৭-২৮]

তিনি কোন উত্তর দেননি, বরং তিনি ইশারা করলেনঃ {অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন।} [মারইয়ামঃ ২৯]

তারা ইহা অস্বীকার করল, সকলে বলতে লাগলঃ {তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?} [মারইয়ামঃ ২৯]

{সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।} [মারইয়ামঃ ৩০-৩১]

কিন্তু কতিপয় ইহুদিরা একথা বিশ্বাস করলনা, তারা পুতঃপবিত্র মারইয়ামের উপর অপবাদ দিলঃ {আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে।} [নিসাঃ ১৫৬]

তারা পবিত্র মারইয়ামকে যিনার অপবাদ দিল। তখন আল্লাহ তায়া'লা তার পবিত্রতা ঘোষণা করেন, আল্লাহ তায়া'লা তার সম্পর্কে বললেনঃ আর তার জননী একজন ওলী।} [মায়েদাঃ ৭৫]

তিনি ঈসা [আঃ] এর নবুয়্যাত ও রেসালাতের উপর বিশ্বাসী ও উহার সত্যায়ণকারী। আল্লাহ তায়া'লা তার বান্দা ও রাসুল ঈসা [আঃ] ও তার জননীকে মহিমান্বিত ও নেয়ামত দান করেছেন। {যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি।} [মায়েদাঃ ১১০]

তিনি তাকে মু'জিযা ও নিদর্শন দিয়ে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছেনঃ {এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত্যশীল।} [মায়েদাঃ ১১১]



ইসলামে যীশু

যখন আমি ইসলাম নিয়ে পড়লাম তখন ইসা আঃ এর সম্পুর্ণ এক ভিন্ন চিত্র দেখতে পেলাম, যা আমার মাঝে গভীর প্রভাব ফেলে।

ফ্রেডেরিক ডোলামার্ক,
জোহানেসবার্গ এর বিশপদের মাঝে ঊর্ধ্বতন যাজক

হাওয়ারীরা ঈসা [আঃ] কে আসমান থেকে খাদ্য নাযিল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বললেনঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন হাওয়ারীরা বললঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন?} [মায়েদাঃ ১১২]

অতঃপর তিনি তাদের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞতার আশংকা করলেনঃ {তিনি বললেনঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। তারা বললঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।} [মায়েদাঃ ১১২-১১৩]

তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ {ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেনঃ হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুযীদাতা। আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যাক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।} [মায়েদাঃ ১১৪-১১৫]

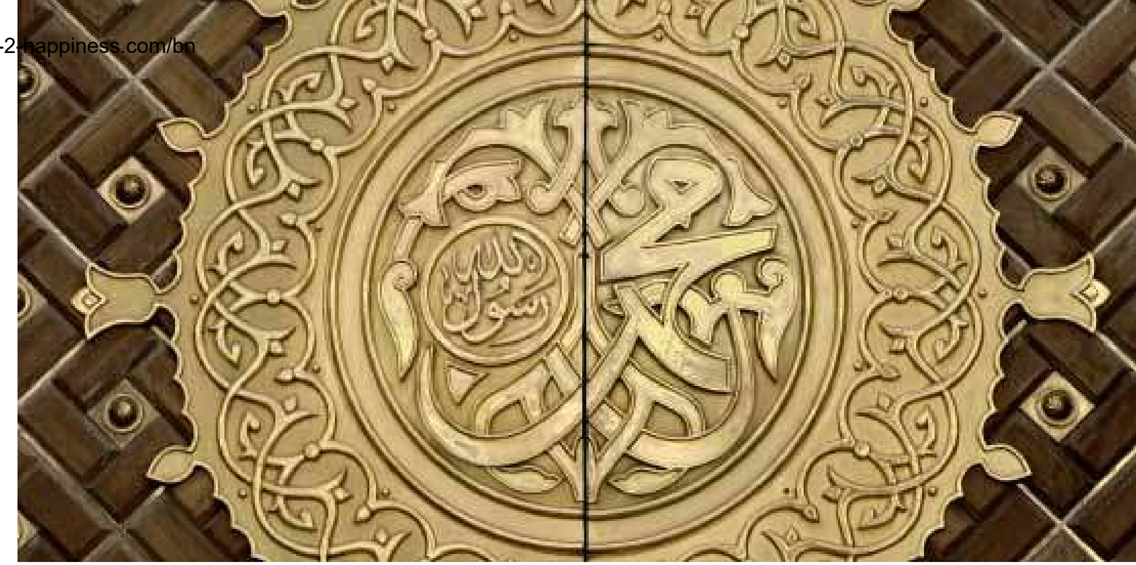
যখন মায়েদা নাযিল হলো তখন তাদের কতিপয় লোক কুফুরী করলঃ

আর বনী ইসরাইলের ইহুদীরা আল্লাহর নবী ঈসা [আঃ] কে অস্বীকার করল, তারা তাদের

বাইবেল ক্রুশকে অস্বীকার করে এবং আকাশে উঠিয়ে নেয়াকে সাব্যস্ত করে

"তারা পাথর নিল তাকে নিক্ষেপ করতে। তবে যীশু তাদের ভিতর দিয়েই উপাসনালয় থেকে বেরিয়ে আত্ম গোপন করে এদিক চলে গেলেন।" [ইউহেন্না ৮/৫৯]
"এর পরও তারে তাকে খুঁজল ধরার জন্য তখনও তিনি বেরিয়ে গেলেন।"[ইউহেন্না১০/১৯]
এটা ঘটল যাতে বাইবেলের এ কথা বাস্তবায়িত হয় যেঃ "তার কোন হাড় ভাংবেনা।" [ইউহেন্না ৩৬/১৯]
"যীশু ইনি যে তোমাদের থেকে আকাশে উত্তলিত হয়েছেন।"[দূত গনের ঘটনা গ্রন্থ ১/১১]





কুফুরী ও মিথ্যাচারেই ছিল, এমনকি তারা ঈসা [আঃ] এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে লাগলঃ {এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।} [আলে ইমরানঃ ৫৪]

আল্লাহ তায়া'লা তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন, আরো জানালেন যে, কিভাবে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। {আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।} [আলে ইমরানঃ ৫৫]

এভাবে যখন তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, ষড়যন্ত্র, কুফুরী, আল্লাহর নবীদেরকে হত্যার চেষ্টা ও পুতঃপবিত্র মারইয়াম [আঃ] কে অপবাদ দেয়া চলতে থাকল, তখন আল্লাহ তায়া'লা বললেনঃ {অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গর জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে। আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল।} [নিসাঃ ১৫৫-১৫৭]

কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা তাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেনঃ {অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে।} [নিসাঃ ১৫৭]



বরং তারা তার অনুরূপ চেহারার একজনকে হত্যা করেছেঃ {বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।} [নিসাঃ ১৫৭-১৫৮]

আল্লাহ তায়'লা তার বান্দা ও রাসুল ঈসা [আঃ] কে রক্ষা করে আসমানে তুলে নেনঃ {আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।} [নিসাঃ ১৫৯]

আর ইহাই হলো ঈসা ইবনে মারইয়ামের [আঃ] প্রকৃত ঘটনা। {এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেনঃ হও এবং তা হয়ে যায়।} [মারইয়ামঃ ৩৪-৩৫]

আল্লাহ তায়'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন তার কোন সন্তান নেই, কেননা তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। সব কিছুই তার মুখাপেক্ষী, অবনত ও অনুগত। আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তার ইবাদত করে, তিনি সব কিছুর পালনকর্তা, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কোন প্রতিপালক নেই।

৫- মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম]

নবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] খাতেমুন নাবিয়্যীন ওয়াল মুরসালিন [সর্বশেষ নবী ও রাসুল] । ঈসা [আঃ] বনী ইসরাইলকে শেষ নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। {স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা [আঃ] বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।} [ছফঃ ৬]



মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর আগমনের সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে ছিল। আল্লাহ তায়'লা বলেনঃ {সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।} [আ'রাফঃ ১৫৭]

এমনকি আল্লাহ তায়'লা সকল নবী রাসুলদের থেকে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর ব্যাপারে এ অঙ্গিকার নিয়েছেন যে, তিনি যদি তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হন তাহলে তারা তার উপর ঈমান আনবেন, তাকে সাহায্য করবেন। সকল নবীরা তাদের উম্মতকে এ খবর পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে সব জাতির মাঝে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়'লা বলেনঃ {আর আল্লাহ যখন নবীগনের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।} [আলে ইমরানঃ ৮১]

মহাগ্রন্থ আল কোরআন সে সুসংবাদের দিকে ইশারা দিয়েছে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর নবুয়্যাতের সত্যতা প্রমাণে ইহা দলিল হিসেবে পেশ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কাফেররা বলেঃ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।} [রা'দঃ ৪৩]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে?} [শুয়ারাঃ ১৯৬-১৯৭]

আহলে কিতাবরা আশা করত তারা হবে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর উপর প্রথম ঈমান আনায়নকারী, যেহেতু তারা তাকে এমনভাবে জানত ও চিনত যেভাবে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জানত ও চিনত। আল্লাহ তায়া'লা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ {{আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।} [বাকারাঃ ১৪৬]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন- যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-যেন তারা জানেইনা।} [বাকারাঃ ১০১]



মুহাম্মদ সাঃ শেষ নবী

কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে জমিন থেকে উত্তোলন করবেন এবং প্রতারকের রূপ পাল্টে দিবেন ফলে সবাই তাকে মনে করবে আমি। তবে সে যখন বিশ্রী রকমে মারা যাবে তখন এ কালিমার মাঝে আমি কিছু কাল থাকব, কিন্তু যখন আলাহর পবিত্র রাসুল মুহম্মদ সঃ আসবেন তখন আমার এ কালিমা দূরীভূত হবে।

বার্নাবাসের বাইবেল

পূর্ববর্তী নবীদের এ সুসংবাদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের উপর প্রযোজ্য। তিনি সে রাসুল যার আগমনের বার্তা পূর্ববর্তীরা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কতিপয় এ সত্য গোপন করেছে, তাদের পবিত্র গ্রন্থে যা ছিল তা অস্বীকার করল, ইহাকে তারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানেই না।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম এক আল্লাহর তাওহীদ নিয়ে এসেছেন, যার কোন শরিক নেই, যেমনিভাবে অন্যান্য নবী রাসুলগণ এ দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।} [আম্বিয়াঃ ২৫]

এমনিভাবে ইনি তাঁর পূর্ববর্তী সব নবী রাসুলগণের সত্যায়নকারী, তাদের সকলের উপর কোন পার্থক্য ছাড়া ঈমান আনয়নকারী। {আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না।} [বাকারাঃ ১৩৬]

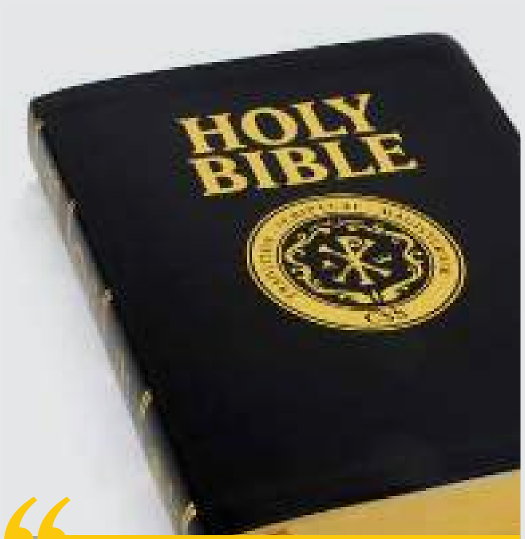
বরং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনল, কিন্তু কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য যে কোন একজন নবী বা রাসুলের উপর ঈমান আনলনা, সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের উপরই ঈমান আনলনা। {তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।} [শুরাঃ ১৩]

আল্লাহ তায়া'লা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দাহঃ {বলুনঃ আমি ও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।} [কাহফঃ ১১০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম নিরক্ষর ছিলেন, লিখতে বা পড়তে পারতেননা। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে তাঁর গুনাবলী এভাবেই বর্ণিত হয়েছে; যেন আহলে কিতাবগন তাঁর গুনাবলী দেখে তাঁকে চিনতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।} [আ'রাফঃ ১৫৭]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দ্বারা অনেক দৃশ্যমান মুজিযা সংঘটিত করেছেন যেমনিভাবে তিনি অন্যান্য নবী রাসুলদের দ্বারা করিয়েছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় মুজিযা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন, যাতে পূর্ব ও পরবর্তীদের অনেক ঘটনা, বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ রয়েছে। {আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।} [নাহলঃ ৮৯]

আর রয়েছে, মু'মিনদের জন্য গভীর জ্ঞান। {এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত।} [জাসিয়াঃ ২০]



"

বাইবেলে মুহাম্মদ সাঃ এর সুসংবাদ

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সঃ আসা পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকবে। যিনি এসে এই ধোকা পরিষ্কার করে দিবেন আল্লাহর শরিয়তে বিশ্বাসী মানুষের জন্য।

ইশাইয়ার গ্রন্থে এসেছে, আমি আপনার নাম রেখেছি মুহাম্মদ। হে মুহাম্মদ, হে রবের স্তুতিকারক, আপনার নাম আদিকাল থেকে বিদ্যমান।

হাবাক্কুক [Habakkuk] গ্রন্থে এসেছে, আল্লাহ এসেছেন তিমান থেকে আর কুদ্দুস [নবী] এসেছেন ফারান পর্বত থেকে। তখন মুহাম্মদের দ্যুতিতে আকাশ উজ্জল হয়েছিল আর জমিন পুর্ণ হয়েছিল তার প্রশংসায়।

ইশাইয়ার গ্রন্থে এসেছে, আমি তাকে যা দিয়েছি আর কাউকে তা দিবনা, আহমাদ আল্লাহর অভিনব প্রশংসা করবে যা আর কেউ করবেনা , উত্তম ভুমি থেকে তিনি আগমন করবেন, সৃষ্টি জগত তাকে পেয়ে আনন্দিত হবে,চতুর্দিকে তারা একত্ববাদ স্বীকার করবে এবং তামাম পৃথিবীতে তাকে তারা সম্মান করবে

বার্নাবাস এর বাইবেল

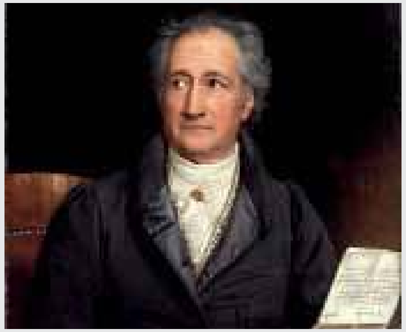
"

মানুষ যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করেছে সে সব বিষয়ে এই নিরক্ষর নবী কোরআনের দ্বারা মীমাংসা করেছেন। {আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদের কে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে।} [নাহলঃ ৬৪]

কুরাইশরা তাঁর সত্যতা ও আমানতদারীতা জেনে তাঁকে আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করা সত্বেও তাঁকে মিথ্যারোপ করেছে। তাই আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন তারা সকলে মিলে বরং জীন ইনসান সবাই মিলে কোরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করতে। {বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়,এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।} [বনী ইসরাইলঃ ৮৮]

তারা তাঁকে মিথ্যারোপ করেছে অথচ তারা এর অনুরূপ কিছুই আনতে পারেনি, যদিও তাদের ভাষাগত অনেক দক্ষতা ও পান্ডিত্য ছিল। অতঃপর তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হলো যে, সকলে মিলে কোরআনের অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে আনতেঃ তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। } [হুদঃ ১৩]

এতেও তারা অক্ষম হলো। অতঃপর চ্যালেঞ্জ করা হলো যে কোরআনের অনুরূপ একটি মাত্র সূরা আনয়ন করতেঃ এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি,তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। } [বাকারাঃ ২৩]



উচ্চতর আদর্শ

ইতিহাসে এই মানুষের উত্তম আদর্শ খুঁজেছি। তা পেয়েছি আরাবি নবী মুহাম্মাদের মাঝে।

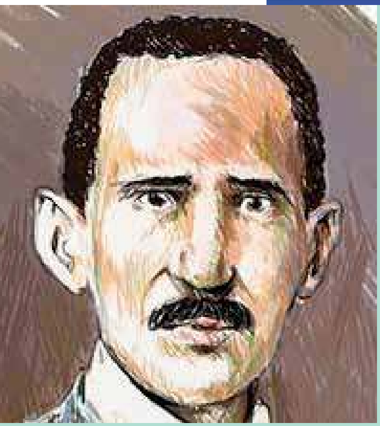
গ্যাটে
জার্মান কবি জার্মান কবি



জিজ্ঞাসা করুন .. কোরান উত্তর দিবে

কোরান অধ্যয়ন করে এতে জীবনের সব জিজ্ঞাসার জবাব পেয়েছি।

মাইকেল হার্ট
আমেরিকান লেখক



মানুষের জন্য হল আহমদ

খৃষ্টান সম্পর্কে প্রবাদ হল, উর্ধ জগতে আল্লাহর মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি আর মানুষের আনন্দ। বরং ছিল এমনঃ উর্ধ জগতে আল্লাহর মহিমা, পৃথিবীতে ইসলাম আর মানুষের জন্য আহমাদ।

ডেভিড বেঞ্জামিন
মাওসেলের সাবেক বিশপ

এতেও তারা অক্ষম হলো, যদিও তারা বাগ্মিতা ও সাহিত্য রচনাশৈলিতে অনেক পারদর্শী ছিল।

কুরাইশ কাফেরেরা তাঁকে মিথ্যারোপ করতেই লাগল। আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে ধৈর্যধারণ করতে বললেন, যেভাবে তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ যেমনঃ ইবরাহীম, নুহ, মূছা ও ঈসা আলাহিস সালামকে ধৈর্যধারণ করতে বলেছিলেন। {অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন।} [আহকাফঃ ৩৫]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম ধৈর্য ধারণ করলেন, তার দাওয়াতী মিশন চালিয়ে গেলেন, তিনি লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকলেন, তাঁর কথা ও চরিত্রের মাধ্যমে লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, ফলে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হেফাযতের জন্য যথেষ্ট ছিলেন, বস্তুত তিনি তাকে হেফাযত করেছেন। হে নবী,আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। } [আনফালঃ ৬৪] আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? } [যুমারঃ ৩৬]

তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন, যেমনিভাবে তিনি অন্যান্য নবী রাসুলগণকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।} [মুজাদালাঃ ২১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।} [সূরা সাফফাতঃ ১৭১-১৭৩]

{আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে। } [সূরা আল-মু'মিনঃ৫]

কাফেরেরা তাঁর রিসালাতকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল, তারা এ আলোকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করলেনঃ {তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। } [ছফঃ ৮-৯]

তিনি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করলেন, ইসলামকে বিজয়ী করলেন, সব ধর্মের মধ্যে আল্লাহর তাওহীদকে সুদৃঢ় করলেন, মানবজাতির উপর এই রিসালাত ও দ্বীনের মাধ্যমে তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করলেন। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।} [মায়েদাঃ ৩]

বরং তিনি নিজেই এই ধর্মকে হেফাযত করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ রিসালাত অবশিষ্ট থাকবেঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। } [হিজরঃ ৯]

ইহা হলো রিসালাতের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রিসালাতঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।} [আহযাবঃ ৪০]

এ জমিন ও তার মধ্যকার যা কিছু আছে তা যতদিন টিকে থাকবে এ রিসালাতও ততদিন টিকে থাকবে।

তাহলে এটা কোন রিসালাত যা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়া'লার সংরক্ষণে টিকে থাকবে?!

বরং তিনি নিজেই এই ধর্মকে হেফাযত করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ রিসালাত অবশিষ্ট থাকবেঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। } [হিজরঃ ৯]

ইহা হলো রিসালাতের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রিসালাতঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।} [আহযাবঃ ৪০]

এ জমিন ও তার মধ্যকার যা কিছু আছে তা যতদিন টিকে থাকবে এ রিসালাতও ততদিন টিকে থাকবে।

তাহলে এটা কোন রিসালাত যা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়া'লার সংরক্ষণে টিকে থাকবে?!

অলৌকিক কুরআন

আল কোরান চিন্তার উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে, হৃদয় কেড়ে নেয়। মুহাম্মদ সঃ এর উপর নাজিল হয় তার সত্যতার প্রমান স্বরূপ।

হেনরি ডি কস্ত্রি
ফরাসি সাবেক সেনা অফিসার



الطريق الى السعادة
The Path to Happiness

সূচিপত্র



কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রিসালাত



কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রিসালাত

যখনই মানুষ আসমানী হিদায়েত ও নবী রাসুলের রিসালাত থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই মানবজাতির উপর দূর্ভাগ্য ও অন্ধকার নেমে এসেছে। তাই তাদেরকে হেদায়েতের পথে আনতে আল্লাহ তায়া'লা একের পর এক নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। {সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি,যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ।} [সূরা নিসাঃ ১৬৫]

তিনি রাসুল প্রেরণ ব্যতীত কাউকে আযাব ও শাস্তি দিবেন না। {কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।} [সূরা বনী ইস্রাইলঃ ১৫]

তিনি ঈসা [আঃ] কে প্রেরণ করার পরে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন তখন মানবজাতি জাহেলিয়াত, ভ্রষ্টতা, অত্যাচার-অবিচার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তখন আসমানী ধর্মগুলো কতিপয় মিথ্যাবাদী পরিবর্তনকারীদের দ্বারা রূপান্তরিত ও পরিবর্তীত হয়ে গিয়েছিল। তারা বিশুদ্ধ তাওহীদকে পৌত্তলিকতা ও শিরকে রূপান্তরিত করেছিল। তারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা চালিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর স্বত্বা নিয়ে নানারূপ মিথ্যা কথাবার্তা বানিয়ে বানিয়ে বলত। ইবাদত ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব, পৌত্তলিক ও মূর্তিপুজকদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিলনা। শিরক ও নাস্তিকতার মহাধ্বংসস্তুপের মাঝে তাওহীদের আলো নিভে গিয়েছিল। আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন ও রূপান্তর করেছিল। আহলে কিতাবরা যে সব ওয়াদা ও অঙ্গিকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল, তারা আল্লাহর কালামকে পশ্চাতে ফেলে দিল। এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা সত্য গোপন করেছিল, মিথ্যাকে প্রকাশ করেছিল। নিজেদের চিত্তপ্রসাদ করতে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের ব্যাপারে আল্লাহর হারামকৃত জিনিসে দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তারা কিছু পদমর্যাদা ও সামান্য অর্থের বিনিময়ে সত্য গোপন করেছিল। যেমন হয়েছিল তাদের কতিপয় নেতাদের সাথে যারা নিজেদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করত, সত্যের উপরে প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিত। ফলে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত, স্বৈরশাসন চলছিল, মানবজাতি ঘোর অন্ধকারে বসবাস করত। কুফুরী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষের আত্মাও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। নৈতিকতা পদদলিত হয়েছিল, মান সম্মান লুণ্ঠিত হয়েছিল, অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছিল। জলে স্থলে সর্বত্র ফিতনা ফাসাদ দেখা দিয়েছিল। অবস্থা এতই ভয়াবহ ছিল যে, যদি বিবেক সম্পন্ন কেউ একটু চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে সে সময় মানবতা কতটা সঙ্কটাপন্ন ও বিপন্ন ছিল। মানবতা প্রায় বিস্মৃত হতে লাগছিল, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়া'লা মানবজাতিকে পথ দেখাতে ও সরল সঠিক পথের সন্ধান দিতে তাদের কল্যাণে নবুয়্যাতের আলো প্রজ্বলিত করলেন ও হিদায়েতের আলো জ্বালিয়ে দিলেন।

মানবজাতিকে মুক্তি দিতে সেই ঘোর অন্ধকারে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবীকে পাঠালেন। তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম। তাঁকে তিনি মনোনীত করলেন, যাতে তিনিঃ {তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।} [সূরা আহযাবঃ ৪০]

মানবজাতিকে ভ্রষ্টতা ও দূর্দশা থেকে মুক্তি দিতে তাঁকে তিনি হেদায়েতের আলোকবর্তীকা নিয়ে প্রেরণ করলেন। ফলে আল্লাহ তায়া'লা এ দ্বীনকে মানবজাতির জন্য পূর্ণ করলেন, তিনি তার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বিশ্ববাসীর নিকট এ সত্য পৌঁছে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

যাতে তারা শান্তির পথের সন্ধান পায়।



তরতাজা ঘটনা

মানবেতিহাসে অধিক তরতাজা ফলদায়ক ঘটনা গুলোর আন্যতম হল, ইসলামের আবির্ভাব।

জর্জ সার্টুন

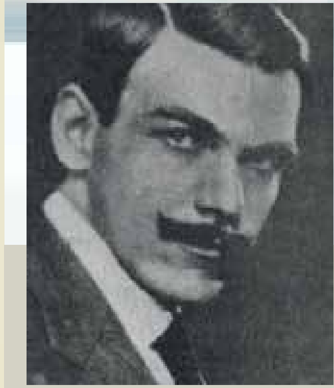
ওয়াশিংটন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক



তিনি [সাঃ] তার এ দাওয়াতী কাজে দুনিয়ার কোন স্বার্থ কামনা করেননি, মানুষের থেকে কোন প্রতিদানও চাননি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন,আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।} [সূরা ছোয়াদঃ ৮৬]

বরং আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে দুনিয়ার সম্রাট ও রাসুল অথবা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা ও রাসুল হওয়ার মাঝে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল হওয়াকে বেছে নিয়েছেন। তিনি [সাঃ] মানুষ ছিলেন, অন্যান্য মানুষের মতই জীবন যাপন করেছেন, তার সাথীরা যেভাবে ক্ষুধার্ত হতেন তিনিও সেভাবে ক্ষুধার্ত হতেন, তারা যেমন ব্যথা অনুভব করত তিনিও সেভাবে ব্যথা অনুভব করতেন, তাদের সাথে কাজ করতেন, তিনি নিজে আল্লাহর বান্দা হওয়ায় গর্ববোধ করতেন। আল্লাহ তায়া'লা যখনই তাকে সম্মানিত করতে চাইতেন তখন তিনি তাকে নিজের বান্দা বলে উল্লেখ করতেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।} [সূরা কাহফঃ ১]

বরং তিনি নিজেই মানুষদেরকে সতর্ক করতেন যারা তাঁর ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি করতেন, বা তার অধিকারের চেয়ে বেশি সম্মান দিতেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ "তোমরা আমার ব্যাপারে এত উচ্চপ্রশংসা করনা, যেমনিভাবে খৃষ্টানরা মারইয়ামের পুত্র ঈসা [আঃ] সম্পর্কে করে থাকেন, আমি হলাম আল্লাহর বান্দাহ, তাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল বলো"। [বুখারী শরিফ]। যারাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে দেখেছেন ও জেনেছেন তারা তাঁর সততা দেখেছেন, তাঁর চাল চলন বা সিরাত দেখে হতভম্ব ও আশ্চর্য হয়েছেন। তাঁর সুন্দর আখলাক দেখে সবাই অভিভূত হয়েছেন। কেনইবা হবেন না, তাঁর বন্ধুদের আগে চরম শত্রুরাও এবং মুসলমানদের আগে কাফেররাও তাঁর মহান চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়া'লার সাক্ষ্যই তাঁর



বিস্ময়কর সংবাদ

ইসলামের সূচনা ছিল প্রায় একটি বিস্ময়কর সংবাদ যা মানবেতিহাসে ইসলামের আবির্ভাব লিপিবদ্ধ করেছে এমন এক জাতির মাঝে যা ইতিপূর্বে ছিল নড়বড়ে, এমন এক দেশে যা ছিল নিম্ন মর্যাদার। ইসলাম আবির্ভাবের পর দশ দশক না যেতেই উচ্চ শিখর ও দীর্ঘ বিস্তির্ণ সম্রাজ্য গুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অর্ধ জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। কাল-কালান্তরের ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের পুরনো ধর্ম গুলোকে পরাজিত করে। একে একে অনেক জাতীর আত্মাকে পরিশোধিত করে। দৃঢ়বন্ধনে মজবুত একটি আধুনিক জগত রচনা করে। যা হল ইসলামের জগত।

লুথ্রোব স্টুডার্ড
মার্কিন লেখক



বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ

মুহাম্মদ [সঃ] এর জীবনের মত জীবন, তাঁর চিন্তা ভাবনা ও জিহাদের শক্তি, তাঁর কাওমের কুসংস্কার ও জাতির জাহেলিয়াত অপসারণ, মুর্তি পূঁজকদের কাছ থেকে যে সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন সেসব মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর বানী উঁচু করা, তাঁর ধৈর্য ধারণ , ইসলামি আক্বীদাকে প্রোথিত করার জন্য এসব কাজ... এগুলো প্রমান করে, তাঁর মাঝে কোন কপটতা ছিল না, তিনি অসত্যের উপর লালিত নন। তিনি দার্শনিক, বক্তা, রাসুল ও জীবন দর্শন প্রনেতা, মানবতার বুদ্ধির দিশারী। সন্দেহমুক্ত একজন ধর্ম প্রণেতা। পৃথিবীতে বিশটি দেশের স্থপতি। আকাশে আধ্যাত্মিক জগতের বিজেতা। আর কে তাঁর মত মানবিক মাহাত্ম অর্জন করতে পেরেছে! আর কে তাঁর মত পূর্নতার এমন স্তরে পৌঁছতে পেরেছে!

লামার্টিন
ফরাসি কবি

জন্য যথেষ্ট, তিনি বলেনঃ {আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [সূরা কলমঃ ৪]

বরং এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন। যখন তাঁর মিশন শেষ হয়ে গেছে তখন আল্লাহ তায়া'লা তার মৃত্যু দান করেছেন, কিন্তু তাঁর রিসালাত মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রেখেছেন।



মহামানবদের অন্যতম

ইতিহাসে মুহাম্মদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যুগপৎ ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষেত্রে সর্বাধিক মহান ও উল্লেখ যোগ্য রূপে সফল হয়েছেন। ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষেত্রে এমন নজীর বিহীন বিরল যুগপৎ প্রভাব তাকে পরিণত করেছে মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী মহানতম ব্যক্তিত্বে।

মাইকেল হার্ট
মার্কিন লেখক



তাকে শুধু অকৃতজ্ঞরাই অস্বীকার করে

মুহাম্মদ আক্ষরিক অর্থেই এক জন সত্য নবী। মুহাম্মদ যে মুক্তির পথের দিশারী আমরা কখনো তা অস্বীকার করতে পারব না।

হান্স কং
সুইস ধর্মতত্ত্ববিদ

রাসুলের [সাঃ] নবুয়াতের প্রমাণসমূহঃ

১. তিনি এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডেকেছেন, তিনি ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদত করা থেকে বিরত থেকেছেন, যেমনটি অন্যান্য নবী রাসুলগণ করেছেন। যে ব্যক্তি হযরত মূছা, ঈসা [আঃ] ও মুহাম্মদ [সাঃ] এর আনিত সব সঠিক আক্বিদা, সুদৃঢ় শরিয়ত ও হিতকর ইলম নিয়ে তুলনা করে দেখবে সে জানতে পারবে যে, এ সব কিছু একই প্রদীপ থেকে উৎসারিত, ইহা নবুয়াতের আলোকবর্তীকা।

২. তাঁর দ্বারা অনেক মুজিযা ও নিদর্শন সংঘটিত হয়েছে, যা কোন নবী ছাড়া অন্য কারো থেকে প্রকাশ পায়না। কেননা আল্লাহর চিরন্তন বিধান হলো তিনি পূর্ববর্তী সব নবী রাসুলদের দ্বারা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা তাদের জন্য মুজিযা, তাদের সত্যতার প্রমাণ ও জাতির নিকট প্রমাণ করার পন্থা। প্রত্যেক নবী যে জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন সে জাতি যে বিষয়ে বেশি পারদর্শী সে বিষয়ে তাঁর মুজিযা ছিল। মূসা [আঃ] এর মুজিযা ছিল তাঁর জাতি যে বিষয়ে বেশী পারদর্শী সে বিষয়ে, সেটা হলো যাদু বিদ্যা। আল্লাহ তায়া'লা তাদের যাদুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা সর্বপ্রকার যাদু বিদ্যায় অনেক দক্ষ ও পারদর্শী হওয়া সত্বেও মূসা [আঃ] এর যাদুর মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়েছিল। ঈসা [আঃ] এর জাতি চিকিৎসা বিদ্যা ও আরোগ্য - বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল, ফলে আল্লাহ তায়া'লা তার দ্বারা কঠিন কঠিন রোগ থেকে আরোগ্যদান করেন। তাঁর দ্বারা তিনি মৃত্যুকে জীবিত করেন, ইহা ছিল তার দৃশ্যমান মুজিযা। আর এসব একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের

সাথে নির্ধারিত ছিল, বিশ্বব্যাপী স্থায়ী ছিলনা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের ও সে সব দৃশ্যমান মুযিজা ছিল, যেমনঃ তাঁর আঙ্গুল থেকে পানি নির্গত হওয়া। সামান্য খাবার বেশি হওয়া, এমনকি তাঁর সাথে সব মুসলমানেরা তা খেয়েও অবশিষ্ট ছিল। সামান্য পানি বেড়ে যাওয়া, যা তাঁর সাথের সব সৈনিকেরা পান করেছেন ও অযু করেছেন। তাঁর মিম্বার থেকে কাঠের টুকরা আলাদা করায় সেটার ক্রন্দন, মক্কায় পাথরের সালাম দেয়া, গাছ তাঁর দিকে হেলে পড়া, তাঁর মুঠোয় পাথরের টুকরার তাছবীহ পাঠ, আল্লাহর ইচ্ছায় রোগীকে আরোগ্য করা ইত্যাদি।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেসব মুযিজার কথা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা অন্যতম। তাঁকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে, অতঃপর সেখান থেকে সপ্ত আসমান ভ্রমণ করানো হয়েছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।} [বনী ইসরাইলঃ ১]

এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।} [সূরা কামারঃ ১]

মুশরিকেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের সত্যতা প্রমাণে তাঁর নিকট স্পষ্ট মুযিজা চাইল। তারা চন্দ্রকে বিদীর্ণ করতে বললেন। যদি তিনি এটা করতে পারেন তবে তারা ঈমান আনবে বলে ওয়াদা করল। সেদিন ছিল চৌদ্দ তারিখ, পুর্নিমার রাত্রি, এ তারিখে চন্দ্র পূর্ণ আকার ধারণ করে ও উজ্জ্বল থাকে। তাই



আল্লাহর কালাম

আমি যখন কোরআন কারীম পাঠ সমাপ্ত করলাম, আমাকে এমন অনুভুতি আচ্ছন্ন করল যে, কোরআনই সৃষ্টি ও অন্যান্য জিজ্ঞাসার সন্তোষ জনক উত্তর দেয় এবং তা ঘটনাবলী যৌক্তিকভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে, যা অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবে পরস্পর বিরোধীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোরআন সেসব ঘটনা আকর্ষণীয় বিন্যাসে ও আকাট্য শৈলীতে আলোচনা করেছে। এর সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহর বাণী এসব ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ডেবোরা পটার

মার্কিন সাংবাদিক

দুয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য......

আরবী নবীর আগে যে সব নবী রাসুল ছিলেন তাদেরকে ইসলাম যত সম্মান করে আর কোন ধর্ম তা করে না। তাকে যারা বিশ্বাস করে তাদের উপর তিনি ফরয করে দিয়েছেন সে সব নবী রাসুলদেরকে সম্মান করা ও তাদের প্রতি বিশ্বাস করাকে। ইসলামের মত আর কোন ধর্ম আগের ঐশী ধর্মকে এত সম্মান করে না।

নাসরী সালহাব

লেবানিজ সাহিত্যিক





রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন যাতে কাফেরদের আবেদন পূরণ করা হয়। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দোয়া কবুল করলেন, ফলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হলো। এক খন্ড সাফা পাহাড়ের উপর ও অন্যখন্ড তার সামনের কিকায়ান পাহাড়ের উপর পড়ল। এত বড় নিদর্শন সংঘটিত হওয়ার পরেও কুরাইশ মুশরিকেরা ঈমান আনেনি। তারা একে যাদু বলে গন্য করল। আর ইহাই যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখদের চিরাচরিত অভ্যাস, যখনই সত্য স্পষ্ট হয়ে তাদের শক্তিকে ধ্বংস করে দেয় এবং সত্যের আলো তাদের গোমরাহীকে নিভিয়ে দেয় তখন তারা মূল বিষয়টাকে বিকৃত করার চেষ্টা করে বা সত্যকে উল্টিয়ে দিয়ে ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতায় লিপ্ত হতে পিছপা হয়না। তারা মনে করে এটাই সত্যকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়।} [সূরা ক্বামারঃ ২-৩]

৩. আল কোরআনঃ ইহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের সবচেয়ে বড় মুজিযা, যুগ যুগ ধরে ইহা স্থায়ী ছিল ও আছে। ইহা তাঁর অর্থগত যুক্তিনির্ভর মুযিজা, নবুয়াতের এক মহানিদর্শন। কেননা উহা চূড়ান্ত কিতাব। আল্লাহ তায়া'লা এ মহাগ্রন্থ এমন একজন নিরক্ষর লোকের উপর নাযিল করেছেন, যিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। তিনি সব সাহিত্যিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন কোরআনের অনুরূপ বা ইহার যে কোন সূরার অনুরূপ কিছু রচনা করতে। কোরআনের অলৌকিকতা ও চ্যালেঞ্জ অহংকারী ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। ইহার ভাষাগত বিশুদ্ধতা, বাগ্মিতা, গাঁথনশৈলি ও বাচনভঙ্গি সব কিছুই বিস্ময়কর ও

মু'জিযা। অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, এছাড়া এর সুবিজ্ঞচিত বিধানাবলী, সুউচ শিষ্টাচার, হেদায়েত, আলোর দিশা ও বরকত সব কিছুই এক একটা মহামু'জিযা।

আল কোরআনে অহীর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্পর্কে যেসব বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমানে প্রমাণ করেছে। সে সব বিষয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের অহী প্রাপ্তির পূর্বে মানুষের জানা ছিলনা। ইহাই তার নবুয়াতের অকাট্য প্রমাণ। এমনিভাবে গর্ভস্থ সন্তান বেড়ে উঠা সম্পর্কে কোরআন যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান তা আবিষ্কার করেছে। এছাড়াও সমুদ্রে মিঠা ও লবন পানির মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যরেখা ইত্যাদি। আল কোরআন আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত হওয়ার অন্যতম বড় প্রমাণ হলো, চৌদ্দশত বছরের অধিক সময় ধরে ইহা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে অবিকাল অবস্থায় আছে। এতে কোন ধরণের পরিবর্তন ও বিকৃতি হয়নি। ইহা বারবার তিলাওয়াত করার পরেও তিলাওয়াতকারী বিরক্ত হয়না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।} [সূরা হিজরঃ ৯]

বরং তিনি কোরআনের মাধ্যমে সহিহ আক্বীদা, পরিপূর্ণ জীবন বিধানও সংরক্ষণ করেছেন। ইহার দ্বারা তিনি একটি উত্তম জাতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের মু'যিজা অন্যান্য নবীদের মুযিজা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, অনেক বড়, বিশ্বব্যাপী ও স্থায়ী। কোরআনের চ্যালেঞ্জ এখনও বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহার অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করার চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।} [বনী ইসরাইলঃ ৮৮]



সুস্পষ্ট আরবী ভাষী

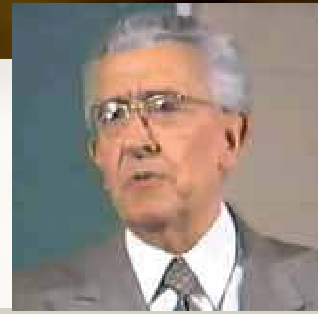
এই মহান সূরাগুলোতে মুহাম্মদ [সঃ] যে আয়াতগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন সেগুলো সুভাষীদের বক্তব্যকে অনেক পিছনে ফেলে রাখে। তা আমরা স্মরণ করতে পারি আমাদের কাছে আসা অনুরচিত ভাষ্যগুলো থেকে।

ব্লাশির রিজাইশ

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

৪. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাবিশ্ব ও নানা দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন আগাম সংবাদ দিয়েছেন। সে সব ঘটনা তাঁর দেয়া সংবাদ অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। যেমনঃ সিরিয়া, ইরাক ও কনস্টান্টিনোপল [ইস্তাম্বুল] বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি পূর্ববর্তী উম্মত, নবী রাসুলদের সাথে তাদের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। আদম [আঃ] থেকে শুরু করে সমস্ত নবী রাসুল যেমনঃ নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা [আঃ] প্রভৃতি নবী রাসুল সম্পর্কে তিনি অনেক সংবাদ দিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছেন। তিনি যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন সে সব ঘটনা সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে। যেমনঃ যখন রোমানদের উপর পারস্য বিজয় লাভ করল, তখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে সংবাদ দিলেন, কিছু বছর পরে রোমানরা আবার পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আলিফ-লাম-মীম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।} [সূরা রূমঃ ১-৭]

৫. আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে বলেছেন সে সব ঘটনা সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে।



কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যালোচনা

আমি কোন পূর্ব চিন্তা ছাড়াই কোরআন অধ্যয়ন করেছি পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে কোরানের সংগতির পরিমাণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। আমি তখন দেখতে পেলাম, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কোরানের প্রতিটি ভাষ্য সমালোচনার উর্ধে।

মরিস বুকাইলী

ফরাসি বিজ্ঞানী ও ডাক্তার



নিন্দেহে ইহা আল্লাহর কালাম

আমি এক মুহুর্ত ও মুহাম্মদের রেসালাতের ব্যাপারে সন্দেহ করি না। আমি বিশ্বাস করি, তিনি শেষ নবী, সব মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর রেসালাত এসেছে তাওরাত ও ইনজিলে অবতীর্ণ অহির সম্পূরক হিসেবে। এর উত্তম প্রমান হল, এ অলৌকিক কোরআন। আমি ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় বিজ্ঞানী পাসকালের সব চিন্তা পরিহার করি শুধু একটি কথা ছাড়া, তা হল, কোরআন মুহাম্মদ কর্তৃক রচিত নয় যেমন ইঞ্জিল ম্যাথিউ কর্তৃক রচিত নয়।

ভেনজা মোন্টাই

ফরাসি চিন্তাবিদ ও পর্যটক

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের আবির্ভাবের পূর্বেই সমস্ত আম্বিয়া কিরামগন নিকট যুগে যুগে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। তাঁর আবির্ভাবের উৎস ও দেশের বর্ণনা , বিভিন্ন জাতি এবং রাজা বাদশাহরা যে তাঁর ও তাঁর উম্মতের

৬. বশ্যতা স্বীকার করবে ,এসবের বর্ননা তাঁরা দিয়েছেন।তাঁর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কথা ও উল্লেখ করেছেন।

৭. তিনি সর্বশেষ নবী। তিনি যদি আবির্ভাব না হতেন তবে সমস্ত আম্বিয়া কিরাম যারা তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদের নবুওয়াত বাতিল হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়তো।

৮. তাওরাত ও ইঞ্জিলের নিরপেক্ষ পন্ডিতেরা তাঁর নবুয়াতের সত্যতা ও দলিল প্রমাণ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমনঃ বোহাইরা পাদ্রী, ওয়ারাকা বিন নাওফেল, সালমান ফারেসী, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও যায়েদ ইবনে সা'নাহ।

৯. যেসব জাতির সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে তাদের উপর বিজয় লাভ হচ্ছে তাঁর নবুয়াতের অন্যতম নিদর্শন। কেননা এটা অসম্ভব যে,কেউ আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত বলে মিথ্যা দাবী করার পর আল্লাহ তাঁকে বিজয়, ক্ষমতায়ন, শত্রুর পরাজয়, দাওয়াতের প্রসার, অনুসারী বৃদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করবেন। কেননা এসব শুধু মাত্র সত্য নবীদের বেলায়ই বাস্তবায়িত হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের আচার আচারণ, সততা, প্রশংসিত জীবন চরিত, শরিয়ত, উত্তম আখলাক ইত্যাদি তাঁর নবুয়াতের প্রমাণ। আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে তিনি উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা লাভ করেছেন। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।}
[সূরা কৃলমঃ ৪]

কেননা এসব গুনাবলী একজন সত্য নবী ছাড়া অন্য কারো মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা।

১০. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত ও মু'যিজা সম্পর্কে যে সব বর্ণনা এসেছে তা তাওয়াতুর বা বহু লোকের পরম্পরা বর্ণনা পদ্ধতিতে এসেছে, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি অন্যান্য নবী রাসুলদের অবস্থা ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে একটু চিন্তা গবেষণা করবে সে নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যেসব পদ্ধতিতে তাদের নবুয়াত সাব্যস্ত করা হয়, সে সব পদ্ধতিতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত সাব্যস্ত করা যায়, বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। যখন কেউ চিন্তা করবে যে, কিভাবে মূসা ও ঈসা [আঃ] এর নবুয়াত বর্ণিত হয়েছে তখন জানবে যে বহু লোকের পরম্পরা বর্ণনার ভিত্তিতে তা প্রমাণিত হয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নবুয়াত যে বহু লোকের পরম্পরার ভিত্তিতে প্রমাণিত তা আরো বেশি মজবুত ও দৃঢ়। কেননা তাঁর মুজিযা অনেক, বরং তাঁর সবচেয়ে বড় মুজিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন, যা অসংখ্য লোকের পরম্পরার ভিত্তিতে মুখে তিলাওয়াত ও লিখিতভাবে যুগ যুগ ধরে বর্ণিত হয়ে আসছে।

১১. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের নিরক্ষরতা তাঁর নবুয়াতের আরেকটি প্রমাণ। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যিনি লেখা পড়া জানতেন না। তাঁর নিরক্ষরতাই কোরআনে কারীম আল্লাহ তায়া'লার তরফ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বিশেষ করে তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] স্বীয় জাতির মাঝে অনেক বছর বসবাস করেছেন, যদি তিনি লেখা পড়া জানতেন তবে কাফেরেরা বলত যে, এ সব কিছু তাঁর নিজের আবিষ্কার ও চিন্তা ভাবনা থেকে নেয়া। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদের কে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও [মক্কাবাসীদেরও] কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।}
[সূরা আনকাবুতঃ ৪৭-৪৮]



আল্লাহর সৃষ্টি

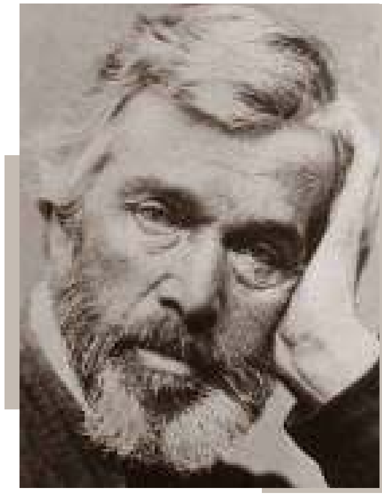
যখন প্রাচীন ডায়ক্লেশন সম্রাজ্যের অধিভুক্ত দেশসমূহ অবনতির তলানিতে এসে ঠেকেছিল সে সময় হঠাত আরব মরুতে জেগে উঠল এক প্রতি পক্ষ। তা ঐ কুঁজো বৃদ্ধ সম্রাজ্যকে দাবড়ে বেড়াল। একই ভাবে তা পাশ্চাত্যের নতুন সম্রাজ্যেরও ছিল চরম প্রতিপক্ষ। চোখের সামনে এই প্রতিপক্ষের বড়ত্ব বাড়তে লাগল। যেন আল্লাহর স্থায়ী যত্ন তার নিষ্ঠাবান বাহিনীকে জিহাদ ও স্পষ্ট বিজয়ের দিকে টেনে নিয়ে যেত। এমনকি সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের কিছু পরে সাসানিকদের রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ল। কনস্টান্টটাইনের মিত্ররাও সে পরিনামের হুমকির মুখে পরল।

আলডো মিলা

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

কোরআন যে তাঁর পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ তায়া'লার নিকট থেকে অবতীর্ণ সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লা আরো তাগিদ দিয়ে বলেনঃ {তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।} [সূরা জুম'আঃ ২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মী বা নিরক্ষর গুনে গুণান্বিত করে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন যে, তিনি অন্যান্য নিরক্ষর লোকদের মাঝে তাঁর আয়াত অর্থাৎ আল্লাহর অহী পড়ে শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেন, যেমনিভাবে অন্যান্য নবী রাসুলগণ তাদের জাতিকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছেন যা অন্যান্য রাসুলগণ তাদের জাতিকে শিখিয়েছেন। এ সব গুনাবলী রাসুলের মু'জিযা, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্বেও অন্যান্য নবী রাসুলগণ তাদের জাতির জন্য যে সব উপকারী জিনিস নিয়ে এসেছেন সে সব উপকারী জিনিস এই নিরক্ষর একজন নবীও নিয়ে এসেছেন, তাদের থেকে কোন অংশে কম আনেননি, ফলে তাঁর [সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের] নিরক্ষরতা তাঁর জন্য মু'জিযা, অন্যান্য নবীরা যেমনঃ মূসা [আঃ] লেখাপড়া জেনেও যা কিছু এনেছেন, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্বেও তাঁর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে এসেছেন।



নববী আখলাক

আমি মুহাম্মদ [সঃ] কে অবশ্যই ভালবাসি তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা ও কপটতা মুক্ত স্বভাবের জন্য। এই মরু সন্তান ছিল মুক্তমনা। তিনি শুধু নিজের উপর নির্ভর করতেন। নিজের যত খানি আছে তাই দাবি করতেন। তিনি অহংকারি ছিলেন না, তবে নিচুও ছিলেন না। তিনি তাঁর শীর্ণ বসনে ছিলেন যেমন আল্লাহ তাকে রেখেছেন, যেমন আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন। রোম পারস্যের রাজাদেরকে তিনি নিজের মুক্ত ও স্পষ্ট ভাষায় দাওয়াত দিতেন। তাদেরকে তিনি ইহজগৎ ও পর জগতের দিশা দিতেন। তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাশীল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজকের দিনের কাজ কালকের জন্য রেখে দিতেন না।

টমাস কার্লাইল

স্কটিশ লেখক ও ইতিহাসবিদ



সর্বশেষ নবুয়াতঃ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বকালে ও যুগে পৃথিবীর সব মানুষের নিকট প্রেরণ করা আল্লাহ তায়া'লার এক মহা হিকমত ও প্রজ্ঞা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি;কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।} [সূরা সাবাঃ ২৮]

তাঁর রিসালাতকে সব ধরণের পরিবর্তন ও রূপান্তর থেকে মুক্ত রেখেছেন, যাতে তাঁর রিসালাত মানুষের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে অবশিষ্ট থাকে। ইহা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সব ধরণের দোষত্রুটি থেকে পবিত্র, এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রিসালাতকে সব রিসালাতের শেষ রিসালাত করেছেন। এ জন্য তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী হিসেবে নির্বাচন করেছেন, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। কেননা আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রিসালাতের দ্বারা সব রিসালাতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা শরিয়তের বিধিবিধান পূর্ণ করেছেন,



ধর্ম এক

সব নবীদের ধর্ম এক। আদম [আঃ] থেকে মুহাম্মদ [সঃ] পর্যন্ত তারা অভিন্ন মতের ধারক। তিনটি আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে। সেগুলো হল, জাবুর, তাওরাত ও কোরআন। তাওরাতের সাথে কোরানের সম্পর্ক হল, জাবুরের সাথে তাওরাতের সম্পর্কের মত। ঈসা [আঃ] এর সাথে মুহাম্মদে [সঃ] এর সম্পর্ক হল, মূসা [আঃ] এর সাথে ঈসা [আঃ] এর সম্পর্কের মত। তবে যা জেনে রাখা দরকার তা হল, কোরআন মানুষের কল্যানে আসমান থেকে অবতীর্ণ সর্ব শেষ কিতাব। আর এর বাহক হলেন শেষ নবী। তাই কোরানের পর আর কোন কিতাব নেই এবং মুহাম্মদ [সঃ] এর পর আর কোন নবী নেই।

হ্যানরী ডি ক্যাস্টারী

ফরাসি সাবেক সেনা অফিসার



সর্বশেষ আসমানী কিতাব

এক সময় তাওরাত ছিল মানুষের দিশারী ও তাঁর পথ চলার মূল। তবে যখন যীশু আবির্ভুত হলেন তখন খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের নিয়ম নীতি আনুসরণ করতে শুরু করে। এর পর কোরআন উভয়ের স্থানে স্থিত হল। তবে কোরআন ছিল সে দুটির তুলনায় অধিক ব্যপক ও বিস্তর। একই ভাবে ওই দুটি কিতাবে যে পরির্তন অনুপ্রবেশ করেছে কোরআন তা পরিশুদ্ধ করে দিয়েছে। কোরআন সব কিছু সন্নিবেশ করেছে। সব আইন কানুনের সমাবেশ করেছে। কারণ, তা হল শেষ আসমানি কিতাব।

ওয়াশিংটন এরফেঞ্জ

মার্কিন প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

তাঁর দ্বারা রিসালাতের কাঠামো পূর্ণ করেছেন।

এজন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তা পূর্ববর্তী সব কিতাবের রক্ষাকারী, কর্তৃত্বকারী ও রহিতকারী। এমনিভাবে তাঁর আনিত শরিয়ত পূর্ববর্তী সব শরিয়তের রহিতকারী। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রিসালাতের হিফাযতের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। ফলে তাঁর রিসালাত অসংখ্য মানুষের পরম্পরা বর্ণনার ভিত্তিতে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। কেননা কোরআন লিখিত ও পঠিত উভয় সুরতেই অসংখ্য মানুষের পরম্পরা বর্ণনায় বর্ণিত হয়ে আসছে। এমনিভাবে এ ধর্মের শরিয়ত, ইবাদত, আখলাক, বিভিন্ন বিধান প্রভৃতি ব্যবহারিকভাবে অসংখ্য মানুষের পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে।

যে কেউ রাসুলের সিরাত ও সুন্নত নিয়ে চিন্তা করলে জানতে পারবে যে, তাঁর সাহাবারা মানব জাতির জন্য রাসুলের সব অবস্থা, বাণী ও কাজ সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহর জন্য তাঁর ইবাদত, জিকির, ইস্তিগফার, তাঁর জিহাদ, বদান্যতা, বীরত্ব, সাহাবাদের ও ভিন দেশীদের সাথে তাঁর আচার আচারণ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে তারা তাঁর আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, সফর ও স্থায়ী বসবাসের অবস্থা, তাঁর খাওয়া দাওয়া, পানাহার, পোশাক পরিচ্ছেদ, ঘুম ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁর সব ধরণের কাজ ও অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

এসব কিছু যখন কেউ একটু চিন্তা ভাবনা করবে তখন সে বুঝতে পারবে যে, এ ধর্ম আল্লাহ তায়া'লা কর্তৃক সংরক্ষিত।

আর তখন সে জানতে পারবে যে, তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম] সর্বশেষ নবী ও রাসুল। কেননা আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। } [সূরা আহযাবঃ ৪০]



মানবজাতির শিক্ষক

রসুলে আরাবীর সীরাত তাঁর অনুসারীদের বুদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাদের নিকট সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে। তাই তারা তাঁর রেসালাতের উপর এমন ঈমান এনেছে যার ফলে তারা তাঁর উপর অবতীর্ণ সকল ওহীকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনিভাবে হাদিছ অনুযায়ী তাঁর সব কাজও আইনের উৎসে পরিণত হয়েছে। এ আইন শুধু মুসলিম সমাজের জীবন বিধানের মাঝেই সীমিত নয়, বরং এতে আছে মুসলিম বিজেতাদের সাথে অমুসলিম প্রজাদের আচার আচরনের বিধান।

আর্নল্ড টয়েনবী

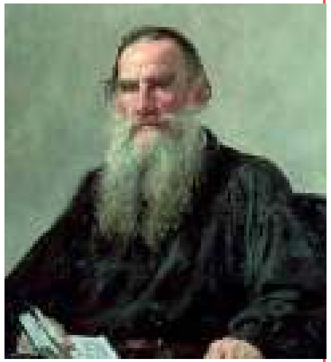
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

সর্বশেষ নবী

নবী মুহাম্মদ [সঃ] প্রতি অভিভূতদের একজন আমি; এক আল্লাহ যাকে নির্বাচিত করেছেন তাঁর হাতেই রেসালাতের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য এবং তিনি শেষ নবী হওয়ার জন্য।

টলস্তোয়

রাশিয়ান সাহিত্যিক





আল্লাহর ইবাদত কর

আল্লাহ তায়ালা যে নবী রাসুলদেরকে পাঠিয়েছিলেন মানুষকে আল্লাহর এবাদতের দিকে ডাকার জন্য মুহাম্মদ [সঃ] ছিলেন তাদের মধ্যে সর্ব শেষ ও সর্ব মহান।

ওয়াশিংটন এরফেঞ্জ

মার্কিন প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ





বিশ্ববাসীর জন্য রহমত

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বের নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। বরং যারা তাঁর উপর ঈমান আনেনি তিনি তাদের জন্যও রাসুলকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। রাসুলের সারা জীবনের নানা ঘটনা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে এ রহমত স্পষ্ট হয়। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলোঃ তিনি যখন মক্কায় স্বজাতিকে -তাদের উপর রহমত করে- দাওয়াত দিলেন, তারা তাঁকে মিথ্যারোপ করেছিল, মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে, এমনকি তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে রক্ষা করেন, তিনি তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি,আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।} [সূরা আনফালঃ ৩০]

এতকিছুর পরেও তাদের প্রতি রাসুলের রহমত দিনে দিনে বেড়েই চলল, তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে তিনি খুবই আশাবাদী ছিলেন। আল্লাহ তায়া'লা এ সম্পর্কে বলেনঃ {তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল,দয়াময়।} [সূরা তাওবাঃ ১২৮]

ইসলামের বিশ্বজনীনতা

কোরানের যে আয়াতটি ইসলামের বিশ্বজনীনতার দিকে ইশারা করে, এই বলে যে, এই দীনকে তার সে নবীর উপর নাজিল করেছেন যিনি "সমগ্র জগত বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ", সে আয়াতটি সমগ্র জগতের জন্য সরাসরি আহ্বান। এটা উজ্জল প্রমান যে, রাসুল নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তার রেসালাত আরব জাতীর সীমানা পার হবে, এবং তার উচিৎ, ভিন্ন ভিন্ন জাতীর কাছে বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে এই নতুন বাণী পৌঁছে দেয়া

লোরা ভিশিয়া ভাগলিরী

ইতালিয়ান প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



অতঃপর তিনি যখন মক্কা বিজয়ের দিনে তাদের উপর বিজয় লাভ করলেন, তখন তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহ তায়া'লা যখন তাঁর সাহায্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দু'পাহাড়ের মাঝে চেপে নিঃশেষ করে দেয়ার কথা বললেন, তখন তিনি এ আশায় ধৈর্য ধারণ করলেন যে, হয়ত আল্লাহ তায়া'লা তাদের বংশধরের থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ তায়া'লার ইবাদত করবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।}
[সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]



তিনি সমস্ত মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ, বিভিন্ন রঙ, ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, আক্বিদা ও স্থানের ভেদাভেদের উর্ধ্বে তিনি সকলের জন্যই রহমত।

তাঁর রহমত শুধু মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশুপাখি ও জড়পদার্থের জন্যও তিনি ছিলেন রহমত স্বরূপ। এক আনসারী সাহাবী তার উটকে শাস্তি দিচ্ছিল, উটটি ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পাচ্ছিল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অবস্থা দেখে দয়াশীল হলেন, উটের মালিককে তার প্রতি সদয় হতে বললেন, তার সাধ্যের বাহিরে তাকে বহন করাতে নিষেধ করলেন। একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, এক লোক কবুতরের বাচ্চা নিয়ে এসেছে, এতে তিনি কবুতরের উপর দয়াশীল হলেন, তাঁর হৃদয় নরম হল, তিনি বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে বললেন। তিনি বলেছেনঃ "যখন তোমরা পশু পাখি জবাই করবে, তখন তাদের প্রতি সদয় হয়ে জবাই কর"। [মুসলিম শরীফ] এমনকি তার রহমত জড়পদার্থকেও শামিল করেছে। যখন তার মিম্বারের কাঠ খন্ডটি তাঁর থেকে আলাদা করার কারণে কান্না শুরু করল, তখন তিনি সেটির কাছে গেলেন, সেটাকে জড়িয়ে ধরলেন, ফলে সেটা শান্ত হল।

তাঁর রহমত শুধু বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং ইহা ছিল আদেশ, শরিয়ত, পদ্ধতি ও আখলাক, যা তিনি মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মানুষের প্রতি রহমত, দয়া ও নম্রতার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেছেনঃ "হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দায়িত্বশীল হয় এবং তাদের সাথে কঠোরতা করে তুমিও তার প্রতি নির্দয় ও কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের শাসক হয় এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করে, তুমিও তার সাথে সদয় ব্যবহার কর"। [মুসলিম শরীফ]। অতঃএব রহমত হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান চরিত্র। ইসলাম ধর্মের মৌলিক ভিত্তি হলো রহমত ও শান্তি।

সকলের জন্য রহমত স্বরূপ

মুহাম্মদের ঐতিহাসিক জীবনকে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে বর্ণনা করেছেন এর চেয়ে সুন্দর ভাবে আর বর্ণনা করা সম্ভব না। তিনি বলেছেন, "আপনাকে তো আমি শুধু জগতবাসির রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" এ মহান এতীম নিজেই প্রমান করেছেন, তিনি সব দুর্বলের এবং সব সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষীর জন্য সর্বমহান রহমত। সব এতীম , মুসাফির, অসহায়, দরিদ্র, ও মেহনতি মানুষের জন্য প্রকৃত রহমত।

জন লিক

স্প্যানিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন মানব জাতির সৌভাগ্য





মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়নকারী

নবী মুহাম্মদ [সঃ]অসম্ভব দ্রুত ভাবে মানুষকে সুখের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। মুহাম্মদের [সঃ] এর আগে মানুষের অবস্থা ও তাদের গোমরাহীর দিকে কেউ তীক্ষ্ণ ভাবে দৃষ্টি দিলে এবং তাঁর পরের অবস্থা ও তাঁর যুগে তাদের বিপুল উন্নতির দিকে তাকালে এ দুইয়ের মাঝে আকাশ পাতাল তফাত দেখতে পাবে।

কুইলিয়াম
ইংরেজ চিন্তাবিদ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্ত হয়ে আগমন করলেন, ফলে আল্লাহ তায়া'লা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের বরকতে মানব জাতিকে হিদায়েত দান করলেন। যেহেতু তিনি এসেছেন স্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়েত নিয়ে, এমন হিদায়েত যার স্পষ্টতা বর্ণনাতীত ও জ্ঞানীর জ্ঞানের উর্ধ্বে। তিনি মানব জাতির জন্য উপকারী জ্ঞান, সৎকর্ম, মহান চরিত্র, সরল সহজ রীতি নীতি নিয়ে এসেছেন। সমস্ত মানব জাতির সকল জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, কর্ম একত্রিত করলেও তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তা অনেক গুন বেশি হবে। অতএব সমস্ত প্রংশসা মহান আল্লাহ তায়া'লার, তিনি যেভাবে প্রশংসা পেতে ভালবাসেন ও যেভাবে প্রশংসা করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

আক্বীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বলা যায়ঃ তখন মানব জাতি আল্লাহর সাথে শিরক করত, তিনি ছাড়া অন্যান্য ইলাহদের ইবাদত করত, এমনকি আসমানী কিতাবের অধিকারী অনেক আহলে কিতাবরাও শিরক করতে লাগল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একনিষ্ঠ তাওহীদ, এক আল্লাহর ইবাদত নিয়ে আগমন করলেন, যার কোন শরিক নেই। তিনি মানব জাতিকে মানবের গোলামী থেকে মুক্ত করে মানুষের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে নিয়ে আসেন। তিনি তাদের অন্তরকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার কলুষতা থেকে মুক্ত করেন। তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য নবী রাসুলগণ যা নিয়ে এসেছিলেন তিনিও তা নিয়ে প্রেরিত হলেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে,আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।}[সূরা আম্বিয়াঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ{আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।}[সূরা বাক্বারাঃ ১৬৩]

সামাজিক দিক থেকেঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময় প্রেরিত হন যখন মানব জাতি জুলুম, অত্যাচারে নিষ্পেষিত ছিল। তারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, ফলে তারা একে অন্যের উপর জুলুম ও নির্যাতন করত। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব অনারব, সাদা কালো সব ধরণের ভেদাভেদ মুক্ত করে সমগ্র মানব জাতির মাঝে সমতা আনলেন। তাকওয়া ও সৎকর্ম ব্যতীত কারো উপর কারো কোন মর্যাদা নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।}[সূরা হুজরাতঃ ১৩]

তিনি ন্যায় বিচার, সদাচার ও সামাজিক দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদির আদেশ দিলেন। জুলুম, অন্যায়, সীমালংঘন ইত্যাদি নিষেধ করলেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।}[সূরা নাহলঃ ৯০]

বরং তিনি মানুষের সব অধিকার সংরক্ষণ করেছেন, এমনকি আভ্যন্তরীণ সম্মানবোধও, তাই তিনি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ



সব মানুষের ধর্ম

১- আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হল ইসলাম। [আল ইমরান, ১৯]
২- আপনাকে আমি সব মানুষের জন্যই প্রেরণ করেছি, সুসংবাদ দাতা সতর্ককারী রূপে। [সাবা, ২৮]
এ দুটি আয়াত আমার মনে ব্যপক প্রভাব ফেলেছে। কারণ, এগুলোতে আছে ইসলামের বিশ্বজনীনতার প্রমাণ। আর শরয়ী জীবন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ ও হযরত ঈসা [আঃ] এর পূর্ণ বিবরণ তো আছেই। সব নবী রাসুলের ধর্মকে সম্মান করার যে মুক্ত শিক্ষা এতে আছে, এর চেয়ে শক্ত ও সত্য শিক্ষা আর কি আছে! নিঃসন্দেহে ইসলাম হল, ন্যায় সত্য ও যুক্তির ধর্ম।

ওয়াজনর
ডাচ গবেষক

{মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।} [সূরা হুজরাতঃ ১১]

চারিত্রিক দিক থেকে বললেঃ আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন যখন মানব জাতি চারিত্রিক অধঃপতনে নিমজ্জিত ছিল। আদব, আখলাক, মানবতা ও শিষ্টাচার বলতে কিছুই ছিলনা। এমতাবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে উত্তম চরিত্র ও উন্নত শিষ্টাচারের দিকে ফিরিয়ে আনতে আগমন করেন। যাতে সম্মানজনক আচার আচরণ ও লেনদেনে তাদের জীবন সুখী হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণ করতে আগমন করেছি"। [বায়হাকী] বরং আল্লাহ তায়া'লা তাঁর চরিত্রকে মহান চরিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [সূরা কলমঃ ৪]

তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] চরিত্র ও শিষ্টাচারে উত্তম উপমা ছিলেন। খোদাভীতি, পরহেজগারী, উত্তম লেনদেন, ভাল ব্যবহার ও সুন্দর কথাবার্তায় মহান উপমা ছিলেন। বরং সব সুন্দর জিনিসের ক্ষেত্রে তিনি উত্তম নমুনা ছিলেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে,তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।} [সূরা আহযাবঃ ২১]



বিদায় হজ্জের শিক্ষা

মুহাম্মদ [সঃ] তাঁর ওফাতের এক বছর আগে বিদায়ী হজ্জ পালন করেছে। তখন তাঁর জাতীর সামনে মহা উপদেশ পেশ করেন। এর প্রথম অংশেই মিটিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক লুটতরাজ রক্তের প্রতিশোধ আর শেষ প্যারাতে কৃষ্ণাংগ মুমিনকে খলিফা হয়ার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ উপদেশ জগতে ইনসাফপূর্ণ সুন্দর আচরণের মহান রীতির প্রচলন করেছে।

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস

আর নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে বললে, ইসলাম পূর্বে নারীরা ছিল সবচেয়ে উপেক্ষিত ও তিক্ততর জিনিস। আল্লাহ তায়া'লা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন, যখন নারীরা ছিল লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাদের কোন অধিকার ছিলনা। তারা কি মানুষ না অন্য কিছু এ ব্যাপারে তখন মানুষ মতানৈক্য করত। তাদের কি বেঁচে থাকার অধিকার আছে নাকি তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং শিশু কালেই তাদেরকে জীবিত দাফন করা হবে? এ ব্যাপারে তারা মতপার্থক্য করত। তাদের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।} [সূরা নাহলঃ ৫৮-৫৯]

তারা ছিল শুধুমাত্র খেলনা ও আনন্দ উপভোগের পাত্র, বেচাকেনাযোগ্য পুতুল স্বরূপ এবং আপমানিত সৃষ্টি।

তখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবীকে নারী জাতির সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা রুমঃ ২১]

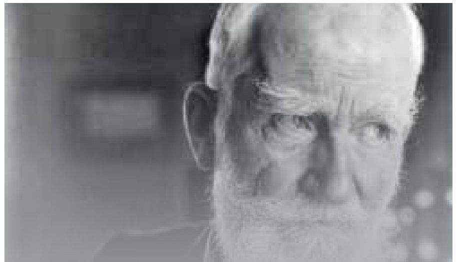


আল্লাহর নবী মুহাম্মদের চরিত্র

মহৎ স্বভাব, ভদ্র চরিত্র, পরম লাজুকতা, প্রখর অনুভূতিশীলতা এসব যতটুকু মহানতর হতে পারে ততটুকু ছিল মুহাম্মদ [সঃ] এর। মুহাম্মদ [সঃ] এর আরও ছিল বিস্ময়কর বোধ শক্তি, সীমাহীন মেধা, ও তীক্ষ্ণ মহৎ মমতা বোধ। তিনি ছিলেন মহান চরিত্র ও সন্তোষ জনক স্বভাবের অধিকারী।

আব্দুল্লাহ কুইলিয়াম

ইংরেজ চিন্তাবিদ



জগতের পথ

ইসলামের রাসুলের জীবনী আমি বার বার ভাল করে অধ্যয়ন করেছি। তাতে আমি নৈতিকতা যেমন হওয়া দরকার তেমনই দেখতে পেলাম। আমি কত আকাঙ্ক্ষা করেছি, ইসলামই হোক জগতের পথ!

বার্নার্ড শ
ইংরেজ লেখক



নারীর মর্যাদা

ইসলাম আরবে নারীর মর্যাদা উন্নীত করেছে। জীবন্ত কন্যা সমাহিত করার প্রথা রহিত করেছে। বিচার ও আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে সমতা বিধান করেছে। যে কোন বৈধ পেশা গ্রহন, নিজের অর্থ সম্পদ নিজেই সংরক্ষণ, উত্তারাধিকারী সম্পত্তি অর্জন, নিজের ইচ্ছা মত সম্পদ ব্যয় এসবের অধিকার দিয়েছে তাকে। জাহেলী যুগের বিভিন্ন কুপ্রথা যেমনঃ পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে তার স্ত্রীর মালিক হওয়া, নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া এবং তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া ইত্যাদিকে ইসলাম রহিত করেছে।

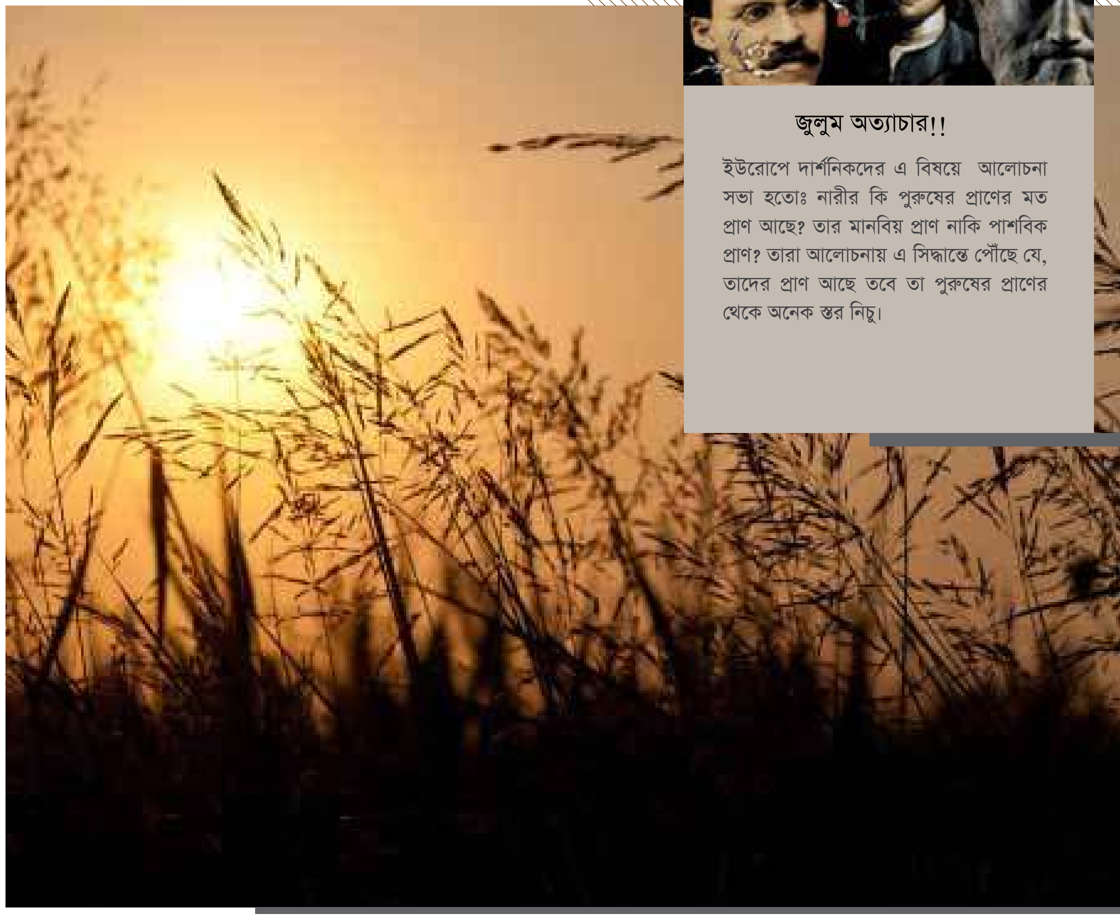
উইলিয়াম ডুরান্ট
মার্কিন লেখক

বরং তিনি মা হিসেবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর।} [সূরা বনী ইসরাইলঃ ২৩]

তিনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে পুরুষের সাথে সদ্ব্যবহারের চেয়ে অগ্রাধিকার দেন। "এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার সদ্ব্যবহার পেতে কে অধিক হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপরে কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপরে কে? তিনি আবার বললেনঃ তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপরে কে? তিনি বললেনঃ তোমার বাবা"। [বুখারী শরিফ]।

কন্যা হিসেবে তাদেরকে সম্মান দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]বলেছেনঃ "যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে, তাদেরকে লালন পালন করেছে, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে, তাদের ব্যয়ভার বহন করেছে, তাদের উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। একজন বললঃ হে আল্লাহর রাসুল, যদি দুইজন থাকে? তিনি বললেনঃ যদি দুইজনও থাকে"। [মুসনাদে আহমদ]।

স্ত্রী হিসেবে তাদেরকে সম্মান করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি তাদের সম্মান করাকে উত্তম হওয়ার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মাঝে আমার স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি"। [ইবনে মাজাহ]





জুলুম অত্যাচার!!

ইউরোপে দার্শনিকদের এ বিষয়ে আলোচনা সভা হতোঃ নারীর কি পুরুষের প্রাণের মত প্রাণ আছে? তার মানবিয় প্রাণ নাকি পাশবিক প্রাণ? তারা আলোচনায় এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, তাদের প্রাণ আছে তবে তা পুরুষের প্রাণের থেকে অনেক স্তর নিচু।



চিরন্তন রিসালা কোনটি?

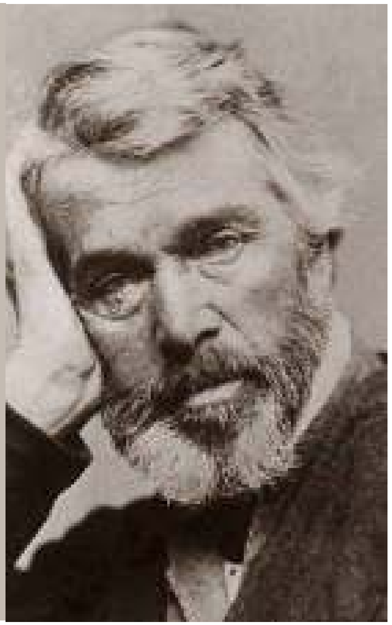
প্রত্যেক ধর্মের নাম সে ধর্মের নির্ধারিত প্রতিষ্ঠাকারী, বা সে ধর্মের অনুসারীদের নাম থেকে নামকরণ করা হয়। যেমনঃ যারাদাশতের নামানুসারে তার ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে যারাদাশতিয়া। গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে বৌদ্ধ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। ইহুদী ধর্ম যেহেতু ইয়াহুজা সম্প্রদায়ের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাই তাদের ধর্মে ইহুদী ধর্ম বলা হয়। আর খৃষ্টান ধর্ম যিশু খৃষ্টের থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এ ধরণের কোন কিছু থেকে নেয়া হয়নি।

তাই ইসলাম ধর্ম কোন নির্দীষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। বরং যারাই আল্লাহর অনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করবে, তাঁর একত্ববাদে মাথানত করবে, সে নিজেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী হবে। যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরর অনুসরণ করবে, তিনি যে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন সে ধর্মের আনুগত্য করবে, তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁর অনুসরণ করবে সেই প্রকৃত মুসলিম। সে যে কালে বা স্থানেই হোক না কেন, যে রঙ বা জাতির হোক না কেন।

আল্লাহর কোন শরিক নেই

এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি সত্য ,তিনি ব্যাতীত আর সব ভ্রান্ত। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং রিজিক দিচ্ছেন। ইসলাম হল, সব আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা। তার অনুগত্য করা। তার কাছে প্রশান্তি খোঁজা। তার উপর ভরসা করা। পূর্ণ শক্তি হলো তার বিধানের উপর অবিচল থাকা, দুনিয়া ও আখেরাতে যাই হোক, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন বিপদ আসুক _ হোক তা মৃত্যু_ সব সানন্দে নিঃসংকোচে ও সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করা, এ বিশ্বাস করা যে, এটাই কল্যাণ, তা ছাড়া আর কোন কল্যাণ নাই। আর বোকামী হল, মানুষ নিজের দুর্বল বুদ্ধিকে জগত ও চারপাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করা। বরং তার উচিৎ এ বিশ্বাস করা যে, জগতের একটি ন্যাইয়ানুগ আইন আছে, যদিও তার বুঝে না আসুক এবং কল্যাণ হল জগতের মূল। আর সততা হলো অস্তিত্বের প্রাণ। তার উচিৎ স্থিরতা ও তাকওয়ার সাথে এ সবে ও বিশ্বাস করা ও এর অনুসরন করা।

টমাস কার্লাইল
স্কটিশ লেখক ও ইতিহাসবিদ

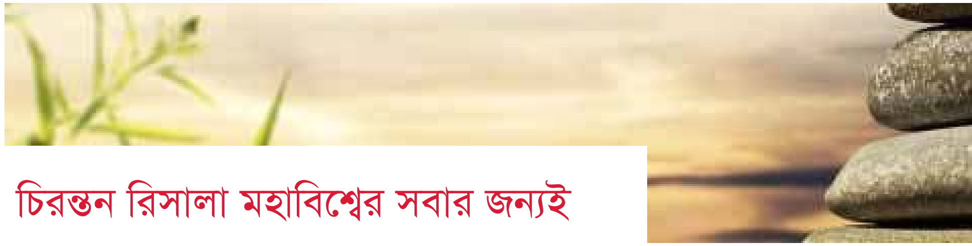


আরব ও অনারবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই

মুসলিমরা যে যেই জাতিভুক্ত হোকনা কেন তারা একে অপরের দৃষ্টিতে কেউ কারো পর নয়। অধিকারের ক্ষেত্রে দারুল ইসলামে চীনা মুসলিম ও আরব মুসলিমের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। এভাবে ইসলামী অধিকার ইউরোপীয় অধিকার থেকে মৌলিক ভাবে ভিন্ন।

গোস্তাভ লে ভোন
ফরাসি ইতিহাসবিদ



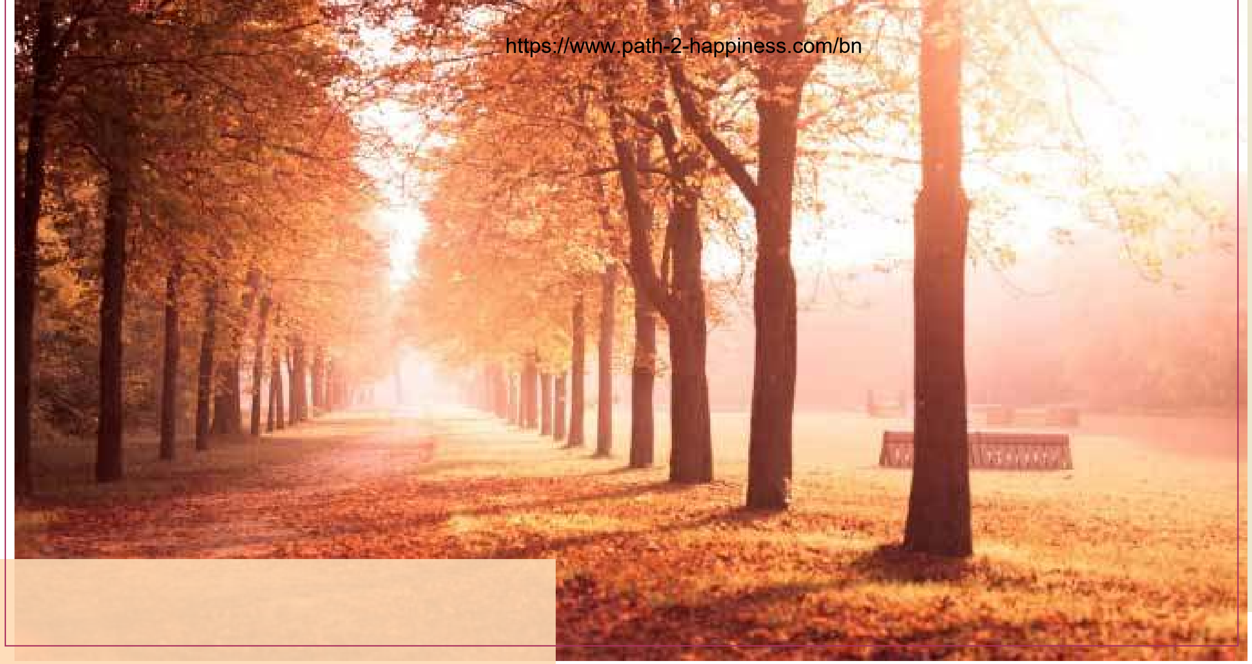


চিরন্তন রিসালা মহাবিশ্বের সবার জন্যই

ইসলাম এমন এক ধর্ম যার উপর এ পৃথিবীর সকলেই চলে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।}[সূরা আলে ইমরানঃ ৮৩]

একথা সকলেরই অবগত যে, এ পৃথিবীর সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন, স্থায়ী রীতি নীতির উপর পরিচালিত। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ জমিন সব কিছুই একটা সাধারণ নিয়মের উপর পরিচালিত। নিয়মের বাইরে সামান্য পরিমান নড়াচড়া, বা এক চুল পরিমানও বের হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি মানুষ যদি তার নিজের দিকে লক্ষ্য করে তবে সে বুঝতে পারবে যে, সে নিজেও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম কানুনের কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য-পানি, আলো বাসাত, উষ্ণতা সব কিছুই তার জীবনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাপে পরিচালিত হচ্ছে। এ নির্ধারিত নিয়মে তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালিত হয়। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তায়া'লার নির্ধারণ অনুযায়ী কাজ করে।

এ পূর্ণ পরিমাপ ও নির্ধারণ, যার কাছে পৃথিবীর সব কিছু আত্মসমর্পিত, আসমানের সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হতে জমিনের সবচেয়ে ছোট বালুকণা পর্যন্ত কোন কিছুই যার আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। এ সব কিছুই এক মহান ক্ষমতাবান মালিক, আল্লাহ তায়া'লার কর্তৃক নির্ধারিত। আসমান জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছুই যেহেতু তাঁর নির্ধারিত নিয়ম কানুনের দ্বারা পরিচালিত, এতে বুঝা যায় যে, ইসলামই হলো সারা পৃথিবীর সকলের জন্য মনোনীত ধর্ম



। কেননা ইসলামের অর্থ হলো কোন ধরণের আপত্তি ব্যতীত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর আদেশ মান্য করা ও নিষেধ থেকে দূরে থাকা। চন্দ্র-সূর্য, আসমান জমিন, বায়ু, পানি, আলো, অন্ধকার, উষ্ণতা, গাছ পালা ও পশুপাখি সব কিছুই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। }[সূরা জাসিয়াঃ ১৩]

বরং যে মানুষ তার প্রতিপালককে জানেনা, তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাঁর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যাণ করে, বা তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তাঁর সাথে শিরক করে, সে নিজেও তাকে যে স্বভাব প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে সে স্বভাব প্রকৃতিতে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মানুষের মাঝে দুটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

প্রথমটি হলোঃ স্বভাবজাত প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, নতিস্বীকার, তাঁর ইবাদতে করতে ভাললাগা, তাঁর নৈকট্য লাভ, সত্য, কল্যাণ ও সততা ইত্যাদি যা তিনি ভালবাসেন তা ভালবাসা, আর বাতিল, অকল্যাণ, জুলুম, অত্যাচার ইত্যাদি যা তিনি অপছন্দ করেন তা ঘৃণা করে। মানব স্বভাবের আরো দাবী হলো, সম্পদ, পরিবার, সন্তান প্রভৃতিতে ভালবাসা, খাওয়া দাওয়া, পানাহার, বিবাহতে আগ্রহ, আর এ সবের চাহিদা অনুযায়ী শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন।

দ্বিতীয়টি হলোঃ মানুষের ইচ্ছা ও পছন্দ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুল ও কিতাব নাযিল করেছেন যাতে মানুষ সত্য-মিথ্যা, হেদায়েত-ভ্রষ্টতা ও কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। তিনি তাদেরকে আকল বা জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন যাতে তারা সেচ্ছায় জেনে শুনে এ সব পছন্দ করতে পারে। সে যদি চায় কল্যাণের পথে চলবে তবে তার বিবেক তাকে সত্য ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করবে। আর যদি সে অকল্যাণের পথে চলতে চায় তবে তার বিবেক তাকে সে অকল্যাণ ও ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

{বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়। }[সূরা কাহফঃ ২৯]

মানুষেকে যদি প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, সে আত্মসমর্পণের দিকে সর্বদা ধাবিত, ইহা স্বভাবগতভাবেই পালনে বাধ্য, সে উহা থেকে আলাদা হতে পারেনা, তার অবস্থা অন্যান্য সৃষ্টির মতই।

আবার যদি তাকে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় তবে দেখা যাবে যে, সে স্বাধীন, যা ইচ্ছা তাই নিজের জন্য পছন্দ করতে পারে। সে ইচ্ছা করলে মুসলমান হতে পারে, আবার চাইলে সে কাফেরও হতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয় । }[সূরা দাহর, আয়াতঃ ৩]

এজন্যই মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখা যায়ঃ একদল মানুষ তার স্রষ্টাকে জানে, তাঁকে প্রতিপালক, মালিক, ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, তাদের স্বাধীন জীবনে তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করে, যেমনিভাবে সে স্বভাবসুলভভাবেই রবের প্রতি আত্মসমর্পণকারী, সে ইহা থেকে ভেগে যেতে পারেনা, সে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অনুসারী। এ হলো পূর্ণ মুসলিম, যার ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে, তার জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, কেননা সে তার প্রতিপালক ও স্রষ্টাকে জানতে পেরেছে, যিনি তাদের কাছে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে শিক্ষা দেয়া ও নেয়ার শক্তি দান করেছেন। তার জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তাধারা সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে, কেননা সে তার চিন্তাকে কাজে লাগিয়েছে। অতঃপর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবেনা, যে আল্লাহ পাক তাকে বুঝ ও চিন্তা শক্তি দান করে সম্মানিত করেছেন। তার জবান সত্য কথা বলেও সঠিক পথে চলে। কেননা সে এখন এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে স্বীকার করেনা, যিনি তাকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন, তার জীবনে

সত্য ছাড়া যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই। কেননা সে এমন এক শরিয়তের অনুসারী যার প্রত্যেকটি কাজে রয়েছে কল্যাণ। তার ও সমস্ত সৃষ্টিকূলের মাঝে পরিচিতি ও সহমর্মিতায় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কেননা সে মহাপ্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী আল্লাহ তায়া'লা ছাড়া কারো ইবাদত করেনা, সমস্ত সৃষ্টিকূল যার আদেশ মান্য করে, তাঁর নির্ধারিত নিয়মে তারা পরিচালিত হয়, আর তিনি এ সব সৃষ্টিকূল মানুষের জন্য অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।} [সূরা লোকমানঃ ২২]

এ দুয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য

কোরানের দৃষ্টিতে তাওহীদ ও আমি এক জন খৃষ্টান হিসাবে তৃত্ববাদে বিশ্বাস এ দুয়ের মাঝে বিচারের ক্ষেত্রে আমি নিরুপায় ছিলাম। এর পর দেখত পেলাম যে দ্বিতীয়টি ইসলামের নীতি থেকে অনেক নীচে। ঠিক সেখান থেকে আমি খৃষ্ট ধর্ম থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। তা এই ভিত্তিতে যে, যে কোন ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস। সুতরাং সঠিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে যদি আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস শুদ্ধ না হয় তাহলে এর অর্থ হল, অন্য সব কাজ কর্ম হবে অনর্থক ও বেফায়দা।

নাজিমো রামুনী
ঘানার মিশনারি







স্থায়ী রিসালা সমস্ত নবী রাসুলগণের ধর্মঃ

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা সমস্ত মানবজাতির জন্য তিনি নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।} [সূরা হাজ্বঃ ৩৪]

ইহা সমস্ত নবী রাসুলগণের ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।} [সূরা বাকারাঃ ১৩৬]

আল্লাহর সব রাসুলগণ এ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা তাদের ইসলাম ঘোষণা করেছেন। তাদের জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা নুহ [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি।} [সূরা ইউনুসঃ ৭১-৭২]

আল্লাহ তায়া'লা ইবরাহীম [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেনঃ অনুগত হও। সে বললঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।} [সূরা বাকারাঃ ১৩১]

বরং ইবরাহীম [আঃ] তার সন্তান সন্ততিদেরকে এ ধর্মে অনুসরণের জন্য অসিয়াত করে গেছেন। আল্লাহ তায়া'লা এ সম্পর্কে বলেনঃ {এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বললঃ আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য।} [সূরা বাকারাঃ ১৩২-১৩৩]

আল্লাহ তায়া'লা মূসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।} [সূরা ইউনুসঃ ৮৪]



আল্লাহ তায়া'লা ঈসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে,আমরা অনুগত্যশীল।} [সূরা মায়েদাঃ ১১১]

ইসলাম হলো মানব জাতির জন্য সর্বশেষ আসমানী রিসালাত যা আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সমস্ত মানবের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি ইহাকে পরিপূর্ণ করেছেন ও তাঁর বান্দাহরা এ ধর্মে চললে তিনি রাজি খুশী হবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।} [সূরা মায়েদাঃ ৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন যে, তিনি মানব জাতির জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত ও পছন্দ করেছেন। এর উপর চললে তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ তায়া'লা আরো ঘোষণা করেছেন যে, ইহাই একমাত্র সঠিক ধর্ম, ইহা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তিনি গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৯]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৮৫]

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা তাগিদ দিয়ে বলেছেন যে, ইসলামই তার নিকট একমাত্র ধর্ম। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তিনি গ্রহণ করবেন না। মৃত্যুর পরে একমাত্র মুসলমানরাই সুখী ও সফলকাম হবেন। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করেছে তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা জাহান্নামে শাস্তি পাবে। এজন্যই সমস্ত নবী রাসুলগণ আল্লাহর জন্য তাদের আত্মসমর্পণ ঘোষণা করেছেন। যারা আত্মসমর্পণ করেনি তাদের থেকে তারা ছিন্নতা ঘোষণা করেছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারাই মুক্তি ও সুখ শান্তি চায় তারা যেন ইসলামে প্রবেশ করে। তারা যেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে। তার অনুসরণের মাধ্যমেই তারা মূসা ও ঈসা [আঃ] এর প্রকৃত অনুসারী হবেন। কেননা মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ ও অন্যান্য সকল নবী রাসুলগণ মুসলমান ছিলেন। তারা সকলেই ইসলামের দিকে ডেকেছেন। কেননা ইসলামই আল্লাহ তায়া'লার একমাত্র ধর্ম যা নিয়ে তিনি তাদেরকে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে কিয়ামত পর্যন্ত কারো মুসলমান বলে দাবী করলে যথাযথ হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁকে অনুসরণকরবে এবং তিনি যে কোরআন নিয়ে এসেছেন সে কোরআন অনুযায়ী আমল করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সে স্বত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, এ উম্মতের যে কেউ, ইহুদী হোক বা নাসারা হোক, সে মৃত্যুবরণ করল অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে ঈমান আনলনা, তবে সে জাহান্নামী হবে"। [মুসলিম শরিফ]



ইসলাম সরল সহজ

ইসলামের মহা সহজতা এসেছে নিরেট তাওহীদ থেকে। এই সহজতার মাঝেই নিহিত ইসলামের শক্তির রহস্য। অন্যান্য ধর্মে যে জটিলতা, স্ববিরোধিতা ও দূর্বোধ্যতা দেখি, ইসলাম ও তার বুঝ সে সব থেকে মুক্ত এবং সহজ। ইসলামে ইলাহ একজন এবং আল্লাহর সামনে সব মানুষ সমান এমন নীতির চেয়ে স্পষ্ট আর আর কোন নীতি নেই।

গোস্তাভ লে ভোন
ফরাসি ইতিহাসবিদ







স্থায়ী রিসালাতের পরিপূর্ণতাঃ

ইসলাম ধর্ম, যা আল্লাহ তায়া'লা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন, ইহা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার একত্ববাদের ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি এবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর। বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে।} [সূরা আল মু'মিন, আয়াতঃ ৬৫-৬৬]

ইহা এক আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতের ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না।} [সূরা ইউসুফঃ ৩৯-৪০]

ইহা সুস্থ সঠিক বিবেকের ধর্ম, যা যদি প্রকৃত রূপ ও আসল গুনাবলীসহ কারো নিকট উপস্থাপন করা হয় তবে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।} [সূরা ইউসুফঃ ৪০]

ইহা স্পষ্ট দলিল, প্রমাণ ও অকাট্য ভিত্তির ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।} [সূরা নমলঃ ৬৪]

ইহা আরাম, সুখ-শান্তি ও আত্মপ্রশান্তির ধর্ম। {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে দ্বীন ইসলাম নিয়ে আল্লাহ তায়া'লা প্রেরণ করেছেন তা উপকারী সমস্ত ভাল জিনিসকে হালাল করেছে, আর ক্ষতিকর নোংরা জিনিসকে হারাম করেছে। সব সৎকর্মকে আদেশ দিয়েছে ও অন্যায় কর্মকে নিষেধ করেছে। ইহা সহজ সরল, উদারতার ধর্ম, এতে কোন জটিলতা ও কষ্টকর কিছু নেই। মানুষ যা করতে সক্ষম নয় তা

করতে বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।} [সূরা আ'রাফঃ ১৫৭]

ইহা পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে, সব স্থানে প্রযোজ্য। মানুষ তাদের দ্বীন ও দুনিয়ায় যা কিছু প্রয়োজনবোধ করে তার সব কিছুই এ ধর্ম নিয়ে এসেছে।

ইহা শান্তি ও সুখের পথ। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ। ন্যায় পরায়নতা ও ইনসাফের পথ। সম্মান ও স্বাধীনতার পথ। সমস্ত কল্যাণ ও ভাল কাজের পথ। এ ধর্ম কতই না মহান, কতই না পরিপূর্ণ!! যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।} [সূরা নিসাঃ ১২৫]

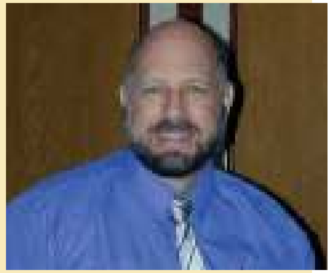
ইহা তোমার প্রতিপালকের আহবান, যিনি তোমার নিজের চেয়েও তোমার প্রতি বেশি দয়াবান, তিনি তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের হবার জন্য ডাকছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪]



আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব নয়

ইসলামের তাওহীদের বিধান আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তা ইসলামের সবচেয়ে উজ্জল বৈশিষ্ট। তাওহীদ আমাকে এক আল্লাহর বান্দায় পরিণত করে। আমি কোন মানুষের দাস নই। ইসলামে তাওহীদদ মানুষকে মুক্ত করে, তাকে কোন মানুষের অনুগত করে না। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব নয়।

ইব্রাহীম খলিল
মিশরীয় মিশনারি ধর্মযাজক



দ্বীন দুনিয়া দুটো একত্রে

ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে এমন নজীর বিহীন বিরল যুগপৎ প্রভাব তাকে পরিণত করেছে মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী মহানতম ব্যক্তিত্বে।

মাইকেল হার্ট
মার্কিন লেখক



কেন নয়?!

তাই যদি ইসলাম হয় তাহলে আমরা সবাই কি মুসলিম হব না!?

গ্যাটো
জার্মান সাহিত্যিক

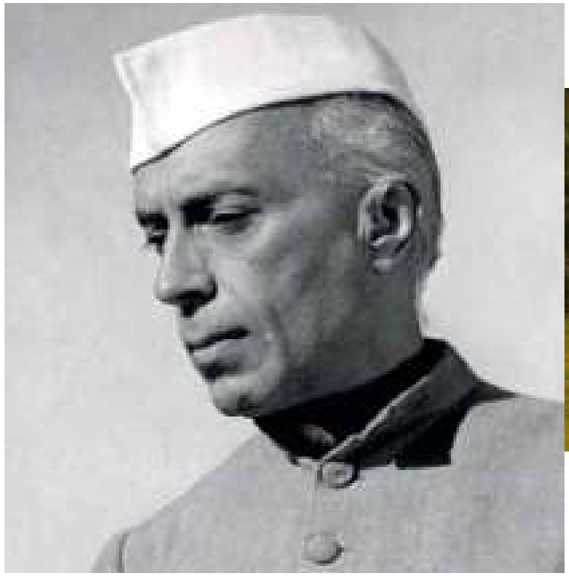
যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদের বিপরীতে আরেকদল মানুষ রয়েছে, যারা তাদের স্বভাব প্রকৃতির শুধুই অবাধ্য হয়, যে স্বভাবে আল্লাহ তায়া'লা তাকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন। এ ধর্মের সত্যতায় অনেক নিদর্শন, মু'যিজা আসার পরেও সে ইহাকে অস্বীকার ও অবাধ্যতার পর্দায় আড়াল করে রাখে। ফলে সে নিজের জন্য আল্লাহ তায়া'লার তাওহীদের বিপরীতে শিরক পছন্দ করে। সত্যের আলো, দৃঢ় বিশ্বাস ও হেদায়েতের পরিবর্তে অন্ধকার, সন্দেহ, কুসংস্কার ও অজগুবী সব কল্পকাহিনী নিজের জন্য পছন্দ করে।

সে এক আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার পরিবর্তে তার মতই মানুষ বিশপ ও পাদ্রীদের দাস হতে পছন্দ করে। এমনকি রাসুলদের দাস হতে চায়। ফলে তার প্রকৃত স্বভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার বিবেক শূন্য হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহ তায়া'লা তাকে যে স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বাদ দিয়ে খামখেয়ালী ও সংশয়পূর্ণ জিনিসের আনুগত্য করে। সব সন্তানই ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [সূরা রূমঃ ৩০]

এখন তুমি নিজেই এখন কাফিরদের চূড়ান্ত গোমরাহী ও স্পষ্ট ভ্রষ্টতার পরিমাপ আন্দাজ করতে পার। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।} [সূরা ফাতিরঃ ৩৯]

তাহলে এ রিসালাতের মূলনীতি, উৎস ও বৈশিষ্ট্য কি?





রিসালাতের প্রতি মুহাম্মদের দৃঢ়বিশ্বাস

এই যে সাধারণ লোকটি মানুষকে অনুগত্যের ডাক দিচ্ছে রাজা বাদশাদেরকে তারা তার দূতের চিঠি হতে নিয়ে মনে হয় হতভম্ব হয়েছিল। কিন্তু এই চিঠি প্রেরণ আমাদের সামনে একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে নিজের প্রতি ও রিসালাতের প্রতি মুহাম্মদের বিশ্বাস সম্পর্কে। এই আস্থা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে মুহাম্মদ [সঃ] তার অনুসারীদের মাঝে শক্তি, মর্যাদাবোধ ও রক্ষনশীলতা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তাদেরকে তিনি মরুবাসী থেকে সে সময়ের অর্ধ জাহানের নেতায় পরিণত করেছিলেন। মুহাম্মদ [সঃ] তার ওফাতের অগেই বিচ্ছিন্ন আরব গোত্র সমূহকে শক্তিশালী মর্যাদাশীল একটি জাতীতে পরিণত করেছিলেন ।

জওয়াহারলাল নেহেরু
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী



ইসলামী শরিয়তের মূলভিত্তিঃ

ইসলামী শরিয়ত কতিপয় অসাধারণ মূলনীতি ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা সকল মানুষের জন্য সর্বযুগে ও স্থানে প্রযোজ্য। এসব মূলভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপঃ

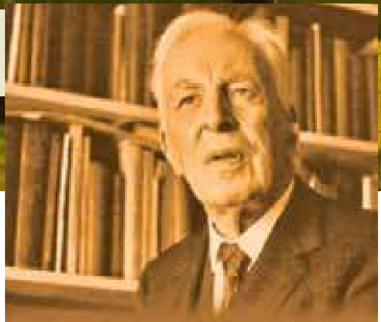
প্রথমতঃ সহজতা অবলম্বন ও কঠোরতা পরিহারঃ

ইসলামী শরিয়াতের সব বিধি-বিধান বান্দাহর চেষ্টা ও সাধ্যের মধ্যে। সাধারণ কাজকর্মের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করতে হয়না। কেননা দ্বীন হলো সহজ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।} [সূরা বাকারাঃ ১৮৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।} [সূরা নিসাঃ ২৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।} [সূরা বাকারাঃ ২৮৬]

হযরত আয়েশা [রাঃ] বলেছেনঃ “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে [আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে] কোন দুটো বিষয়ের ব্যাপারে পছন্দ করতে বললে তিনি সহজতর বিষয়টি পছন্দ করতেন, যতক্ষণ এতে গুনাহ না হয়। আর গুনাহের সম্ভাবনা থাকলে যেটা



মুহাম্মদের নবুয়াতের রিসালাত

মুহাম্মদ [সঃ] আরব সমাজে দুটি জিনিস রক্ষার্থে তার রেসালত প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সে দুটি হল, ধর্মীয় চিন্তায় ওয়াহদানিয়াত [একত্ববাদ] এবং আইন, ও শাসন ব্যবস্থা।
আর তা বাস্তবায়িত হয়েছিল ইসলামের সুব্যাপক সমাজ ব্যবস্থার সুবাদে,যা একত্ববাদ ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে যুগপৎভাবে সন্নিবেশিত করতে পেরেছিল । যার ফলে ইসলাম এমন প্রভাব ও প্রতাপ অর্জন করে যে, আরবকে মুর্খ জাতি থেকে সভ্য জাতীতে পরিণত করে।

আর্নল্ড টয়েনবী
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

দ্বারা গুনাহ থেকে বেশি দূরে থাকা যায় সেটা পছন্দ করতেন। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও তাঁর নিজের ব্যাপারে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহর হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। তা হয়ে থাকলে আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন। [বুখারী শরিফ]

ইসলামী শরিয়তে কঠোরতা ও কষ্ট পরিহারের অন্যতম দিক হলো কম আদেশ নিষেধ করা, যাতে কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়াই এসব বিধি-বিধান পালনে বান্দাহর জন্য সহজ হয়। কেননা ক্লান্তিতে রয়েছে জটিলতা ও সংকীর্ণতা। আর কঠোরতা ও জটিলতা ইসলামী শরিয়ত থেকে দূর করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।} [সূরা হাজ্বঃ ৭৮]

এমনিভাবে শরিয়তের আদেশ নিষেধের উদ্দেশ্য হলো বান্দাহকে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তিতে পৌঁছানো। তাই সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাহিরে ইসলামী শরিয়ত কিছুই আবশ্যক করে দেয়নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ হে মুমিণগন, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। এরূপ কথা বার্তা তোমাদের পুর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এর পর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল।} [সুরা মায়েদাঃ ১০১-১০২]



সুদৃঢ় বিশ্বাস

ইসলামের পাঁচ রুকনের মাঝে এমন কোনটি নাই যা কোন অমুসলিম ঘৃনা করবে। এসব ফরজ কাজ অতি সাধারণ ও সংখ্যায় কম হওয়া সত্বেও মুসলমানের অন্তরে আক্বীদাকে সুদৃঢ় করতে অন্য কোন সংস্কারের প্রয়োজন নেই। ইসলামী আক্বীদার আমলী মূল্য স্বীয় শক্তিতে প্রমাণিত, গভীরভাবে স্থাপিত ও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে।

জর্জ সার্টুন

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

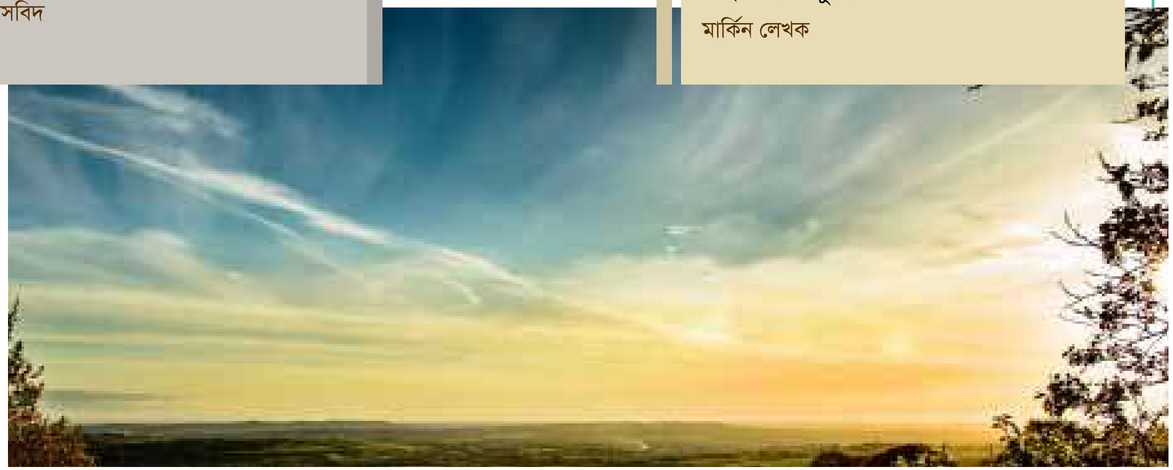


ধর্ম প্রথমে

মুসলমানদের নৈতিক মূলনীতিগুলো এবং তাদের শরিয়ত ও রাষ্ট ব্যবস্থা ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতির্ষ্ঠিত। ইসলাম হল সব থেকে সাদামাটা ও পরিষ্কার ধর্ম।এর মূল হল, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ [সঃ] আল্লাহর রাসুল।

উইলিয়াম ডুরান্ট

মার্কিন লেখক



দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেঃ

ইসলামী শরিয়তের অনুসারীদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, শরিয়তের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হলো মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা বাস্তবায়ন করা। কেননা ইহা মানুষের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সর্বযুগে ও স্থানে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও হিতকর জিনিস বাস্তবায়ন করে, আর অকল্যাণ ও ফিতনা ফাসাদ দূর রাখে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

রহমত হচ্ছে কল্যানকর প্রয়োজন মিটানোর জন্য কেননা রহমত দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মিটানো উদ্দেশ্য না হলে রাসুল [সাঃ] কে রহমত বলা হতনা। শরিয়তের সব আদেশ নিষেধ বান্দাহর দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটানোর জন্যই। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বান্দাহদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন। তাদের আনুগত্য তাঁর কোন উপকার বা কাজে আসেনা, আবার বান্দাহর নাফরমানীও তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। ইসলামী শরিয়ত পুরোটাই ন্যায়নীতি, রহমত, মানুষের চাহিদা ও হেকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা কিছুই ন্যায় থেকে বেরিয়ে অন্যায় ও জুলুম হয়, রহমতের ব্যাতক্রম হয়এবং প্রয়োজন ও চাহিদার পরিবর্তে ফিতনা ফাসাদ ও হিকমতের পরিবর্তে অযাচিত কাজ হয় তা ইসলামী শরিয়তের অন্তর্ভূক্ত নয়।

তৃতীয়তঃ সব ধরণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেঃ

ন্যায় বিচার ও সকলের মাঝে সমতা বিধানের সাধারণ নিয়ম হিসেবে অসংখ্য আয়াত এসেছে। একদিকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিকে আহবান করেছে, অন্যদিকে জুলুম থেকে দূরে থাকতে বলেছে, যদিও তা প্রতিপক্ষের ব্যাপারে হোক। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।}{ }[সূরা মায়েদাঃ ৮]

চতুর্থতঃ ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতাঃ

ইসলাম সঠিক ধর্ম ও রিসালাত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হলো ইহা অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।}

[সূরা আন'আমঃ ৩৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।} [সূরা নাহলঃ ৮৯]

ইহার ব্যাপকতা স্পষ্ট হয় ইহার আক্বীদা ও চিন্তার ধরণে, ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যে, আখলাক ও গুণাবলীতে , শরিয়তের বিধি বিধানে, বরং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইহা প্রতীয়মান হয়। পঞ্চমতঃ সমতা, উদারতা ও ন্যায়পরায়নতাঃ

ইসলাম সমতা, উদারতা ও ন্যায়পরায়নতার ধর্ম। {এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি।}[সূরা বাকারাঃ ১৪৩]

এর সব আহকামে রয়েছে সুক্ষ্ম পরিমাপ ও সমতা। {তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড।}[সূরা রহমানঃ ৭]



ইসলাম নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা

ইহুদীরা ইসলামের পতাকা তলে নিরাপত্তা ও ইনসাফ পেয়েছিল । এতে তারা জুলুম নির্যাতন থেকে আত্ম রক্ষা করেছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে সাচ্ছন্দে ও স্বচ্ছলতার মাঝে ছিল।

নাসিম সোসা
ইরাকি ইহুদি অধ্যাপক

আল্লাহ তায়া'লা মুসলমানদেরকে সব কাজে সমতা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।}{ }[সূরা ফোরকানঃ ৬৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "সাবধান! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়েছে"। তিনি সমতা বিধান ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ নিশ্চয়ই তোমার রবের প্রতি রয়েছে তোমার হক, তোমার নিজের প্রতি রয়েছে তোমার হক, তোমার পরিবার পরিজনের প্রতিও রয়েছে তোমার হক, তাই প্রত্যেক হকের অধিকারীকে তার হক আদায় করে দাও"।





ইসলামী শরিয়তের বৈশিষ্ট্যাবলী

প্রথমতঃ খোদাপ্রদত্ত মূল উৎস

ইসলামের মূল উৎস হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাক প্রদত্ত যিনি মানুষ ও এ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু এর মূল উৎস আল্লাহ প্রদত্ত তাই এতে রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য। যেমনঃ আল্লাহ তায়া'লা সৃষ্টিকর্তা, তিনি রিযিকদাতা, তিনিই একমাত্র শরিয়ত প্রবর্তনের অধিকারী। সমস্ত আম্বিয়া কিরামগণ তাদের শরিয়তকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করতেন। তাঁর শরিয়ত ছাড়া অন্যদের সব শরিয়ত বাতিল বলে গন্য করতেন। আল্লাহ তায়া'লা সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে তার শরিয়ত সম্পর্কে বলেনঃ {বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ নই।} [সূরা আহক্বাফঃ ৯]

আল্লাহর নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের সুউচ্চ সম্মান ও মহান মর্যাদা থাকা সত্বেও তিনি তাঁর নিকট প্রেরিত অহী আল্লাহর শরিয়তের অনুসরণ করতেন। তিনি ইহার আবিষ্কারক ছিলেননা, তিনি ইহার কোন বিধান নিজে তৈরি করেননি, বা কোন বিধানের অমান্যকারীও ছিলেননা। আল্লাহ তায়া'লা যেহেতু মানুষের স্রষ্টা সেহেতু তিনি সৃষ্টজীবের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্নজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [সূরা মুলকঃ ১৪]

তিনিই বান্দাহর স্বভাব, ভাল মন্দ সবকিছু সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। কিসে তাদের উপকার ও কিসে তাদের ক্ষতি হবে তা তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন। কোন কিছুর সৃষ্টিকারীই সে জিনিসের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন?} [সূরা বাকারাঃ ১৪০]



}প্রশান্তির ধর্ম

আমি জীবনে প্রথমবারের মত নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অনুভব করেছি। অনুভব করেছি যে আমার জীবনের একটি মূল্য আছে। এ বানীর মর্ম জেনেছি যে, যেই আল্লাহকে তুমি দেখনা তিনি তোমাকে দেখেন তুমি যেখানেই থাক। তিনি তোমার আমল পর্যবেক্ষণ করেন এবং কেয়ামতের দিন তোমার সঠিক প্রতিদান দেওয়ার জন্য সঠিক পাল্লা দিয়ে সেগুলো পরিমাপ করবেন। ।

আনাটোলী আন্ডারবাশ
রাশিয়ান জেনারেল

আল্লাহ তায়া'লা যেহেতু শরিয়ত প্রণেতা, সেহেতু তিনি এ শরিয়তে সাধারণ ন্যায্যতা ও সঠিকতা বিধান করেছেন। একজনের অপরাধের কারণে আল্লাহ পাক অন্যের কাছে জবাবদিহি চাইবেন না। এমনিভাবে ইসলামে অপরাধের শাস্তিসমূহ দুনিয়া ও আখেরাতের। কেউ যদি কোন কারণে দুনিয়াতে তার হক না পায় তবে সে আখেরাতে সে হক পাবে। অথবা কেউ যদি কোন অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ না করে তবে সে আখেরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয়তঃ আখলাকের সাথে শরিয়তের বিধি বিধানের বন্ধন

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শুধুমাত্র আইনের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয়না। বরং তা বাস্তবায়নের জন্য মানুষের সন্তুষ্টি ও পরিতুষ্টি লাগে। এমনিভাবে আইন কানুনের সুন্দর গঠন ও বিধি বিধান দ্বারা আশানুরূপ ফলাফল বাস্তবায়িত হয়না যতক্ষণ না যাদের জন্য উহা গঠিত হয়েছে তাদের মাঝে বাস্তবায়ন করা হয়, আর এ বাস্তবায়ন হতে হবে তাদের নিজেদের আন্তরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। আর এ নিয়ন্ত্রণ তখনই আসবে যখন উক্ত আইনের সমতার ব্যাপারে বিশ্বাস থাকবে, উহার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। শরিয়ত প্রণেতা যে সব বিধি বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে সবের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাঁর উপর থাকবে অগাধ বিশ্বাস। ইসলামী শরিয়ত মানুষের সন্তুষ্টি ও পরিতুষ্টি নিয়ে গঠিত, আল্লাহ তায়া'লা ইসলাম শিক্ষায় এ সবের নির্দেশ দিয়েছেন। {এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর।} [সূরা নিসাঃ ৬৩]

{অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন।} [সূরা গাশিয়াহঃ ২১-২২]

এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্যকে আখলাকের জন্য খাছ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি”।



তৃতীয়তঃ দুনিয়া ও আখেরাতের বন্ধন

মানব রচিত আইন ও অন্যান্য শরিয়তের সাথে ইসলামী শরীয়তের একটি বিশেষ পার্থক্য হলো, ইসলামী শরিয়ত ভাল মন্দের প্রতিফল দুনিয়া ও আখেরাতে দিয়ে থাকে। বরং আখেরাতের প্রতিদান দুনিয়ার প্রতিদানের চেয়ে অনেক বিশাল। এজন্যই একজন মুসলমান শরিয়তের বিধি বিধান পালন, সৎকাজের অনুসরণ ও অসৎকাজের থেকে বিরত থাকতে সর্বদা তার অন্তরের মজবুত আগ্রহ অনুভব করে। যদিও সে দুনিয়ার শাস্তি থেকে গোপন করতে পারে কিন্তু সে জানে আল্লাহর চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারবেনা, তাঁর চক্ষু কখনও অসতর্ক হয়না বা ঘুমায়না। মানুষ দুনিয়ার জীবনে যা কিছুই করুক না কেন পরকালে সব কিছুরই প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?} [সূরা বালাদঃ ৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?} [সূরা বালাদঃ ৭]

চতুর্থতঃ উহার বিধানাবলীর সামাজিক প্রকৃতি

ইসলামী শরিয়ত কোন এক পক্ষের সুবিধাকে অপর পক্ষের উপর কখনও প্রাধাণ্য দেয়না। একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে জবাবদিহি করতে বলেনা। মানব রচিত সমাজে যারা ইসলামের পথ অনুসরণ করেনা তাদের একটি মারাত্মক সমস্যার সমাধান ইসলাম দিয়েছে। আর সে সমস্যাটি হলো ব্যক্তি স্বার্থ ও সমষ্টিক স্বার্থের মাঝে সংঘাত।। যেমন আমরা দেখি কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধে প্রাপ্রাধাণ্য দিয়েছে। যেমনটি দেখা যায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক স্বার্থকে বেশি প্রাধাণ্য দিয়ে থাকে ফলে ব্যক্তি স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়। ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্বাধীনতা ও মালিকানাকে বাজেয়াপ্ত করে। এভাবে ব্যক্তিত্বকে অপমান করা হয়, প্রতিভাকে হ্রাস করা হয়, ফলে ব্যক্তির সক্ষমতা ও যোগ্যতায় মরীচিকা ধরে যায়। কিন্তু সমাজের এ সব অধিকারের মাঝে সমতার ভিত্তিতে ইসলাম শরিয়তের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম সমাজের সর্বসাধারণের স্বার্থ গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে মুসলিম ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদাকে উপেক্ষা করেনি। যেমন ইসলামে রাজনৈতিক আঙ্গিনায় আমরা দেখি, শাসক ও নেতার আনুগত্য করা প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো উক্ত শাসক বা নেতা শরিয়তের বিধি বিধানের উপর অটল থাকতে হবে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। নতুবা ইসলাম তার থেকে এ অধিকার কেড়ে নেয়। তাই শাসক বা নেতার আনুগত্য হবে সে সব কাজে যাতে আল্লাহ তায়া'লার অবাধ্যতা ও নাফরমানি থাকবেনা।

পঞ্চমতঃ স্থায়ী মূলনীতি ও সহজ বাস্তবায়ন

ইসলাম স্থায়ী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার মূল উৎস মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধণ হবেনা। আল কোরআন মহান আল্লাহ তায়া'লার সংরক্ষণে সংরক্ষিত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।} [সূরা হুজরঃ ৯]

এতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। {এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।} [সূরা আল মু'মিনঃ আয়াতঃ ৪২]

এমনিভাবে রাসুলের সুন্নতও সুক্ষ্মভাবে ও যত্নের সাথে সংরক্ষিত ও লিখিত হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের মধ্যে ইসলামী শরিয়তের প্রায় সব বিধি বিধানই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ণ পদ্ধতি ব্যতীত শামিল করেছে। মুজতাহিদদেরকে সমস্যা ও অবস্থা বুঝে বাস্তবায়ণ



করার জন্য এ সুবিধা দিয়েছে। তবে এ সব বিধি বিধান বাস্তবায়ণে নমনীয়তা ও প্রশস্ততা প্রদান করেছে, কেননা এসব বিধিবিধান বাস্তবায়ণে উদ্দেশ্য সাধিত হওয়াটাই মূখ্য বিষয়, বাস্তবায়ণ পদ্ধতি ও ধরণ যেমনই হোক, যতক্ষণ না ইসলামী শরিয়তের কোন নসের বা ইসলামের কোন মৌলিক নীতির বিরোধী হয়। এজন্যই ইসলামী শরিয়তে সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ [মাকাসিদ শরিয়া] বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা ও নতুনত্বের স্থান রয়েছে। এমনিভাবে ইতিপূর্বে ছিলনা এমন কোন নতুন বিধানের সমাধান পূর্বের কোন মাসয়ালার সাথে কিয়াস করে সমাধান দিতে ইসলামে কোন বাঁধা নেই, কেননা প্রতিনিয়তই নতুন নতুন ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে।

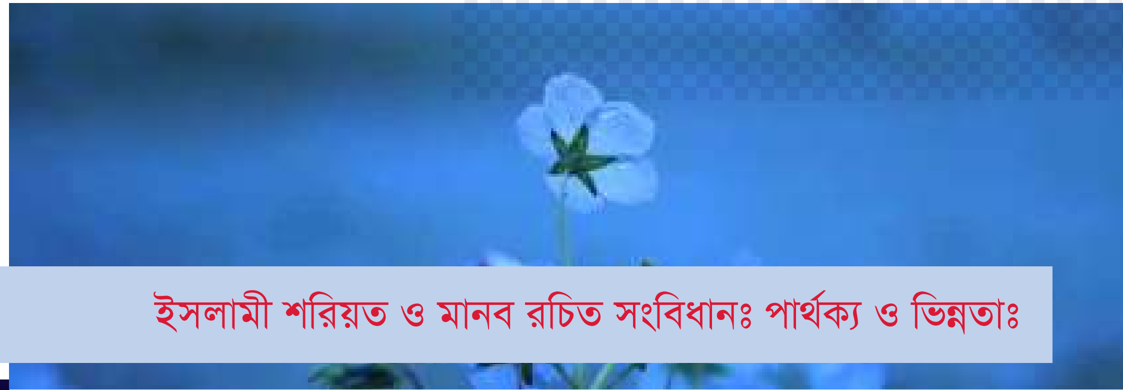


সম্মান ও মর্যাদার ধর্ম

ইসলাম শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, মাহাত্ব ও মর্যাদার ধর্ম। এর বিধি বিধান রীতি নীতি আদব কায়দার মাঝে তা ফুটে ওঠে। যেমন ইসলামের রোজা অন্যান্য ধর্মের রোজার মত নয়। কারণ, মানুষের দেহের চাহিদাকে এমন ভাবে দমন করা যে, দেহ কংকালসার হয়ে যাবে, যেমন ধর্ম যাজকরা করে থাকে এটা মানুষের মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই ইসলাম দেহের চাহিদাকে পরিপাটি করেছে, সমূলে দমন করেনি । তাই ইসলামে রোজা হল, হারাম পাপাচারবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধৈর্যের উপর নফসকে অভ্যস্ত করে তোলা। গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর মুরাকাবা করা। বঞ্চনা ও ক্ষুধার অনুভব জাগিয়ে তোলা যাতে রোজাদার বঞ্চিতদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। অনুরূপ ভাবে রোজাতে আছে অতিভোজন থেকে দেহের বিশ্রাম লাভের সুযোগ। সুতরাং, রোজা মানুষের দেহ, আত্মা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে উপকারী এবং তা সমাজের জন্য পারস্পরিক নৈকট্য , সহযোগিতা ও ঐক্যের ক্ষেত্রে উপকারী।

বারিশা বানকমরোট

থাই শিক্ষাবিদ, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন



ইসলামী শরিয়ত ও মানব রচিত সংবিধানঃ পার্থক্য ও ভিন্নতাঃ

ইসলামী শরিয়ত ও মানব রচিত সংবিধানে অনেক পার্থক্য রয়েছে, যেমনঃ

মানুষের শ্রদ্ধা, পবিত্রতা ও সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকেঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের শ্রদ্ধা, পবিত্রতা ও সম্মান অর্জন করে থাকে। কেননা ইহার দ্বীনি গুনাবলী কারণে মানুষের মনে লেগে থাকে। ইহার প্রণেতা হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা , যার পবিত্রতা, বড়ত্ব, তাঁর সামনে নতজানুতা সব মানুষের অন্তরে বিরাজ করে।

ইসলামী শরিয়ত মানুষের স্বভাব প্রকৃতির অনুকূল, সব যুগ ও কালের উপযোগীঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, পরিবেশ, জাতীয়তা ও ভাষার ভিন্নতা সত্বেও সব জাতির জন্য উপযোগী। কেননা ইহার প্রণেতা হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা, যিনি মানুষ, তার স্বভাব-প্রকৃতি, চাহিদা, আরো যা কিছু তাদের সাথে সম্পৃক্ত তিনি সব কিছুই জানেন।অন্যদিকে তিনি খামখেয়ালী ও লোভলালসা হতে মুক্ত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [সূরা রূমঃ ৩০]

ইসলামী শরিয়ত সঠিকতা, সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা অনুযায়ীঃ

ইসলামী শরিয়ত সঠিকতা, সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার অনুসারী। কেননা এতে কোন ধরণের ভুল, গলদ, অন্যায়, জুলুম, প্রবৃত্তি ও খাম খেয়ালীর অনুসরণের কোন সম্ভাবনাই নাই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।} [সূরা আন'আমঃ ১১৫]

একমাত্র আল্লাহ তায়া'লাই সমস্ত প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তিনি সব সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রকাশ্য ও

গোপনীয় সব কিছুই জানেন। বান্দাহর সর্ব বিষয়ে অবগত। তাদের যাতে উপকার ও স্বার্থ রয়েছে তিনি তাই আদেশ করেন, আর যেসব কিছুতে তাদের ক্ষতি রয়েছে তিনি তা থেকে নিষেধ করেন। অন্যদিকে মানব রচিত আইন কানুনে ভুল, গলদ ও খামখেয়ালীর অনুসরণ রয়েছে। এজন্যই ইহা ভুল ত্রূটি, বাতিল, পরিবর্তন, রূপান্তর থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [সূরা নিসাঃ ৮২]

ইসলামী শরিয়তের মানবিক গুরুত্বারোপঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের চিন্তা ভাবনা থেকে উৎসারিত কোন আইন কানুন নয়, বরং ইহার প্রণেতা হলেন মহান আলাহ পাক রাব্বুল আলামিন, মানুষের স্বভাব ও সৃষ্টিগত চাহিদায় যা কিছু উপযোগী তিনি সে সব কিছুই তিনি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [সূরা মুলকঃ ১৪]

তাদের বোঝা হালকা করার ব্যাপারে তিনিই অধিক জ্ঞাত। {আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।} [সূরা নিসাঃ ২৮]

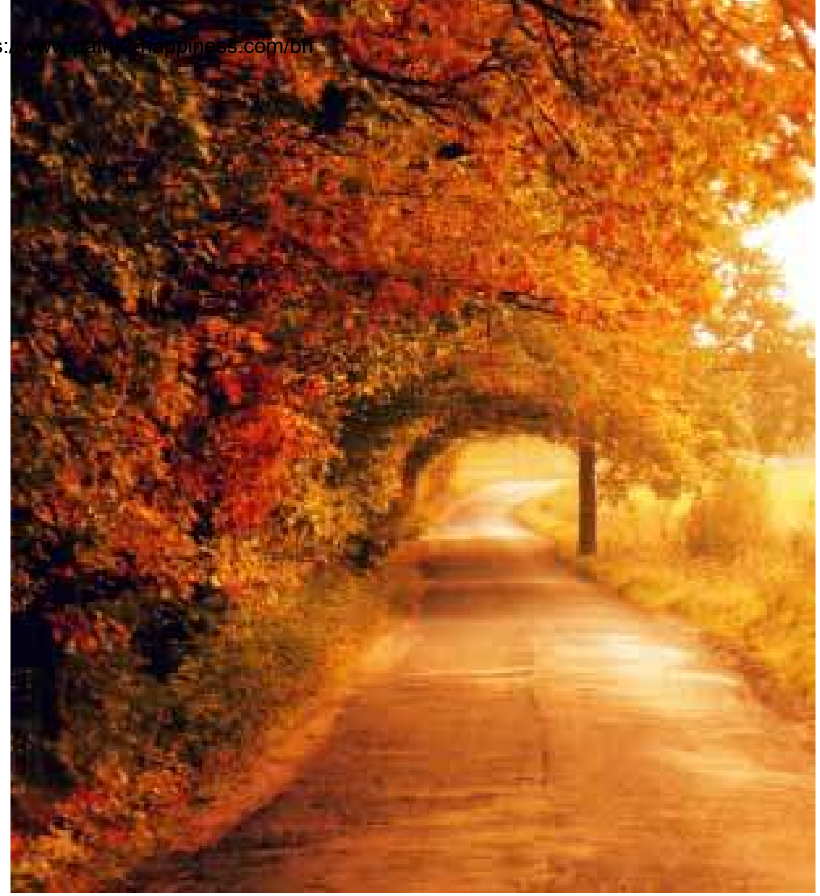
পক্ষান্তরে, মানব রচিত আইনে আইন প্রণেতা শুধুমাত্র তার ইচ্ছা, গুরুত্ব, মেজাজ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রণয়ন করে থাকেন।

আত্মিকতার সাথে ইসলামী শরিয়তের বন্ধনঃ

ইসলামী শরিয়ত মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের কাজের গুরুত্ব ও বিবেচনা করে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্য্যশীল।} [সূরা বাকারাঃ ২৩৫]

পক্ষান্তরে, মানব রচিত আইনে শুধু বাহ্যিক দিকই গুরুত্ব ও বিবেচনা করে থাকে। এতে আত্মিক বা পরকালীন কোন বিষয় ভাবা হয়না। আর মানব রচিত আইনে শুধুমাত্র পার্থিব শাস্তির বিধান রয়েছে।







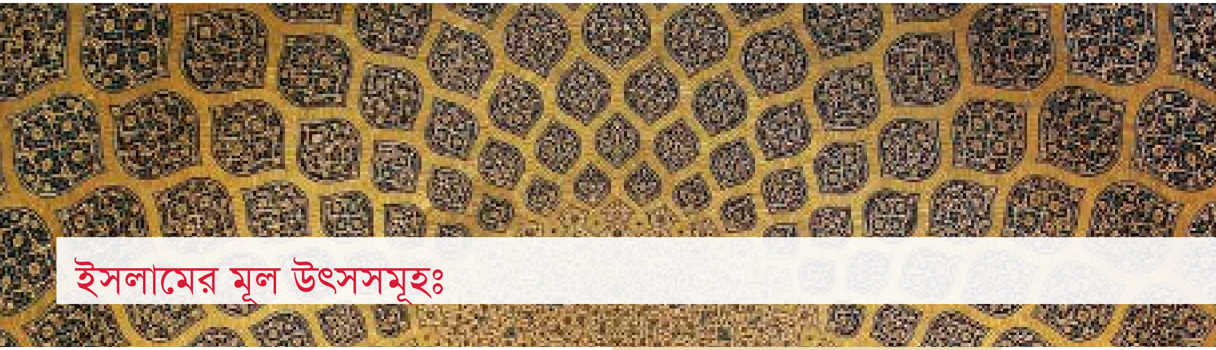
পরিচ্ছন্ন ও সুখী সমাজ

যে মুসলিম সমাজ ইসলামের হুকুম-আহকাম ও শিক্ষা-দীক্ষা মেনে চলে তা একটি পরিচ্ছন্ন ও সুখী সমাজ। সেখানে কোন ধরণের অপরাধ থাকবে না।

বারিশা বানকমরোট

থাই শিক্ষাবিদ, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন





ইসলামের মূল উৎসসমূহঃ

ইসলামের শরিয়ত, আক্বীদা, আহকামসমূহ খোদা প্রদত্ত ওহী কোরআন ও হাদিস থেকে উৎসারিত। এ দুটো ইসলামের মূল উৎস। এদুটো থেকেই শরিয়তের বিধিবিধান, আক্বীদা ও অন্যান্য আহকাম নেয়া হয়। নিম্নে এ দু'য়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলোঃ

মহাগ্রন্থ আল কোরআনআল্লাহ

তায়া'লা মুত্তাকিদের হেদায়েত, মুসলমানদের সংবিধান, তিনি যাদেরকে হেদায়েত দিতে চান তাদের অন্তরের আরোগ্যতা ও যাদের কল্যাণ চান তাদের জন্য আলোকবর্তীকা স্বরূপ আল কোরআন তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। সমস্ত নবী রাসুলগণ যেসব মূলনীতি নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন সেসব মূলনীতিসমূহ এতে শামিল হয়েছে। আল কোরআন কোন নতুন গ্রন্থ নয়, এমনিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন নতুন রাসুল নন। আল্লাহ তায়া'লা ইব্রাহিম [আঃ] এর উপর সহীফা নাযিল করেছেন। মূসা [আঃ] কে তাওরাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। দাউদ [আঃ] কে যাবুর ও ঈসা [আঃ] কে ইঞ্জিল দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এ সব কিতাবসমূহ আল্লাহ তায়া'লার ওহী যা তিনি আম্বিয়া কিরামদের নিকট পাঠিয়েছেন। আল কোরানও এসবের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। সমস্ত নবী রাসুলদের উপর ঈমান

আল কোরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব

যখন আমি তাওহীদে বিশ্বাস করেছি তখন কোরান যে আল্লাহর কিতাব এবং তা সর্ব শেষ আসমানী কিতাব তা প্রমাণকারী দলিল প্রমান অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আল হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এর সমাধান করতে তাওফিক দিয়েছেন। কোরানই একমাত্র গ্রন্থ যা অন্য সব আসমানী গ্রন্থকে স্বীকৃতি দেয়। অথচ অন্য সব গ্রন্থ একে অপরকে অস্বীকার করে। আর বাস্তবে এটা কোরানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য।



বশির চাঁদ

ভারতীয় মিশনারি



আল কোরআনের মর্যাদা

কোরান চৌদ্দ শতাব্দি যাবত মুসলিমদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থেকে তাদের চিন্তাকে নাড়া দিচ্ছে , তাদের চরিত্র গঠন করছে, মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের প্রতিভাকে শাণিত করছে। কোরআন মনে জাগিয়ে তোলে এমন বিশ্বাস যা সবচেয়ে সহজ ও স্পষ্ট এবং অনুষ্ঠানিকতা ও রেওয়াজ থেকে অনেক দূরে, পৌত্তলিকতা ও পৌরহিত্য থেকে অধিক মুক্ত। মুসলিমদের নৈতিক ও ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী ছিল। উহাই তাদের মাঝে সমাজ নীতি ও সামাজিক ঐক্যের ভিত সমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদেরকে স্বাস্থ্যগত নিয়ম মানতে উৎসাহিত করেছে অনেক কুসংস্কার, ভুল ধারণা, জুলুম ও রুক্ষতা থেকে তাদের চিন্তাকে মুক্ত করেছে, দাসদের অবস্থা উন্নত করেছে এবং নিম্ন শ্রেণির মাঝে মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলেছে।

উইলিয়াম ডুরান্ট

মার্কিন লেখক

আনতেও নির্দেশ দেয়, তাদের মাঝে কোন ধরণের পার্থক্য করতে বারণ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যাকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।} [সূরা নিসাঃ ১৫০-১৫২]

কিন্তু এসব পবিত্র গ্রন্থসমূহের অনেকটাই কালের অবর্তমানে হারিয়ে গেছে, অধিকাংশগুলোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উহাতে নানা পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রবিষ্ট হয়েছে।

আর কোরআন শরিফের হেফাযতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তায়া'লা নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।} [সূরা হিজরঃ ৯]

তিনি কোরানকে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের রক্ষক ও রহিতকারী করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।} [সূরা মায়েদাঃ ৪৮]

তিনি কোরআনকে সব বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।} [সূরা নাহলঃ ৮৯]

ইহাতে রয়েছে হেদায়েত ও রহমত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে।} [সূরা আন'আমঃ ১৫৭]

ইহা সরল ও সৎকর্ম পরায়ণশীলদেরকে পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে।} [সূরা বনী ইসরাইলঃ ৯]

ইহা মানব জীবনের সব বিষয়ের সরল সঠিক ও সুন্দর সমাধান দিয়েছে।

মানুষ যা কিছু প্রয়োজনবোধ করে তার সব কিছুই কোরআনে শামিল করা হয়েছে। ইহাতে আইন কানুন, আক্বীদা, আহকাম, লেনদেন, শিষ্টাচারের মৌলিক সব নীতি শামিল করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।} [সূরা আন'আমঃ ৩৮]



কোরান সংস্কার ও দীক্ষা গ্রন্থ। এতে যা আছে এর সবই বিধি বিধান নয়। কোরান মুসলিমদেরকে যে সব উন্নত গুণাবলীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যেগুলো নৈতিকতার মানদণ্ডে সব চেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ গুণাবলী। কোরানের হেদায়েত এর নির্দেশিত বিষয় গুলোতে যেমন ভাস্বর তেমনি নিষিদ্ধ বিষয় গুলোতেও ভাস্বর।

সিডনি ফিশার

মার্কিন ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক



উজ্জ্বল সুন্নত

মুহাম্মদ [সঃ] এর উজ্জল হাদিস আমাদের যুগেও স্থায়ী রয়েছে। পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা তাঁর সুন্নতের অনুসারী শত শত মিলিয়ন আত্মা থেকে উৎসারিত ধর্মীয় নিষ্ঠা তাকে আরো উজ্জল করছে।

ইটিন দীনিয়া

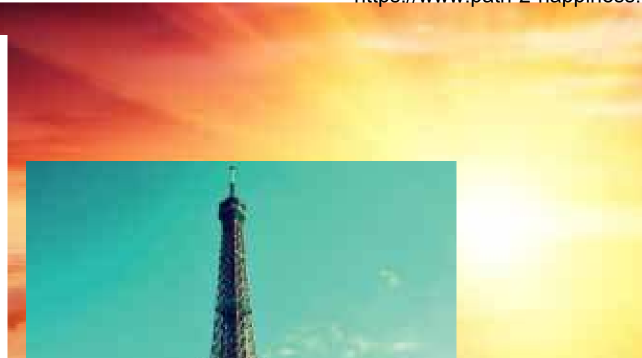
ফরাসি চিত্রশিল্পী এবং চিন্তাবিদ

খ- হাদিস শরিফঃ

আল্লাহ তায়া'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোরআন নাযিল করেছেন, তিনি তাঁর কাছে হাদিসসমূহও ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কোরআন ওহী,যা প্রত্যাদেশ হয়।} [সূরা নাজমঃ ৪]

ইহা কোরআনেরই অনুরূপ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে লোকসকল! আমাকে কিতাব দান করা হয়েছে, ইহার অনুরূপ আরো একটি কিতাব দান করা হয়েছে"। [মুসনাদে আহমদ]। অতএব, হাদিস শরিফ আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে রাসুলের নিকট ওহী। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও নিজের থেকে বানিয়ে কোন কথা বলতেন না। আল্লাহ তায়া'লা তাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তিনি শুধুমাত্র তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ নই। } [সূরা আহক্বাফঃ ৯]

হাদিস হলো ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের থেকে সহীহ ধারাবাহিক সনদে যে সব কথা, কাজ, বর্ণনা বা মৌন সম্মতি এসেছে উহাকে হাদিস বলে। ইহা কোরানের ব্যাখ্যাকার ও স্পষ্টকারী। আল্লাহ তায়া'লা তার রাসুলকে কোরআনের আ'ম [ব্যাপকতা], খাস [নির্দিষ্টতা], মুজমাল [অস্পষ্টতা] ইত্যাদি



ব্যাখ্যা করতে অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার কাছে আমি স্মরণিকা [কোরআন] অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তোদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।}[সূরা নাহলঃ ৪৪]

অতএব হাদীস কোরআনের ব্যাখ্যাকারী, কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাদান করে। অস্পষ্ট আহকামের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। যেহেতু রাসুলের নিকট যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তিনি সেগুলোর কখনো কথার মাধ্যমে, কখনও কাজের মাধ্যমে বা কখনও কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোরআন ছাড়াও হাদিস শরিফ স্বতন্ত্রভাবে কিছু কিছু বিধি বিধান প্রণয়ন করেছে।

অতএব হাদিস হলো ইসলামের বিধি বিধান, আক্বীদা, ইবাদত, লেনদেন ও শিষ্টাচারের ব্যবহারিক প্রয়োগ। আল্লাহ তায়া'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তিনি ব্যবহারিকভাবে দেখিয়েছেন, মানুষকে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি যেভাবে করেছেন মানুষকে সেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা মুমিনদেরকে রাসুলের কথাবার্তা ও কাজের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের ঈমান পরিপূর্ণ হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।}[সূরা আহযাবঃ ২১]

সাহাবায়ে কিরামগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের কথা, কাজ তাদের পরবর্তীদের জন্য বর্ণনা করে গেছেন। পরবর্তীরা [তাবেঈগণ] তাদের পরবর্তীদের জন্য বর্ণনা করে গেছেন। অতঃপর হাদিসের কিতাবে তা লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাদিসের



আল কোরআন ও হাদিস পাশাপাশি একত্রে

কোরানকে হাদিস পূর্ণতা দান করে। হাদিস হল, নবী মুহাম্মদ [সঃ] এর কর্ম ও উপদেশ সংক্রান্ত বাণী সম্ভার। মানুষ হাদিসে খুঁজে পাবে নবী [সঃ] এর চিরন্তনতার প্রমান। যা জীবনের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সামনে তার চালচলনের মৌলিক উপাদান। সুতরাং সুন্নাত কোরানের ব্যখ্যা কারী, এবং তা অপরিহার্য।

জ্যাক রিচ্যান্ড

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

বর্ণনা খুব সতর্কতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যারা উহা বর্ণনা করছেনতাঁরা বর্ণনাকারীদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে জেনে নিতেন। এমনিভাবে হাদিসের সনদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। সনদের সকল মুহাদ্দিসগণ সিকাহ [নির্ভরযোগ্য],আদেল [ন্যায়পরায়ন], ও আমিন [বিশ্বস্ত] ছিলেন। ইসলামের মূল উৎস হিসেবে কোরআন ও হাদিসের উপর ঈমান আনা ফরজ, উভয়ের উপর আমল করা, এদু'য়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, উহার আদেশসমূহ মান্য করা ও নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা ফরজ। উহাতে যেসব বিষয়ে সংবাদ দেয়া হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা, আল্লাহর নাম, সিফাত ও কাজের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে, মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাক যে পুরস্কার ও কাফিরদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করা সবার জন্য ফরজ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।}[সূরা নিসাঃ ৬৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।}[সূরা হাশরঃ ৭]

অতএব, হে শান্তির পথের দিশারী, যারাই শান্তির পথে চলতে চাও এসো, ইসলামের দিকে এসো, ইহাই একমাত্র শান্তির পথ!!!



হেদায়েতের দিশা দানকারী হাদিস

মুহাম্মদের [সঃ] এর সুন্নাত মোতাবেক আমল করাই হল ইসলামের অবকাঠামো ও এর উন্নতিকে টিকিয়ে রাখা। আর সুন্নাত বর্জন করা মানে হল, ইসলাম শেষ হয়ে যাওয়া। সুন্নাত হল ইসলাম সৌধের লৌহ কাঠামো। তুমি যদি কোন ভবনের লৌহ কাঠামোকে সরিয়ে নাও তাহলে তা যে কাগজের ঘরের মত গুঁড়িয়ে যাবে তাহলে তুমি কি আবাক হবে!?

লিউপোল্ড উইস

অস্ট্রিয়ান চিন্তাবিদ

হাদিস সংকলন



এই হাদীছ গুলো যার সমষ্টি হল সুন্নাত, এগুলো সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছ থেকে কঠোর যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে । এভাবেই বিপুল পরিমাণ হাদীছ সংকলিত হয়েছিল।

জ্যাক রিচ্যান্ড

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



সৌভাগ্যের পথ

সূচিপত্র

সৌভাগ্যের পথ

সৌভাগ্যের অর্থ ও প্রকৃতি

সৌভাগ্য শব্দটি সে সব শব্দের অর্ন্তভুক্ত যে সব শব্দের সঠিক অর্থের ব্যাপারে মানুষ মতানৈক্য করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন, আনন্দ-মজা, আরাম-আয়েশ, ধন- সম্মদ, পদমর্যাদা বা যশ-খ্যাতি ইত্যাদি অর্জন হলো সৌভাগ্য। এভাবেই অনেক মানুষ সৌভাগ্য অন্বেষণে জীবন নিঃশেষ করে দেয়। তবে হ্যাঁ, সৌভাগ্য হলো এমন এক অনুভূতি যা মানুষের অন্তরের গহীন থেকে উৎসারিত হয়, যখন সে সন্তুষ্টি, ঈর্ষা, প্রশান্তি, মহত্ব ও আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, গুরুত্ব, দৃষ্টি-ভঙ্গি এমনকি সমাজ ভেদে সৌভাগ্যের ধরণও নানারূপ হয়ে থাকে। কেউ সৌভাগ্য খুঁজে পায় সম্পদের মাঝে, কেউ পায় ঘর-বাড়ি, যশ-খ্যাতি বা সুস্বাস্থের মাঝে, আবার অন্য কেউ তা খুঁজে পায় স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ বা লেখাপড়ার মাঝে। আবার কেউ বা খুঁজে পায় প্রিয় ব্যক্তির নৈকট্য লাভে, বা বিরক্তকর জিনিস থেকে মুক্তি পেলে, অথবা আধ্যাত্বিক সাধনা করতে অবিবাহিত থাকা, বা গরিব মিসকিনকে সাহায্য করার মাঝে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি আসলেই সুখী? তখন তাদের উত্তর না বোধক হয়!!!

তাহলে আপনি দেখতে পেলেন যে, সুখী হওয়ার সংজ্ঞা মানুষ, সমাজ ইত্যাদি ভেদে নানারূপ হয়ে থাকে। এমনকি কোন কোন দেশের কিছু সংস্থা "নানা জাতির মাঝে সুখের সিড়ি" নামে ধারাবাহিক ধাপ তৈরী করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো কোন জাতি সবচেয়ে সুখী তা নির্ণয় করা। তারা নানা বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রত্যেক ধাপের মান নির্ধারণ করেন। কিন্তু ফলাফল ছিল সকলের জন্য এক আশ্চর্য ও অবাকজনক ব্যাপার। দেখা যায় আমেরিকানরা সবচেয়ে অসুখী জাতি, তাদের কোন সুখ শান্তি নেই, সুখ নামের চিহ্নটিই মাত্র তাদের অর্জিত হয়। অথচ আমরা জানি আমেরিকানদের উচ্চ বিলাসী জীবন যাপনের জন্য কত ধরণের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। আরো আশ্চর্য জনক ব্যাপার হলো, নাইজেরিয়ানরা সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট লাভ করে সুখী জাতি নির্বাচিত হয়েছে, অথচ দরিদ্রতার নির্মম কষাঘাত সে জাতিকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায়!!!!



সুখ ও প্রশান্তির ধর্ম

"আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিঃ মুসলমানেরা দরিদ্রতা ও অনুন্নতি সত্বেও কেন এতো সুখ অনুভব করে?! সুইডিশরা প্রশস্ত, আয়েশী ও উন্নত জীবন যাপনের পরেও কেন এতো দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে? এমনকি আমার দেশ সুইজারল্যান্ডেও একই ধরণের অনুভূতি অনুভব করি যেমনটি করেছি সুইডেনে, অথচ এ দেশগুলো হলো সমৃদ্ধিশালী ও জীবন যাপনের মান খুবই উন্নত। এ সব কিছুর ফলে আমি প্রাচ্যের ধর্মসমুহ নিয়ে পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। প্রথমে হিন্দু ধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি। কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। পরে ইসলাম ধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি। আমি লক্ষ্য করলাম এ ধর্ম অন্যান্য ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং ইহা সব ধর্মকে ব্যাপ্তি করে। ইহা সর্বশেষ ধর্ম। আমি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করার ফলে এ বাস্তবতা আমার কাছে আরো বিস্তার লাভ করে এবং ইহা আমার অন্তরে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হয়েছে"।

রোজীহ ডুবাকীহ

সুইস চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক



মানবজাতির সুখ শান্তি

"এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের আত্মতুষ্টিতে ব্যর্থ ও মানুষের শান্তির উপায় আবিষ্কারে বিফল হয়েছে, ফলে মানুষকে দুঃখ দুর্দশা এবং বিভ্রান্তির নরকে ফেলে দিয়েছে। কেননা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা ধ্বংস এবং বিনাশমুখী। এমতাবস্থায় উহা ইসলামী যুগের মত পূর্নাঙ্গতা ও মানব সেবার মাধ্যম হতে অক্ষম।

নাসিম সোসাহ

ইরাকি ইহুদি অধ্যাপক



আমেরিকার "নিউজ উইক" সাময়িকী বিশ্বের সবচেয়ে সুখী জাতি নির্বাচনে এ পরিসংখ্যানের ফলাফল প্রকাশ করেছে। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নাইজেরিয়ান জাতি দারিদ্রতা সত্বেও ৬৫টি দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। এর পরে আছেঃ মেক্সিকো, ভেন্যুজুয়েলা ও সালভাডর। অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহ - এ আশ্চর্যজনকভাবে রিপোর্ট মোতাবেক- সুখের তালিকায় নিচের দিকে আছে। আমরা অধিকাংশ আমেরিকানদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তারা অকপটে স্বীকার করে যে, সুখ শান্তি ধন সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নয় নিউইয়ার্ক সাময়িকী, আরবী সংস্করণ, ৩/৮/২০০৪, পৃষ্ঠাঃ ৫৮। আর ইহা পুঁজিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত দরকারবাদ সমাজে বিস্ময়কর মনে ব্যাপার মনে হয়। সাময়িকীটি যেদিকে ইঙ্গিত করে তা হলো সুখ শান্তির অন্বেষণে শ্বাসরূদ্ধ হয়ে আমেরিকানরা ধর্মের দিকে ছুটে চলছে নিউইয়ার্ক সাময়িকী, আরবী সংস্করণ, ৬/৯/২০০৫। । যা তাদেরকে বিভিন্ন মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

সৌভাগ্যের সংজ্ঞা, ইহা অর্জনের উপায় নিয়ে বিভিন্নজনের কাছে বিভিন্ন ধরণ দেখা যায়। যেমন মানুষের কতিপয় মানবিক গুনের সমষ্টিকে প্লেটো সুখ বলেছেন, সেগুলো হলোঃ [প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সতীত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা]। তিনি বলেছেন, মানুষ পরকালে তার রূহের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত সুখী হবেনা। আর অ্যারিস্টটল সুখকে মহান আল্লাহ তায়া'লার দান বলে আখ্যা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইহা পাঁচটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হলোঃ সুস্থ শরীর, সুস্থ অনুভুতি, সম্পদ অর্জন ও তা সঠিকভাবে ব্যবহার, কর্মস্থলে সফলতা ও আশা পূরণ, সুস্থ বিবেক ও সঠিক বিশ্বাস, সুখ্যাতি ও মানুষের কাছে প্রিয়তা। মনোবিজ্ঞানে

জীবনে সন্তুষ্টির প্রতিফলনকে সৌভাগ্য বলে। অথবা বারবার আনন্দ অনুভূতির প্রতিফলনলে সৌভাগ্য বলেসুখ-সৌভাগ্যের সাইকোলজি, লেখকঃ মাইকেল আরজাইয়েল। অনুবাদঃ ফয়সাল আব্দুল কাদের। । কিন্তু সুখ ও সৌভাগ্যের অর্থ যাই হোক প্রকৃত সুখ কি? কিভাবে সুখী হওয়া যায়, শুধু আনন্দ ও মজা উপভোগ করাই কি সুখ?

সুখ আনন্দ-মজা নয়ঃ

মানুষ অনেক সময়ই বিভিন্ন আনন্দদায়ক জিনিসের পিছনে চলতে থাকে। সে সব ধরণের আনন্দ আস্বাদ করে থাকে। সে ভাবে যদি পৃথিবীর সব আনন্দ ভোগ করা যেত তবে সে সুখী হত। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো সে সবচেয়ে বেশি অসুখী। পার্থিব ভোগ বিলাস নানা প্রকার, নানা ধরণের ও গুনের, কিন্তু সব ভোগ বিলাসেই সুখ নেই। এখানেই সুখ ও ভোগ বিলাসের অর্থের মাঝে বিভ্রান্তি ঘটে। এ কথা সত্য যে, এ দুটো এক অর্থে মিল আছে, অন্য অর্থে আবার রয়েছে বিশাল পার্থক্য। দুটো থেকেই অন্তরে আনন্দ আসে, এ অর্থে মিল রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, ভোগ বিলাস বা মজা ক্ষণিকের স্বাদ, ইহার উপকরণ বা কারণ চলে গেলে এ মজাও দ্রুত চলে যায়। কখনও কখনও এ মজার পরে অনুতাপ ও কষ্ট পেতে হয়। অন্যদিকে সুখ শান্তি স্থায়ীভাবে ব্যক্তির সাথে থাকে।

সুখ ও মজার অর্থগত মিশ্রন অনেক সময়ে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সে মনে করে সব আনন্দ মজাই সুখ। যেমনঃ মানুষের মাঝে বিখ্যাত ও পরিচিত হওয়া অনেক বড়





মজা ও আনন্দদায়ক। মানুষ তাকে বিভিন্ন সভা সেমিনারে সামনে এগিয়ে দেয়, তার কাজের প্রশংসা করে... এ সব কিছুই আনন্দদায়ক ও মজার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কত বিখ্যাতজন, সম্পদশালী, উচ্চ পদমর্যাদাবান বা সৌন্দর্যের অধিকারী বিষণ্ণ ও অসুখী । সর্বদা মনরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট চিকিৎসা নেয়। বা তার এ সব বিষণ্ণতা, মর্মপীড়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করে জীবনকে শেষ করে দেয়!! কত বিখ্যাতজনের কথা শুনেছি তারা তাদের কষ্ট ও বিষণ্ণ দিনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে আত্মহত্যা করেছে!!! আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছে!!! অনেককে দেখতে পাবে তারা যৌন ভোগের মাঝে ডুবে থাকে, একটার পর একটা নারী পরিবর্তন করে। কিন্তু অবশেষে যখন তাকে জিজ্ঞেস করবে দেখবে সে মরণ ব্যাধি এইডস এ আক্রান্ত হয়েছে। হারাম সম্পর্ক মজার, কিন্তু এতে ঘর ও পরিবার ধ্বংস হয়, সমাজ ভেঙ্গে পড়ে ও বংশের মধ্যে অবৈধ মিশ্রণ হয়। সেক্সুয়াল সিনেমা কিছুটা মজাদায়ক, কিন্তু এতে ব্যক্তির মানসিকতা ভেঙ্গে পড়ে, পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় ও সতী স্বাধ্বী সমাজের সীমালঙ্গন করা হয়। ভোগ বিলাসের ও মজার আরেকটি উপকরণ হলো খাদ্য। কেউ কেউ ইবাদতের মতই বা তারও বেশি খাদ্যের প্রতি আগ্রহী। পরবর্তীতে সে মেদ ও ডায়বেটিকসে ভোগে। পরে দেখা যায় সে সব সময় ডাক্তার ও হাসপাতালে আসা যাওয়া করে।

সুখ ও আনন্দের মাঝে এ মিশ্রণের ফলে কোন কোন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ দুটো দ্বারা একই জিনিস বুঝান। অনেক সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ আনন্দ ও মজার জিনিস সরবরাহ করে তাকেই সুখ বলে চালিয়ে দেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষের বিবেকের উপর আধিপত্য বিস্তার ও নানাভাবে বিবেককে আন্দোলিত করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করা। যে যুবক প্রথম প্রথম মাদক সেবন করে শুরুতে সে মজা অনুভব করে। আস্তে আস্তে সে মাদক ব্যাবসায়ীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের মাল বাজারজাত করতে মানুষকে যাদুর মত আকর্ষণ করে। কিন্তু বাজারে মানুষকে দেখবে নতুন নতুন পণ্য তালাশ করছে।

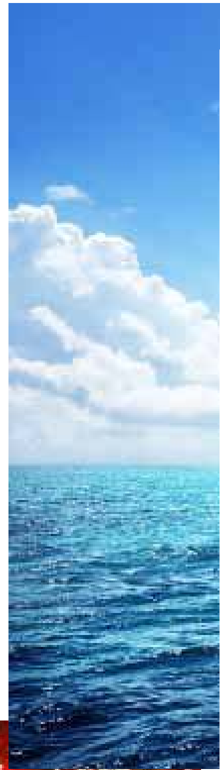
তাহলে বুঝা গেল, মানুষ যা কিছু চায় তার সব কিছুতে সুখ নেই। তাহলে ধনী ও রাজা বাদশাহরা সবচেয়ে বেশি সুখী মানুষ হতেন। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এর উল্টোটা। হয়ত ইহাই আল্লাহ তায়া'লার পূর্ণ ইনসাফের বহিঃপ্রকাশ। অনেক গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে সুখ পাওয়া যায়, বরং অন্তর্নিহিত অর্থে গরীবেরা ধনীদের চেয়ে অনেক সুখী! তাহলে সম্ভবত সুখ আরাম-আয়েশের মাঝে!!

আরাম-আয়েশের মাঝে কখনও সুখ নেই!!

অনেক মানুষ মনে করেন, আরাম-আয়েশ মানেই সুখ-সৌভাগ্য, তাই আরাম- আয়েশের দিকে ছুটতে থাকে, কিন্তু ইহা অনেক সময় তার জন্য চিন্তা, বিষণ্ণতা, একাকীত্ব ও দূর্ভাগ্য বয়ে আনে। সে ভুলে যায় যে, অনেকেই শারীরিক কষ্ট ও পরিশ্রমের মাঝে সুখ অনুভব করে। বরং কখনও কখনও কষ্ট ও পরিশ্রমই হলো সুখ। কেউ যদি একটি বাচ্চা কুয়ায় পড়েছে দেখে এবং তাকে উদ্ধারে শারীরিক কষ্ট, ব্যথা সত্বেও সে কুয়ায় নেমে তাকে উদ্ধার করে তখন সে নিজেকে অনেক সুখী মনে করবে। আপনি কি দেখেন না যে, বিজ্ঞানী, আলেম উলামা ও ছাত্ররা জ্ঞান অর্জনে কত কষ্ট সহ্য করেন, কিন্তু ইহা তাদেরকে সুখ দান করে, অনেক দুঃখ কষ্টের পরে তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। এমনিভাবে একজন খেলোয়াড় শরীরের অনেক ঘাম ঝড়িয়ে খেলায় সুখ অনুভব করে। ঠিক এভাবে দুঃখী, দরিদ্র ও অভাবী মানুষের সেবা করে, তাদের জন্য ব্যয় করে অনেকে সুখ অনুভব করে। কেউ আবার নিজের ধন সম্পদ গরিব মিসকিনের মাঝে ব্যয় করে সুখী হয়। তাই দেখা যায় মানুষ নিজের আরাম আয়েশ ও ভালবাসা ত্যাগ করে নিজে সুখী হতে চায়।

তাহলে দেখা গেল যে, সুখ ও সুখের অনুরূপ জিনিসের মধ্যকার সংমিশ্রণ, সুখের নানাজনের নানা দর্শন ও সংজ্ঞা মানুষকে হত বিহ্বল ও দিশেহারা করে ফেলে। প্রকৃত সুখের সন্ধান ও অর্জনে মানুষ নিরলস অনুসন্ধান ও চেষ্টা চালিয়ে যায়।







অস্তিত্বের বড় বড় বাস্তবতার ছায়ায় শান্তির খোঁজ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে,জ্ঞানী বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বিশ্বাস করে যে মানুষকে শান্তির পথে পৌঁছতে হলে অবশ্যই অস্তিত্বের বড় বড় বাস্তবতা বুঝতে হবে। এজন্য তাকে অস্তিত্বের প্রধান প্রধান বিষয় তথা জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কে সঠিক চিন্তাধারার মাধ্যমে শান্তির পথ খুঁজতে হবে।

১- মানুষ

কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি?!

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর।} [সূরা আল মু'মিন, আয়াতঃ ৬৭]

হ্যাঁ.... তার মূল হলো মাটি আর তুচ্ছ পানি। আর তার পরিণতি হলো নিষ্প্রাণ লাশ। সে তার মাঝে অপবিত্রতা বহন করে বেড়ায়। তার শরীর থেকে যা বের হয় তাও নোংরা ও অপবিত্র জিনিস। এতদসত্বেও সে তার প্রতিপালকের ব্যাপারে ঝগড়াটে, কত অকৃতজ্ঞ!! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে, এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।} [সূরা আবাসাঃ ১৭-২২]

তথাপিও সে অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে সম্মানিত, আল্লাহ তায়া'লা ফেরেশতাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষ আদম [আঃ]

জীবন অসহনীয়

“তিনি আত্মহত্যার আগে শেষ চিঠিতে লিখেছেন জীবন অসহনীয়!! আমাকে ক্ষমা করো”।

ডালিডা
বিশ্ব বিখ্যাত গায়িকা

কে সিজদা করতে বলেছেন। তার জন্য জমিন, পশু পাখি সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাকে জ্ঞান দান করে সম্মানিত করেছেন, যা তাকে এক আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও বিস্ময়কর করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।} [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭০]

অতএব মানুষের মূল উপাদান উক্ত দুটি জিনিসের [তুচ্ছ বস্তু হতে সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সম্মানিত করা] ভাবনা ও চিন্তা ছাড়া বুঝা যাবেনা। এ চিন্তা তার বিশ্বাসের মাঝে সমতা আনয়ন করে, সে যে ইজ্জত-সম্মান, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি যা কিছুই অর্জন করুক না কেন তার সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়া'লার দয়া ও করুনা ছাড়া কিছুই না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর।} [সূরা নাহলঃ ৫৩]

মানুষ নিজস্ব সত্তায় এক পিণ্ড মাংস ও কিছু হাড্ডি ছাড়া আর কিছু না। উপকারী ইলম ও সৎকর্ম তাকে সংস্কার ও সভ্য করে সম্মানিত করে তোলে। তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তায়া'লা তাকে এমন এক মহিমান্বিত আমানত বহনের জন্য উপযোগী করে তোলেন যে আমানত তার চারপাশের অন্যান্য সব সৃষ্টিকূল গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহণ করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ।} [সূরা আহযাবঃ ৭২]



উক্ত দুটি হাকিকতের মাঝে সমতার ব্যাপারে মানুষ যখন তার ঈমান ভঙ্গ করে, তখন হয়ত তার মন প্রথম হাকিকতের দিকে তাকাবে, তখন সে নিজেকে নিছক একটা শরীর, নোংরা আবর্জনা ও খেল তামাশা, খামখেয়ালীপনা দেখতে পাবে যার কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই। তখন সে অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় আনন্দ উল্লাস ও মজা করবে। এভাবে সে নিজেকে হীন ও অপমানিত করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা কাফের,তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।} [সূরা মুহাম্মদঃ ১২]

অথবা সে যদি শুধু তার দ্বিতীয় হাকিকতের দিকে তাকায় তখন তা তার আকল বা বিবেকের সীমালঙ্ঘন করে। তখন সে মহান আল্লাহ তায়া'লার দিকেপ্রত্যাবর্তনকে ভুলে অহংকার ও সীমালঙ্ঘনের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।} [সূরা আলাকঃ ৬-৮]

অতএব মানুষ নিজের সম্পর্কে জানা উচিত, সে নিজে নিজের সাথে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। মানুষের দুর্দশা ও কষ্টের অন্যতম কারণ হলো সে নিজেকে জানেনা এবং সমাজে তার অবস্থান কোথায় সে তা জানেনা। সে কে? তার প্রকৃত মর্যাদা কি? তার কি করা উচিত? ইত্যাদি জানেনা।

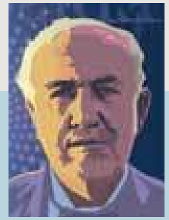


পরিপূর্ণ সমাধান

"ইসলামী শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে মানুষের মানব প্রকৃতি ও প্রকৃত মানবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। সে তার স্বত্বাকে চিনতে পারে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা আমার দিশেহারা সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে"।

রোজ মারি হাউ

ইংরেজ মহিলা সাংবাদিক



স্বীয় ক্ষমতা জানুন

"যদিও মানুষের কাছে তার মর্যাদা সাধারণ হোক, কাজ কর্ম স্বল্প হোক, কিন্তু তিনি- অ্যাডিসন, যিনি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল -তার নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন তার উদ্ভাবনের মাঝে। মানবজাতির কল্যাণে তার অবদান অপরিসীম। আসল কথা হলো তুমি নিজের সাথে নিজে সন্ধি করো, যাতে তুমি নিজে সুখী হতে পারো এবং তুমি নিজেই তোমার মর্যাদা ও দক্ষতা বুঝতে পারো"।

স্বীয় ক্ষমতা জানুন

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ তায়া'লা সমস্ত অস্তিত্বশীল জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টি অনর্থক ও বিফল নয়। তিনি অনর্থক কাজ করা থেকে মহাপবিত্র। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।} [সূরা মু'মিনুনঃ ১১৫-১১৬]

তিনি সৃষ্টিকূলকে তাঁর পূর্নাংগ ইবাদত করতে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সমস্ত কাজ কর্ম, খেলাধুলা, আনন্দ বিনোদন ইত্যাদিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইবাদত শামিল। ইবাদত শুধু নিদর্শন ও চিহ্নগত অর্থে নয়, বরং সামগ্রীক অর্থে জীবনের সবক্ষেত্রেই তাঁর ইবাদত করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।} [সূরা যারিয়াতঃ ৫৬]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ বাস্তবতা জানেনা, সে অজ্ঞতার মাঝে দুর্বিপাক খায়, সন্দেহ, হয়রানিতে ভোগে, ফলে জীবনে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়। তখন তার কাছে সুখ ও ইবাদত ভিন্ন হয়ে যায়, তার পার্থিব জীবন থেকে ইবাদত ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে আখেরাত থেকে দুনিয়া আলাদা হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তায়া'লা আসমান ও জমিনেরর সব সৃষ্টিকূল তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা জাসিয়াঃ ১৩]

মানুষের বুঝা উচিত যে, সে তার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এ পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে প্রেরিত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।} [সূরা আন'আমঃ ১৬৫][



২- জীবন

মানুষ তার অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ জানলে সে নিজেই জীবনের প্রকৃত অবস্থা জানতে চিন্তা গবেষণা করবে, কেননা তাকে এ স্বভাব প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবনই মানুষের মৌলিক জিনিস, দুনিয়ার সমস্ত মজা, আনন্দ আয়েশ এর দ্বারাই হয়। জীবনের উপর নির্ভর করেই মানুষের অন্তর যা করতে আগ্রহী ও যেসব জিনিসের দিকে ঝোঁকে সে সব কাজ করার আকাংখা হয়। তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য কি?! জীবন মরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা, কে তাদের মাঝে কর্মে শ্রেষ্ঠ তা জানা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।} [সূরা মুলকঃ ২]

ইহাই হলো মানুষের প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানেনা। হ্যাঁ.. ইহাই দুনিয়ার জীবনের হিকমত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষন করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার করে দিল যেন কাল ও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে।} [সূরা ইউনুসঃ ২৪]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান।} [সূরা কাহফঃ ৪৫]

আমরা যে জীবনে জীবিত আছি তা অতিক্রম করার পথ, স্থায়ী সময় নয়। ইহা আখেরাতের জীবনের সাঁকো। পার্থিব জীবনেই মানুষের জীবন শেষ হবেনা। পরকালে আসল জীবন রয়েছে। পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকা ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।} [সূরা হাদীদঃ ২০]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা দুনিয়ার যাবতীয় জীবনকে দুর্বল, তুচ্ছ ও মূল্যহীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মানবাত্মাকে এর অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। দুনিয়াকে আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। দুনিয়াকে যদি আলাদাভাবে তার বৈশিষ্ট্যাবলী ও নিজস্ব





পরিমাপে পরিমাপ করা হয় তবে একে অনেক বড় ব্যাপার মনে হবে। আর একে যদি আখেরাতের পরিমাপে মাপা হয় তবে একে খুবই সামান্য, নগণ্য, ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছুই মনে হবেনা। ইহাই সমস্ত বাহ্যিক বড় বড় জিনিসের অন্তর্নিহীত বাস্তবতা। হ্যাঁ... ইহাই দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা.....। ইহাই প্রকৃত অবস্থা যখন মানুষের অন্তর গভীরভাবে বাস্তবতা জানতে চিন্তাভাবনা করবে। তবে দুনিয়ার জীবনের এ বাস্তবতাকে পবিত্র কোরআন আলাদা বা ছিন্ন করতে বলেনি, পৃথিবী আবাদ ও দুনিয়ার পরিচালনাকে গুরুত্বহীন বা অবমূল্যায়ন করতে বলেনি। কোরআন শুধু মানুষের অনুভূতি, মানসিক মূল্যায়নকে সঠিক করার উদ্দেশ্য নিয়েছে, দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী ভোগবিলাস ও আকর্ষণের চাকচক্যের উপরে উঠতে বলেছে। কেননা দুনিয়া শুধুমাত্র একটি সেতু যার উপর দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকূল আখেরাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ দুনিয়া খুবই ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী যা চিরস্থায়ী আখেরাতের তুলনায় কিছুই না। যেখানে মানুষ তার প্রতিদান পাবে। এছাড়া চিরস্থায়ী আখেরাতের ফলাফল মানুষের দুনিয়ার জীবনের উপরই নির্ভর করে। অতএব দুনিয়া সর্বদাই পরীক্ষার জায়গা। এখানে ভোগ বিলাস, আনন্দ-মজা বা দুঃখ কষ্ট, ব্যথা বেদনা ও দুর্দশা সব কিছুই সামান্য কয়েক দিনের জন্য, যা অতি দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। তার চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ধারনে সমস্ত আমলনামাই



কিয়ামতের দিনে দাড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। তাহলে তুমি কবরে কি নিয়ে যাচ্ছ? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ,আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম,তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের কে দেখছি না। যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে,তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে।} [সূরা আন'আমঃ ৯৪]

অধিকাংশ মানুষের কি হলো তারা এ প্রকৃত অবস্থা থেকে গাফিল! ইহাই আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।} [সূরা রূমঃ ৭]

এটা কিভাবে সম্ভব! যারা পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট থাকে আর তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করেনা?! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।} [সূরা ইউনুসঃ ৭-৮]

কি অবস্থা হবে তাদের যারা পরকালের উপর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়?!! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে, এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।} [সূরা নাজিয়াতঃ ৩৭-৪১]

হ্যাঁ, কেননা তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।} [সূরা আ'রাফঃ ৫১]

হ্যাঁ, যেহেতু তারা এর বিনিময়ে বক্রতা অন্বেষণ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।} [সূরা ইবরাহীমঃ ৩]

এর অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়ার জীবনকে অবজ্ঞা করে জ্ঞান বিজ্ঞান ও কাজ কর্মের দ্বারা পৃথিবীর পরিচালনা ও আবাদ ছেড়ে দিয়ে বৈরাগ্য ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে আর মউতের অপেক্ষা করবে। এটা কখনও নয়... বরং উত্তম পথ হলো দুনিয়াকে সাথে নিয়েই চলা ও কাজ কর্ম করা যেভাবে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।} [সূরা কাসাসঃ ৭৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝ না?} [সূরা কাসাসঃ ৬০]

এসব পরিপূরক চিন্তাভাবনা মানুষের কাছে জীবনকে অনেক মূল্যবান জিনিস করে তুলে যা তাকে বিনিয়োগ করা ও কাজে লাগানো অত্যাবশ্যকীয় করে। মৌলিকভাবে ইহা পরকালের স্থায়ী সুখ শান্তির জীবনের সেতু হওয়ার বেশি গুরুত্ব রাখেনা। আর দুনিয়ার সৌন্দর্য, চাকচিক্য ইত্যাদি যা কিছু আছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ





প্রশ্ন করো... কোরআন তোমার উত্তর দিবে

"আমি কোরআন নিয়ে গবেষণা করেছি, ফলে এতে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি"।

মাইক টাইসন

বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা

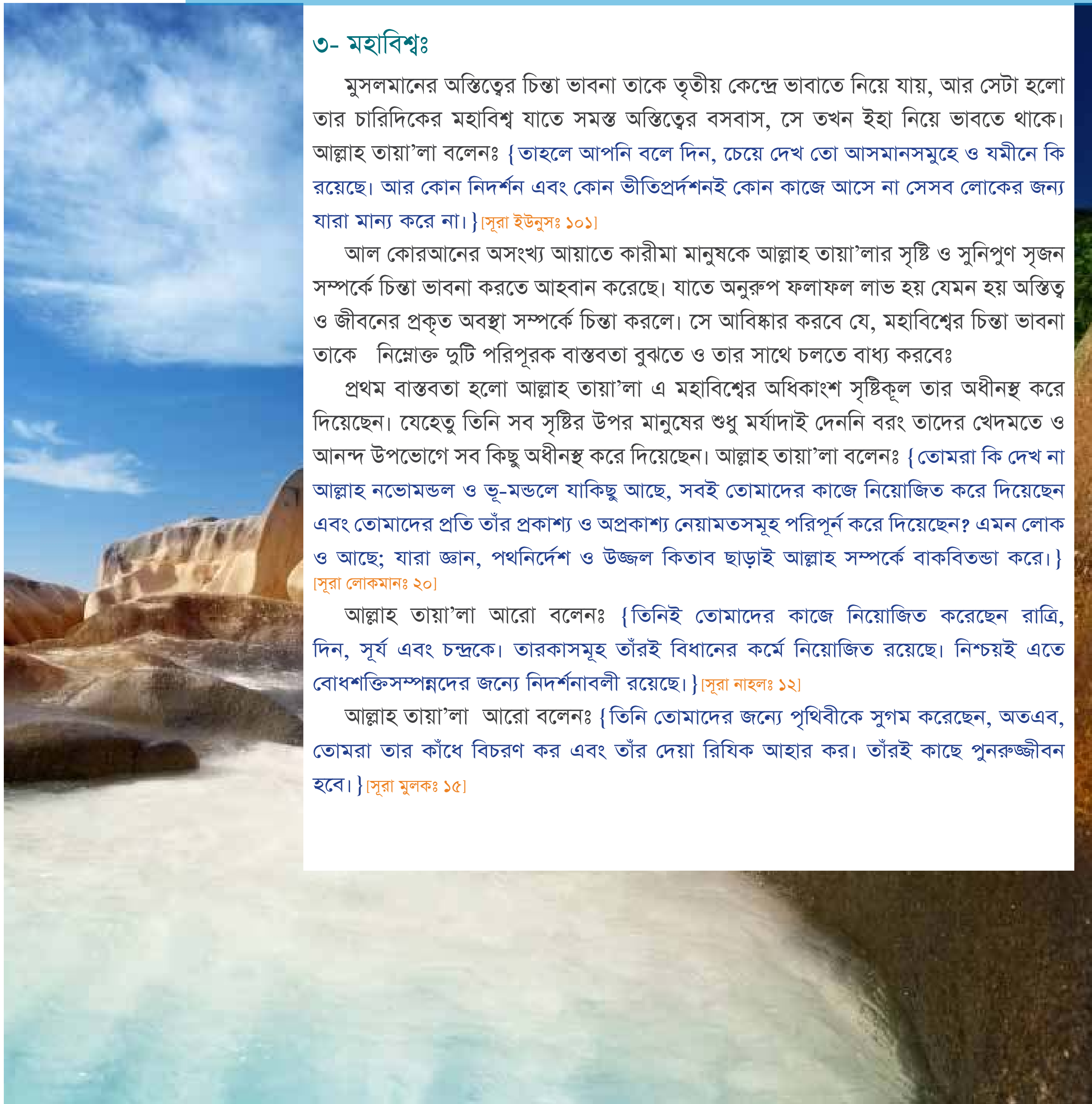
{মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী,সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব,গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৪]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।} [সূরা কাহফঃ ৪৬]

ইহার সুন্দর ব্যবহার জানলে প্রকৃত পক্ষে কেউ একে অপছন্দ করতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্রবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুনঃ এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বুঝে।} [সূরা আ'রাফঃ ৩২]

এ ভাবনা ও বিশ্বাসই একজন মুসলমানকে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও পার্থিব অংশ ব্যবহারে পরিচালিত করে। সে সর্বদা বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছুর মালিক তা অস্থায়ী। সে সর্বদা অপচয় ব্যতীত এগুলো ভোগ করে। তার অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস থাকে যে, দুনিয়ার যা কিছুর সে মালিক তা তার হাতের মুঠোয়, অন্তরের মাঝে তার স্থান নয়। তার থেকে যা ছুটে যায়, বা যে সব বিপদ আপদ আসে তা তার ক্ষতি করতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যaে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।} [সূরা হাদীদঃ ২২-২৩]

এভাবে মুসলমান আনন্দ, ভোগ-বিলাস ও সৌন্দর্য উপভোগ করে, সাথে সাথে তার জন্য মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে রয়েছে প্রতিদান। তার কাছে দুনিয়া আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত, দৈহিক ও শারীরিক আনন্দ উপভোগ অন্তরের আনন্দের সাথে যুক্ত, দুনিয়ার ভোগের মাধ্যমে অর্জিত সুখ শান্তি তার অভ্যন্তরীণ পরিতুষ্টি ও প্রশান্তির সাথে সম্পৃক্ত।



৩- মহাবিশ্বঃ

মুসলমানের অস্তিত্বের চিন্তা ভাবনা তাকে তৃতীয় কেন্দ্রে ভাবাতে নিয়ে যায়, আর সেটা হলো তার চারিদিকের মহাবিশ্ব যাতে সমস্ত অস্তিত্বের বসবাস, সে তখন ইহা নিয়ে ভাবতে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমুহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রদর্শনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না।} [সূরা ইউনুসঃ ১০১]

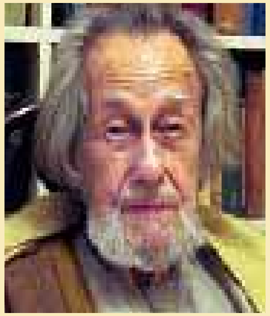
আল কোরআনের অসংখ্য আয়াতে কারীমা মানুষকে আল্লাহ তায়া'লার সৃষ্টি ও সুনিপুণ সৃজন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে আহবান করেছে। যাতে অনুরূপ ফলাফল লাভ হয় যেমন হয় অস্তিত্ব ও জীবনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে। সে আবিষ্কার করবে যে, মহাবিশ্বের চিন্তা ভাবনা তাকে নিম্নোক্ত দুটি পরিপূরক বাস্তবতা বুঝতে ও তার সাথে চলতে বাধ্য করবেঃ

প্রথম বাস্তবতা হলো আল্লাহ তায়া'লা এ মহাবিশ্বের অধিকাংশ সৃষ্টিকূল তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন। যেহেতু তিনি সব সৃষ্টির উপর মানুষের শুধু মর্যাদাই দেননি বরং তাদের খেদমতে ও আনন্দ উপভোগে সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন? এমন লোক ও আছে; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে।} [সূরা লোকমানঃ ২০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা নাহলঃ ১২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।} [সূরা মুলকঃ ১৫]





মানবতার ধর্ম

“আমার পুরা জীবনে নিজের যে স্বত্বা হারিয়েছি তা আমি ইসলামে পেয়েছি। সে সময় আমি প্রথম অনুভব করেছি যে, আমি একজন মানুষ। ইহা এমন এক ধর্ম যা মানুষকে তার মূল প্রকৃতির দিকে ফিরে নিয়ে যায়। কেননা ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে একমত”।

মার্টিন লিঞ্জ

ইংরেজ চিন্তাবিদ

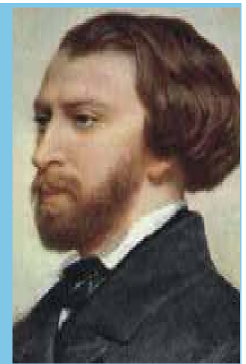
মহাবিশ্বকে যে মানুষের জন্য অধীনস্থ করে দিয়েছে সে ব্যাপারে মুসলমান কোরআনে অনেক আয়াতে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ পাবে। এতে মহাবিশ্বের প্রতি নতুন করে ভাবনা চিন্তা করার সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে। এবং নানা বিপর্যয় ও দুর্যোগে ধৈর্যহারা হতে নিষেধ করার অন্তর্দর্শন রয়েছে। প্রকৃতি সর্বদা দুর্বল মানুষের সাথে বিরোধে লিপ্ত নয়। আবার মানুষও সর্বদা প্রকৃতির উপর জয়লাভ করতে বিরোধে লিপ্ত নয়।

আর দ্বিতীয় বাস্তবতা হলোঃ মহাবিশ্বের সব রহস্য এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত নয়। ইহাকে মানুষের অধীনস্থ করে দেয়ার পরেও এতে অনেক জীব ও প্রাণী রয়েছে যা মানুষের অনুধাবনের বাহিরে বা তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে অক্ষম। যেমনঃ মহাবিশ্বে অসংখ্য ফেরেশতা ও জ্বীন জাতির বিচরণ। এতে আরো অনেক সৃষ্টি রয়েছে যা মানুষের পক্ষে এর প্রকৃত অবস্থা অজানা অথবা সে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই অজ্ঞ। এ মহাবিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব নিছক একটি ছোট পরমাণুর মতই, যা বড় বড় সৃষ্টির সামনে অনুল্লেখযোগ্য প্রায়।

উপরোক্ত দুটি বাস্তবতা মহাবিশ্ব সম্পর্কে মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিপূর্ণ করে। সে সমস্ত সৃষ্টির মাঝে তার মর্যাদা বুঝতে পারে, যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা তাকে সৃষ্টির মূল কেন্দ্রবিন্দু করেছেন, অন্যান্য সৃষ্টিকূল তার অধীনস্থ করেছেন। একই সময় সে জানে যে আরো অনেক কিছুর প্রকৃত রহস্য তার সামনে অজ্ঞাত। তার ক্ষমতা ও সক্ষমতা যতই উচ্চে পৌঁছুক, সে কখনও সে সবের ধারে কাছেও যেতে পারবেনা।

আর মানুষের চারপাশে বিদ্যমান অন্যান্য জিনিসের সাথে তার সম্পর্ক হলো সুসংগঠিত ও গভীর শিষ্টাচারীতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। অতঃএব যারা চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে বিশৃঙ্খলার জীবন যাপন করে তারা দুর্ভোগ, দুর্দশা, কষ্টে থাকে, না পারে একে ছেড়ে চলে যেতে, আর না পারে ইহার সঙ্গে মিলে চলতে। কেননা তাদের সম্পর্ক হলো অসম ও বিশৃঙ্খল। ফলে তাদের সম্পর্ক স্বার্থপরতা,খলতা, খারাপ অনুমান,ষড়যন্ত্র এবং অপরের অনিষ্টতা ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সব কিছু মানুষকে অসুখী ও অসন্তুষ্ট করে তোলে। তাকে মানসিক টেনশন, উত্তেজনা ও কঠিন কষ্টে ভোগায়। সে সর্বদা টেনশন ও উত্তেজনায় থাকে। তাহলে কোথা থেকে তার সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ আসবে?! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শুত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।} [সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াতঃ ৩৪-৩৫]

অন্যদিকে যে সব মানুষ তার জীবনকে সুশৃঙ্খল করেছে ও অন্যান্যের সাথে তার সম্পর্ক অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্যের ভিত্তিতে গড়েছে, সে সর্বদা তার দায়িত্ব পালন করে। অধিকার আদায়ে সহজতা করে, তার প্রতিপক্ষের ভুলত্রূটি মার্জনা করে । নিঃসন্দেহে সে একজন সুখী মানুষ। মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মায়া মমতা শ্রেষ্ঠ পন্থা। মায়া মমতা হলো ভালবাসা, অন্তরঙ্গতা এবং ব্যাকুল কামনা। এ সব কিছুই মানুষের সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি।



সম্মান ও আখলাকের ধর্ম

“এজন্য ইসলামের আঙ্গিনায় ও ছায়াতলে শান্তি অনুভব করতে আমি ইসলামকে নির্বাচিত করেছি.........হ্যাঁ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি অনুভব করেছি ও বুঝেছি যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা রূহ ও শরীর বা দেহ ও আত্মার মাঝে বিচ্ছিন্ন করেনা। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইহা পুতঃপবিত্র ধর্ম, ইহা সচ্চরিত্রের দিকে ডাকে, মানুষের সম্মানের দিকে আহবান করে এবং তা আঁকড়িয়ে ধরতে বলে । এ কারণেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসুল। এবং এ অবস্থার উপরই আমি আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবো”।

ভ্যানন মুস্যেট

ফরাসি চিন্তাবিদ



সৌভাগ্যের পথ.... মানুষের নিজের সাথে, জীবন ও মহাবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করাঃ

এ বিশ্বাসে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার সাথে, নিজের ও তার চারপাশের মহাবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে চলে। সে প্রথমেই আল্লাহর ইবাদতের হাকিকত জানতে পারে, তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কর্তব্য আদায় করে। দ্বিতীয়ত সে নিজের এ মর্যাদা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়া'লা তাকে অন্যান্য সৃষ্টির সেরা করেছেন, সব সৃষ্টি তার অধীনস্থ করেছেন। তাকে যে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে ফিরে যাওয়ার পূর্বে জমিনে তাকে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এ পৃথিবীর আবাদ কাজ তার উপর অর্পিত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই।} [সূরা হুদঃ ৬১]



ইসলামের নিয়ামত

"মানুষ দুনিয়াতে যে সব নিয়ামত ভোগ করে তার মধ্যে আল্লাহ তায়া'লা ইসলামের জন্য তার অন্তরকে সম্প্রসারিত করে দেয়ার চেয়ে বড় কোন নিয়ামত নাই। ফলে সে আল্লাহর হিদায়েতের আলোয় দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা দেখতে পায়, বাতিল থেকে হককে, দুঃখ দুর্দশার পথ থেকে সুখ-শান্তির পথ পার্থক্য করতে পারে। আমি আল্লাহর দরবারে সিজদায় নত হয়ে তার এ মহা নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করি, তিনি আমাকে এ নিয়ামত দান করেছেন, যাতে আমার অন্তর প্রকৃত সুখে পূর্ণ হয়ে গেছে। ইহা আমাকে বিস্তৃত ডালপালাবিশিষ্ট নানা ফলদায়ক বিশাল বৃক্ষের ছায়াতলে থাকার সুযোগ দিয়েছে। ইহা হলো ইসলামের বিস্তৃত ডালপালাবিশিষ্ট বিশাল পরিবার, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব"।

মার্শাল মাইকেলেঞ্জেলো

ব্রিটিশ অভিনেত্রী

সে আরো দায়িত্বপ্রাপ্ত যে, শরিয়তের সীমারেখা মেনে ও প্রয়োজন অনুসারে নিজের ইচ্ছেগুলো পূরণ করবে। স্রষ্টা, আত্মা ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে যখন আমাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস হবে তখন স্বভাবতই আমাদের সামনে কতিপয় ফলাফল এসে দাঁড়াবে, যা আমরা উক্ত ধারণার বাস্তবতা থেকে পেয়ে যাই। মানুষ যখন উক্ত হাকিকতগুলো জানতে পারবে, তখন সে স্বভাবতই বুঝবে যে, ইহ ও পরকালীন সুখ শান্তি আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টি, তার আদেশ মানা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মধ্যেই নিহিত। এতে শারীরিক ও আত্মিক চাহিদার মাঝে সমতা বাস্তবায়িত হবে। ব্যক্তি ও সমষ্টির চাহিদা, দুনিয়া ও আখেরাতের আবাদের মাঝে সমতা আসবে। দুনিয়াতে সে সুখে শান্তিতে থাকবে - সুখ যতই কম হোক না কেন-। কেননা দুনিয়া হলো পরিশ্রম, কর্ম ও পরীক্ষার স্থান। আর আখেরাত হলো হিসেবের স্থান। যে ব্যক্তি সেখানে সফল হবে সেই চিরকাল পূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।} [সূরা তাওবাঃ ২১-২২]



দুনিয়া ও আখেরাতে মানবিক শান্তি, আশ্বস্তি অনুভব ও সুন্দর পবিত্রতম জীবন লাভের জন্য অবশ্যই আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে ও সৎকাজ করতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]



সৌভাগ্যের পথের নিদর্শনসমূহ

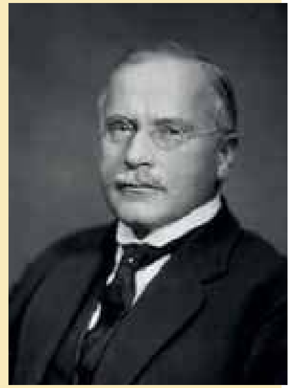
প্রকৃত সৌভাগ্যের পথ চিনতে, যে পথ আল্লাহর প্রতি ঈমানের পথ, আমাদেরকে কতিপয় নিদর্শন ও চিহ্ন বর্ণনা করা দরকার, যাতে চলার পথে আমরা প্রশান্তি ও উঁচু সাহসিকতা পাইঃ

১- ইহা আল্লাহ তায়া'লার পথঃ

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।} [সূরা আন'আমঃ ১৫৩]

অতএব, সুখ ও সৌভাগ্যের পথ হলো বান্দাহর জন্য আল্লাহ তায়া'লার বর্ণনাকৃত পথ। -তিনিই অধিক জ্ঞাত কিসে তাদের কল্যাণ রয়েছে-। নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, হতভাগা ও দুঃখী সেই যে আল্লাহর পথ ছেড়ে দেয়, মানব রচিত বিভিন্ন পথে সুখ অন্বেষণ করে। আল্লাহর রাস্তা ছাড়া অন্য কোন পথে কখনও সুখ আসতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৩-১২৪]

সৌভাগ্য তাদের জন্য যারা আল্লাহর পথে চলে, হিদায়েত অনুসরণ করে, আর তারই জীবিকা সংকীর্ণ হবে যে আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যদিও ব্যহ্যিকভাবে সে অনেক বিখ্যাতজন ও



ঈমান.. ও মানসিক সুস্থতা

"বিগত ত্রিশ বছর ধরে বিশ্বের নানা জাতির বিভিন্ন লোক আমার থেকে চিকিৎসা পরামর্শ নিয়েছে। আমি শত শত লোকের চিকিৎসা করেছি। যারা জীবনের অর্ধেক বয়স পার করেছে অর্থাৎ ৩৫ বছর বা ততোধিক তাদের ক্ষেত্রে আমি একাধিক সমস্যা পেয়েছি, তবে সব সমস্যার মূল একটি কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়, তা হলো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও দ্বীনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকা। এ কথা ঠিক যে, সব রোগীরাই দুরারোগ্য রোগে ভোগে এবং এ থেকে মুক্তি চায়, কেননা তারা মানসিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত, দ্বীন যে প্রশান্তি নিয়ে এসেছে। এ সব রোগীরা ঈমান আনা ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বীনের আদেশ নিষেধ মান্য করা ছাড়া কেউ সুস্থ ও আরোগ্য হয়না"।

কার্ল বিয়াং

বিখ্যাত মানসিক রোগী চিকিৎসক

তারকা। 'দনকা' হলো দুনিয়া ও আখেরাতে জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া ও দুঃখ কষ্টে পতিত হওয়া।

২- ইহা আত্মিক ও শারীরিক সুখের পথঃ

একথা সবাই জানে যে, মানুষ আত্মা ও শরীর নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটির রয়েছে আলাদা আলাদা খাদ্য। কিছু কিছু মতবাদ ও দর্শন শুধু আত্মিক বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেয়, আর শারীরিক চাহিদাকে উপেক্ষা করে। ফলে বিপর্যয় ঘটে। আবার এর বিপরীতে আধুনিক বস্তুবাদ দৈহিক ও পার্থিব চাহিদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় আর আত্মিক চাহিদাকে তারা উপেক্ষা করে। তারা শারীরিক চাহিদার যা ইচ্ছা তাই পূরণ করে। ফলে তা মানবিকতা থেকে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারে পরিণত করে দেয় বা বন্ধ্যা যন্ত্রে পরিণত করে দেয়। অপরদিকে ইসলামের ধ্যান ধারণায় রূহকে আসমানী আলো দিয়ে ভরপুর রাখে অন্যদিকে শরীরের চাহিদাকেও সংরক্ষণ করে, পবিত্র হালাল জিনিস দিয়ে তার প্রবৃত্তি ও ক্ষুধাকে নিবারণ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ।}[সূরা কাসাসঃ ৭৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম হযরত সালমান ফারেসী [রাঃ] কে বলেছেনঃ "নিশ্চয় তোমার রবের প্রতি রয়েছে তোমার হক বা কর্তব্য, তোমার নিজের প্রতি রয়েছে তোমার দায়িত্ব, তোমার পরিবার পরিজনের প্রতি রয়েছে তোমার দায়িত্ব। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দাও"। [বুখারী শরীফ][

[৩- ইহা সৌভাগ্য ও বীরত্বের পথঃ

যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে তাকে কোন কিছুই এ পথ থেকে আলাদা করতে পারেনা, এমনকি তার ঘাড়ে তলোয়ার ধরেও। লক্ষ্য করুন ফেরাউনের যাদুকরদের দিকে যারা ঈমান আনলে, সৌভাগ্যের পথে চলা শুরু করলে ফেরাউন তাদেরকে শাস্তির ধমক দিল, তাদেরকে যা বলল তা কোরআনের ভাষায় এভাবে এসেছেঃ {অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিত রূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিক্ষণ স্থায়ী।}[সূরা তোয়াহাঃ ৭১]

কিন্তু তাদের জবাব ছিল সত্য ধর্মে অটল ও স্থীর থাকা। আল কোরআনে তাদের জবাব এভাবে এসেছেঃ {যাদুকররা বললঃ আমাদের কাছে যে, সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে।}[সূরা তোয়াহাঃ ৭২]

শুধুমাত্র ঈমান আনার কিছুক্ষন পরেই তারা অটল ও স্থির রইল, কেননা তারা ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছিল, যে ঈমান তাদের রায় ও সিদ্ধান্তকে পূর্ণ প্রশান্তিময় ও স্থীর করে দিল। এমনকি হত্যার হুমকি সত্বেও।

৪- সুখ হলো অন্তরের প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততাঃ

প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা ছাড়া সুখ হয়না। আবার প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা ঈমান আনা ছাড়া আসেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।}[সূরা ফাতহঃ ৪]

অতএব আল্লাহর উপর ঈমান মানুষকে দুদিক থেকে সুখ শান্তি এনে দেয়ঃ প্রথমতঃ ব্যভিচার ও অপরাধের জলাভূমিতে পিছলে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করে। আর এগুলো হলো দুঃখ, দুর্দশার সবচেয়ে বড় কারণ। আল্লাহর প্রতি ঈমান ব্যক্তির ইচ্ছা ও কামনা শক্তিকে ধ্বংসাত্মক পথ থেকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ ইহা ব্যক্তিকে সুখ-শান্তির সবচেয়ে বড় শর্ত পূরণ করে, তা হলো প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা। সীমাহীন বিপদাপদ ও সমস্যায় জর্জরিত হলে ঈমান ছাড়া উত্তরণের কোন পথ নেই। ঈমান ছাড়া ভয়ভীতি ও উদ্বেগের কারণসমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ঈমানদার হলে একমাত্র মহান আল্লাহ তায়া'লার সামনে দাঁড়ানোর ভয় ছাড়া কোন ভয় ভীতি থাকে না।

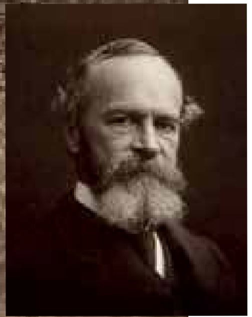


পরিপূর্ণ জবাব

"আমি আত্মা ও দেহের সমস্যা সম্পর্কে ইসলামে পরিপূর্ণ সমাধান পেয়েছি। ফলে আমি জেনেছি, রূহের মত শরীরেরও কিছু হক রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শারীরিক চাহিদাসমূহ স্বাভাবিক সহজাত যা নিবারন করতে হয়, যাতে মানুষ শক্তিশালী, উৎপাদনশীল ও কার্যকর হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে। তবে ইসলাম এ সব সহজাত প্রবৃত্তি সঠিকভাবে নিবারনের ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছে, এতে মনের সন্তুষ্টি ও আল্লাহ তায়া'লার আদেশ মান্য করা বাস্তবায়িত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলামে বিবাহ হলো যৌন চাহিদা পরিতৃপ্তির একমাত্র বৈধ উপায়, এমনিভাবে নামাজ, রোজা, ইবাদত, আল্লাহর প্রতি ঈমান ইত্যাদি মানুষের আত্মিক চাহিদা পূরণের অন্যতম মাধ্যম। এভাবেই সম্মানজনক উত্তম জীবন যাপনের জন্য ভারসাম্য বাস্তবায়িত হয়"।

রোজ মারি হাউ

ইংরেজ মহিলা সাংবাদিক



ঈমান ও উদ্বেগ কখনও একত্রিত হয়না

"উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ কখনও সমুদ্রের গভীর তলদেশের প্রশান্তিকে ঘোলা করেনা এবং ইহা তলদেশের নিরাপত্তাকে অস্থির করেনা। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর যথাযথ ঈমান এনেছে, সে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পরিহার করে চলে ভারসাম্যতা রক্ষা করে এবং আগামী দিনে যা কিছুই আসুক তার মোকাবিলায় সে সর্বদা প্রস্তুত থাকে"।

উইলিয়াম জেমস

মার্কিন দার্শনিক

মু'মিনের অন্তর সব সমস্যা ও বিপদকে তুচ্ছ মনে করে। কেননা সে মহান আল্লাহ তায়া'লার উপর ভরসা করে। আর ঈমানহীন অন্তর ডাল থেকে ঝড়ে পড়া পাতার ন্যায়, বেপরোয়া বাতাস যাকে নিয়ে যা খুশী খেলা করে। মানুষ মৃত্যু ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার চেয়ে আর কোন জিনিসকে বেশি ভয় করে?! মু'মিনের নিকট তা ভয়ের কোন কারণ নয়, বরং তা প্রশান্তির কারণ, কেননা যার অন্তর ঈমান ও তাকওয়ায় ভরপুর তার মৃত্যু কতইনা লাভজনক!!

ঈমান মানুষের সত্তার মাঝে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয়। মু'মিন ব্যক্তি নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে আল্লাহর পথে চলতে থাকে। কেননা তার সঠিক ঈমান সর্বদা তার মাঝে মহান আল্লাহর সাহায্য, হেফাযত ও সংরক্ষণের আশা বৃদ্ধি করে। সে সর্বদা অনুধাবন করে যে, মহান আল্লাহ তায়া'লা সর্বক্ষণ তার সাথেই আছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {জেনে রেখ আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে।} [সূরা আনফালঃ ১৯]

সুতরাং মুমিন ব্যক্তি যতই সমস্যায় পড়ুক, যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হোক, মনের সব ওয়াছওয়াছা ও দৈহিক দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রান পেতে হেদায়েতের আলোর দিশায় আলোকিত আল্লাহর কিতাব তার জন্য যথেষ্ট। তখন ভয়-ভীতি নিরাপত্তা ও শান্তিতে পরিণত হয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট সুখ ও খুশীতে ভরে যায়। এভাবেই মানসিক নিরাপত্তা ও আত্মিক শান্তি প্রাপ্তির পথ দেখায়, যা অন্য যে কোন সুখের সমান হয়না। যদিও সে দুনিয়ার অঢেল ধন সম্পত্তির মালিক হয়।

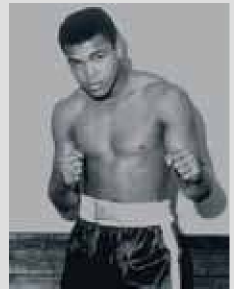
৫- দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে সুখের ভ্রমণঃ

প্রকাশ থাকে যে, মানুষের জীবন তিনটি স্তরে বিভক্তঃ প্রথমতঃ দুনিয়ার জীবন, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরে কবরের জীবন, আর তৃতীয়তঃ কিয়ামতের দিবস। সুখ শান্তি ও সৌভাগ্যের পথ এ তিনটি ধাপ পার হয়। দুনিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]

অর্থাৎ অবশ্যই দুনিয়াতে সুখ শান্তিময় পবিত্র জীবন দান করি, যদিও তার সম্পদ কম থাকে। এগুলো হবে আত্মতৃপ্তি, সন্তুষ্টি, অভ্যন্তরীন মানসিক শান্তি, নিশ্চিন্ততা, প্রশান্তি, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান, তার প্রতি আত্মসমর্পণ, ও তার প্রতি দৃঢ় ভরসা ইত্যাদির মাধ্যমে। কবরে মু'মিনের সুখ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা [রাঃ] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "মু'মিনগণ কবরে একটি সবুজ বাগানে থাকবে, তার জন্য কবর সত্তর হাত প্রশস্ত হবে, পূর্ণিমা রাত্রির ন্যায় তার কবর অলোকিত করা হবে"। [আল্লামা আলবানী [রাহঃ] হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]।



নিরাপত্তা লাভ

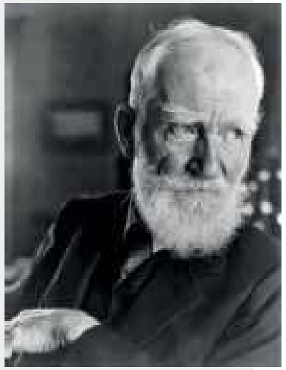


"একজন মুসলমান যখনই গভীরভাবে কোরআন পড়বে এবং যথাযথভাবে ইহার শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করবে, তখন সে ইসলামের যাত্রাপথে নিরাপদ যাত্রী হলো, স্থিতিশীলতা ও শান্তির বাহনে আরোহন করল এবং শয়তানের ধোঁকা ও খারাবী থেকে দূরে রইল"।

ক্যাসিয়াস মারকেলাস ক্লে

মার্কিন মুষ্টিযোদ্ধা

দুনিয়া ও আখেরাতের ধর্ম



"একজন প্রকৃত জ্ঞানীলোক স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের দিকে ধাবিত হবে। কেননা ইহা একমাত্র ধর্ম যা দুনিয়া ও আখেরাতের সব বিষয়ে সমানভাবে খেয়াল রাখে"।

বার্নার্ড শ

ইংরেজি লেখক

আখেরাতে তার সুখ শান্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।} [সূরা হুদঃ ১০৮]

তারা দুনিয়াতে সুখ শান্তি লাভে সফল হয়েছেন, আর আখেরাতে স্থায়ী সুখ শান্তি লাভেও সফল হবেন।

অতএব, ইসলাম চিরস্থায়ী সুখ শান্তি নিয়ে এসেছে। মানুষের পার্থিব জীবনের সুখ, আর পরকালীন জীবনের চিরস্থায়ী সুখ শান্তি। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অধিক উত্তম ও স্থায়ী । বরং আল্লাহ তায়া'লা দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তিকে পরস্পর বেঁধে দিয়েছেন, দুয়ের মাঝে কোন বিতর্ক ও বিরোধ নেই। এ দুনিয়া হলো আখেরাত ও কিয়ামতের দিনের স্থায়ী সুখের পথ মাত্র। এটা একটাই রাস্তা, দুনিয়া ও আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের পথ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন।} [সূরা নিসাঃ ১৩৪]





সরল বিশ্বাস

"ইসলামী বিশ্বাস এমনই এক সাধারণ বিশ্বাস যা সমস্ত হয়রানী, বিভ্রান্তি ও ভয় থেকে ঈমানদারকে মুক্ত রাখে। সবার অন্তরে প্রশান্তি বয়ে যায়। এ বিশ্বাসের দরজা সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। জাতি বা বর্ণের কারণে এর থেকে কেউ বাঁধা দিতে পারেনা। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এ বিশ্বাসের ছায়াতলে সমতা ও ন্যায্যতা পেয়ে থাকে, যেখানে তাকওয়া ছাড়া কোন অগ্রাধিকার ও সম্মান নেই, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাকওয়া"।

নাজমি লুক

মিশরী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ

ইসলামে পার্থিব সুখ শান্তি লাভের উপায়সমূহঃ

ইসলামে পার্থিব সুখ শান্তি লাভের অনেকগুলো উৎস ও উপায় রয়েছে, সেগুলো হলোঃ

১- আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের মাধ্যমে সৌভাগ্যলাভঃ

তাওহীদের শান্তি ও নিশ্চিন্ততার মত আর কোন সুখ শান্তি, আরাম ও নিশ্চিন্ততা নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।} [সূরা আন'আমঃ ৮২]

এজন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে তাওহীদের পরিপূর্ণতা মোতাবেক নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও সুখ অর্জিত হয়। যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা তাওহীদবাদীর বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং তাতে সুখ ও আনন্দ দিয়ে দেন। অন্যদিকে শিরক -আল্লাহ পাকের নিকট ইহা থেকে পানাহ চাচ্ছি-ব্যক্তিকে দুঃখ, দুর্দশাগ্রস্থ করে ও তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেয়, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।} [সূরা আন'আমঃ ১২৫]

অতএব এ দু'ধরণের লোক কখনও সমান হতে পারেনা, যাদের বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর হেদায়েতে ও আলোর দিশা পেয়েছে, আর যারা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত, আল্লাহর জিকির থেকে দূরে







প্রকৃত নিরাপত্তা

“মুসলমানেরা নামাজে যা অনুভব করে আমিও তা অনুভব করিঃ সুমিষ্ট ঐকতান ও আনন্দের শিহরণ। এ সব কিছুতে আমি ঈমানের অনুগ্রহ অনুভব করে থাকি। এমনিভাবে আমার সন্তানেরাও নিরাপদে আছে। সত্যিকারার্থে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনা”।

লোরেন বুথ

ব্রিটিশ মানবাধিকার মহিলা কর্মী

থাকে ও তাদের অন্তর কঠোর, তারা সুস্পষ্ঠ গোমরাহীতে রয়েছে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। [সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়] যাদের অন্তর আল্লাহ স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দূর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ঠ গোমরাহীতে রয়েছে।} [সূরা যুমারঃ ২২]

আর যে শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও মৃত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তায়া’লা তাঁর করুণা ও রহমতে হিদায়েত দান করেছেন সে ব্যক্তি কখনও ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারেনা, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি,যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। } [সূরা আন’আমঃ ১২২]

২- আল্লাহর জিকির, তাঁরই সমীপে মুনাজাত ও তাঁর নৈকট্যলাভঃ

মানুষকে যতই পার্থিব সৌন্দর্য দান করা হোক, সে যতই সৌভাগ্যের অধিকারী হোক, আল্লাহর পথ থেকে দূরে থাকলে সে কখনও সুখ শান্তি লাভ করতে পারবেনা। অতএব আল্লাহর সান্নিধ্য ও তাঁর জিকির ব্যতীত মানুষের প্রশান্তি আসতে পারেনা। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।} [সূরা রা’দঃ ২৮]

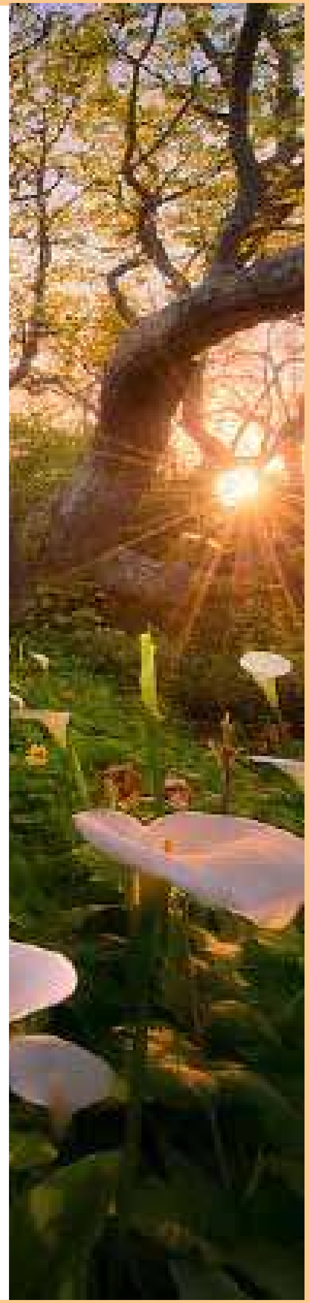


কেননা অন্তরে রয়েছে অনেক এলোমেলো ভাবনা, যা আল্লাহর সান্নিধ্য না পেলে সুসজ্জিত হয়না। এতে রয়েছে একাকীত্ব, যা নির্জনে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছাড়া দূরীভূত হয়না। এতে রয়েছে দুশ্চিন্তা, যা আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান ও সঠিক আচরনের মাধ্যমে আনন্দ ব্যতীত দূর হয়না। এতে রয়েছে উদ্বেগ ও পেরেশানী, যা তাঁর সাথে মিলিত হওয়া ও তাঁর নিকট যাওয়া ব্যতীত প্রশান্তি পেতে পারেনা। এতে রয়েছে দুঃখ-অগ্নি, যা তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করা, তাঁরই ফয়সালা মেনে নেয়া ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা ব্যতীত নিভেনা। এতে রয়েছে অনেক চাহিদা ও ইচ্ছা, যা তাঁর ভালবাসা, সান্নিধ্য, সার্বক্ষণিক জিকির ও একনিষ্ঠতা ব্যতীত থামেনা। অন্যথায় যদিও তাকে দুনিয়ার সব কিছু দান করা হয় তথাপিও তার অভাব কখনও পূরণ হবেনা (মাদারিকে সালেকিন, ইবনে কাইয়ুম, পৃষ্ঠাঃ ৭৪৩।)

৩- সৎকাজ করাঃ

আল্লাহ তায়া’লা বলেছেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তণস্থল।} [সূরা রা’দঃ ২৯]

অতঃএব, যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়া’লা, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও কিয়ামতের দিবসের উপর ঈমান এনেছে, অন্তরের সৎকাজের মাধ্যমে এ ঈমানকে সত্যে পরিণত করেছে, যেমনঃ আল্লাহর ভালবাসা, তাঁর ভয় ও আশা ইত্যাদি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল যেমনঃ নামাজ ইত্যাদি সম্পাদন করেছে, তাদের রয়েছে পরিপূর্ণ আরাম ও প্রশান্তির উত্তম পরিণতি। এভাবেই তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়া’লার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। অতঃএব, আমাদেরকে ঈমানের সাথে সৎকাজও করতে হবে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।} [সূরা মায়েদাঃ ৬৯]



রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম নামাজ ও আল্লাহর ইবাদাতে প্রশান্তি ও মজা পেতেন। তিনি বলতেনঃ “হে বিলাল নামাজের আহবান কর, আমাদেরকে এর মাধ্যমে শান্তি দাও”। [আবু দাউদ শরীফ]।

৪- দান খয়রাত সুখ-শান্তির গোপন রহস্যঃ

এ ব্যাপারটা পরীক্ষিত ও দৃশ্যমান। কেননা আমরা দেখি, যারা অন্যের প্রতি দান সদকা করে, ইহসান করে তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী ও গ্রহণযোগ্য মানুষ। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যদি কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।}[সূরা আলে ইমরানঃ ৯২]

দান খয়রাতের অনেক ধরণ আছে, আল্লাহ তায়া’লা কিছু দান সদকা ইসলামের রুকন করেছেন। ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। তিনি হুকুম করেছেন এ দান হতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সর্বোত্তম ইখলাসের সাথে, আবার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে মানুষকে খোটা দেয়া যাবেনা। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না।}[সূরা বাকারাঃ ২৬৪]

বরং এ দান সদকা শুধু মালের মধ্যে সীমিত না রেখে সব ধরণের দানকে শামিল করেছেন, তা ধন সম্পদ হোক, বা খাদ্য বা পরিশ্রম বা অন্য কোন কাজ। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।}[সূরা দাহারঃ ৮-৯]

এমনকি শুধু মুচকি হাসিও। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ “তোমার ভাইয়ের সম্মুখে মুচকি হাসিও তোমার জন্য সদকা”। [তিরমিজি শরীফ]। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম আরো বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তায়া’লাও তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন, কেউ যদি কোন মুসলমানের একটি বিপদ দূর করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়া’লাও তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে মুসলমানের দোষ-ত্রূটি গোপন রাখে, আল্লাহ তায়া’লাও কিয়ামতের দিনে তার দোষ-ত্রূটি গোপন রাখবেন”। [আবু দাউদ শরীফ]। নিঃসন্দেহে এ ধরণের দান সদকা দুনিয়াতে সুখ শান্তি অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়। অন্যদিকে পার্থিব স্বার্থে বা খোটা ও কষ্টের দ্বারা যে দান সদকা করা হয় তাতে সুখের কিছুই অর্জিত হয়না, যদিও বাহ্যিকভাবে অন্যকিছু অর্জিত হয়।

৫- আল্লাহর উপর ভরসা সৌভাগ্যের চাবিকাঠিঃ

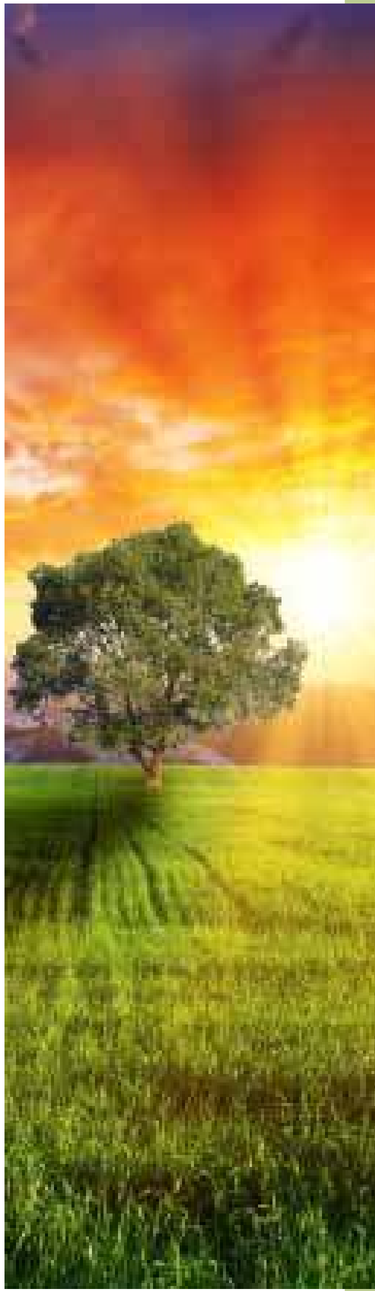
মানুষ অনেক সময়ই কোন ব্যাপারে অক্ষমতা ও সামর্থ্যহীনতা অনুভব করে। তখন তার চাহিদা পূরণে তার চেয়ে শক্তিশালী কারো সাহায্য কামনা করে ও তার উপর ভরসা করে। আল্লাহ তায়া’লার চেয়ে কে অধিক শক্তিশালী?! নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়া’লার উপর ভরসাই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। যিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন,তখন তাকে কেবল বলে দেন,‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়।}[সূরা ইয়াসিনঃ ৮২]

এজন্যই আল্লাহ তায়া’লা একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।} [সূরা মায়েদাঃ ২৩]

আল্লাহর ভরসা ও তাঁর যথেষ্টতার চেয়ে কি উত্তম ভরসা হতে পারে? বান্দাহর জন্য আল্লাহই হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর, আল্লাহ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী।} [সূরা নিসাঃ ৮১]

নিঃসন্দেহে ইহা তার জন্য শান্তি, আরাম, সুখ, সৌভাগ্য ও যথেষ্টতা আনয়ন করে এবং সে যা অভিজ্ঞতা ছাড়া জানেনা তা সম্পাদন করে দেয়। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।}[সূরা তালাকঃ ২-৩]

তাছাড়া আল্লাহ তায়া’লা তাঁর উপর ভরসাকারীকে শয়তানের থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালন কর্তার উপর ভরসা রাখে।}[সূরা নাহলঃ ৯৯]



শত্রুর থেকেও রক্ষা করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৩-১৭৫]

তাওয়াক্কুলের রহস্য ও বাস্তবতা হলো একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার উপর আন্তরিক নির্ভরশীলতা। অন্তরে তাওয়াক্কুলের সাথে কোন কাজের উপকরণ গ্রহণ করাতে কোন ক্ষতি নেই। এমনিভাবে কারো কথা, অন্যের উপর নির্ভর করে যদি বলে, আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি, তবে তা কোন কাজে আসবেনা। মুখের তাওয়াক্কুল এক জিনিস আর অন্তরের তাওয়াক্কুল অন্য জিনিস।

৬- সুখ শান্তি হলো আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থায়ঃ

আল্লাহর উপর ঈমান মু'মিনকে তাঁর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা এনে দেয়। যা তাকে আত্মবিশ্বাস ও আস্থা জোগায়। ফলে এ দুনিয়াতে সে কিছুই ভয় পায়না। সে জানে যে, সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।} [সূরা আন'আমঃ ১৭]





"বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যকে সাহায্য করা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। মানসিক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন যে, অন্যকে সাহায্য করলে স্নায়ু চাপ কমে, কেননা অন্যকে সাহায্য করলে "এন্ডোফিন" নামক হরমোন নিঃসরিত হয়। এ হরমোন মানুষের আত্মিক শান্তি ও আনন্দ অনুভব করতে সাহায্য করে। আমেরিকার "হেলথ প্রমোশন" ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান অ্যালেন লিক্স বলেনঃ "অপরের সাহায্য করা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। কেননা অন্যকে সাহায্য করলে সে ব্যক্তি দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ব্যক্তি সমস্যা থেকে মুক্ত হয়, ফলে সে মানসিক শান্তি অনুভব করে"।

সে আরো বিশ্বাস করে, তার রিজিক আল্লাহ তায়া'লার হাতে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।} [সূরা আনকাবুতঃ ১৭]

তিনি জমিনে সমস্ত বিচরণশীল জীবজন্তুর রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।} [সূরা হুদঃ ৬]

এমনকি সে যদি রিজিকের কাছে নাও যেতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এমন অনেক জন্তু আছে,যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।} [সূরা আনকাবুতঃ ৬০]

সে বিশ্বাস করে, তার রিজিক অবশ্যই আসবে, ইহা তার অধিকার, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃআল্লাহ তায়া'লা রিজিকসমূহকে মানুষের মাঝে বণ্টণ ও পরিমাপ করে দিয়েছেন।



আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।} [সূরা নিসাঃ ৩৬]

সে আরো দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়া’লা তাকে ভাল-মন্দের ব্যাপারে সর্বদা পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।} [সূরা আম্বিয়াঃ ৩৫]

মানুষের উপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। সে আরো জানে যে, এ দুনিয়াতে সে ক্ষণিকের মেহমান, যতই কম বা বেশি বয়স লাভ করুক না কেন। নিঃসন্দেহে সে অন্য জগতে পাড়ি দিবে। এজন্যই সে এ পৃথিবীতে একটা মূলভিত্তির উপর চলছে, যুগের কোন বিপদাপদে সে ভীত হয়না, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় পায়না। যদিও তার শত্রু তীরের ধনুকের মত বা তার চেয়েও নিকটবর্তী থাকে। যখন ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী মূসা [আঃ] কে নাগালে পেয়ে গেল, আল্লাহ তায়া’লা সে সম্পর্কে বলেনঃ {যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমূদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জত কললাম। নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না।} [সূরা শুয়া’রাঃ ৬১-৬২]

বিশ্বাসীদের মহান নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম, শত্রুপায়ের নিচে তাকালে তাঁকে দেখতে পেতো-যখন মুশরিকরা তাঁকে হত্যা করার জন্য খুজছিল-এমন অবস্থায় তিনি -আল্লাহ তায়া’লার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রেখে তাঁর সঙ্গী আবু বকর [রাঃ] কে পর্বতের গুহায় বললেনঃ {তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্তনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”।} [সূরা তাওবাঃ ৪০]

এমনিভাবে মু’মিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়া’লাই মৃত্যু দান করেন, সুতরাং সে মৃত্যুকে ভয় পায়না। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা যুমারঃ ৪২]

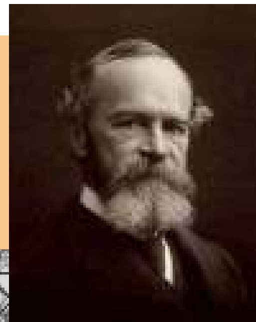
বরং সে আরো বিশ্বাস করে যে, ইহা চিরন্তন সত্য ও অবশ্যই আসবে, ইহা থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবেনা। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য, দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।} [সূরা জুম’আঃ ৮]

আর মৃত্যু নির্ধারিত সময় ব্যতীত আসবেনা। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না।} [সূরা নাহলঃ ৬১]

সন্তুষ্টি হলো সৌভাগ্যের সোপানঃ

সুখ-সৌভাগ্য হলো ব্যক্তি আত্মসন্তুষ্টিতে জীবন যাপন করা। অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি মানুষের জীবন, আত্মা ও অনুভুতিকে বিঘ্নিত করে। সন্তুষ্টি ও পরিতুষ্টি হলো সুখ-শান্তি, নিশ্চিন্ততা, ঈর্ষা, আনন্দ ও বিনোদনের সিঁড়ি। সন্তুষ্টি হলো মানুষের প্রতি আল্লাহর ইচ্ছার সামনে তার অন্তরের স্থিরতা ও প্রশান্তি। এ স্থিরতা ও প্রশান্তি মানব জীবনে যা কিছু ঘটে তাকে কল্যাণকর, সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তোলে। তাই সে আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করেনা। দুনিয়ার কিছু না পেলে অফসোস করেনা। এটি বান্দাহকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে, সে তার প্রতিপালককে সর্বদা ডাকে, অতঃপর আল্লাহ তায়া’লা তার ভাগ্যে যা লিখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। এতে করে সে সন্তোষজনক ও সুখী জীবন যাপন করে।

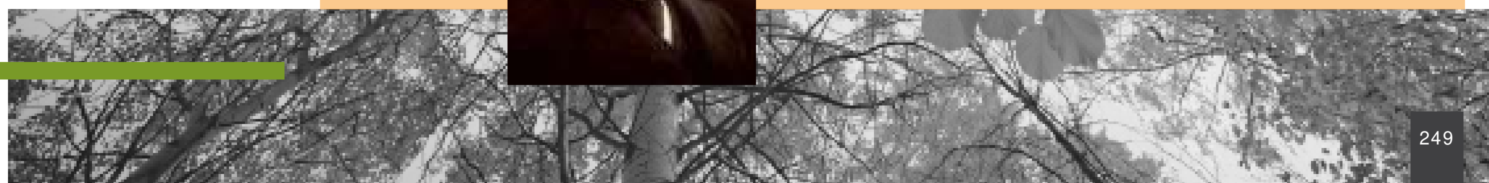
সন্তুষ্টির অনেক ধরণ আছে, যেমনঃ



ঈমান...... ও জীবন

“আল্লাহর প্রতি ঈমান এমন এক শক্তি যা ব্যক্তির জীবন যাপনের সহযোগীতায় অত্যাবশ্যক। , আর ঈমান ছাড়া সে জীবনে দুঃখ দুর্দশা লাঘবে অক্ষম হয়ে পড়বে।

আর্নেস্ট রিনান
ফরাসি ইতিহাসবিদ



বস্তুগত সভ্যতাসমূহ যেন বিলীন হয়ে যায়



"একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলাম মৌলিকভাবেই মানুষের অন্তরে শান্তি ছড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে পার্থিব সভ্যতা ইহার বাহককে হতাশায় নিমজ্জিত করে। কেননা তারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করেনা। আরো একটি বিষয় সনাক্ত করা গেছে যে, ইউরোপীয়ানরা ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ জানেনি, কেননা তারা ইসলামকে বস্তুগত মাপকাঠিতে বিচার করে থাকে"।

রোজীহ ডুবাকীহ

সুইস চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক



ক- আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি হওয়া। আর যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্টি হয়না, সে সর্বদা দিশেহারা, হয়রান ও উদ্বিগ্ন জীবন যাপন করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি হলো সেই ঈমানের স্বাদ পেল"। [বুখারী শরীফ]। অন্যদিকে যে ঈমানের স্বাদ পেলনা, সে সুখ শান্তির স্বাদও পেলনা। বরং সে সর্বদা উদ্বেগ, বিরক্তির জীবন যাপন করবে। আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো, আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনা, তাঁর মহানত্ব ও বড়ত্বের অনুভুতি থাকা, তাঁর হিকমত, কুদরত, ইলম ও নামসমূহ জানা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর উপর ও তাঁর ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকা। তা না হলে সন্দেহ, হয়রানী, অসুস্থতা ও বিষণ্ণতায় ভুগতে হবে। -আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে এ সব থেকে মুক্ত রাখুন-

খ- আল্লাহর বিধান ও তাঁর শরিয়তের উপর সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।} [সূরা নিসাঃ ৬৫]

মানব রচিত বিভিন্ন জুলুমপূর্ন ও অসম্পূর্ন বিধিবিধান, শরিয়ত ও আইনকানুনে চলার কারণে তারা অনেক দুর্ভাগ্য, কষ্ট, দুনিয়ার নানা বিষণ্ণতা ও বিরক্ততায় ভুগতে থাকে। কেননা ইহা ছিল মানব রচিত বিধান, মানুষের স্রষ্টা যিনি তাদের ভাল মন্দ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত তাঁর শরিয়ত ছিলনা। আল্লাহ তায়া'লা আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্নজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [সূরা মুলকঃ ১৪]

গ- আল্লাহর ফয়সালা ও বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকা। মু'মিন আল্লাহর ফয়সালা ও বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে, কেননা সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তাঁকে কোন বালা মসিবত স্পর্শ করতে পারবেনা। তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।} [সূরা তাগাবুনঃ ১১]

সে আল্লাহর বিচার ও বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে, কেননা সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ কোন কষ্ট দূর করতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খন্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।} [সূরা ইউনুসঃ ১০৭]

ঈমানের আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, মু'মিন আল্লাহর নির্ধারিত বণ্টনে সন্তুষ্ট থেকে, আবার বিপদআপদ ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেলে শুকর করে লাভ অর্জন করে। এভাবে তার অভ্যন্তরে সন্তুষ্ট ও পরিপৃপ্তি অর্জিত হয়, যা মু'মিন ব্যতীত কারো হয়না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ "মু'মিনের ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক। তার সব কিছুতেই কল্যাণ রয়েছে, ইহা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো হয়না। যখন সুখের কিছু লাভ করে তখন সে আল্লাহর



শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, ইহা তার জন্য কল্যাণকর। আবার যখন বিপদআপদ আসে তাতে সে ধৈর্য ধারণ করে, এতেও রয়েছে তার কল্যাণ”। [মুসলিম শরীফ]। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন অন্য কেউ দুনিয়ার ভোগ বিলাস অধিক পেলে সে অবস্থায় কিভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ “যারা তোমাদের চেয়ে নিচুঁ [কম সম্পদের অধিকারী] তাদের দিকে তাকাবে, আর যারা তোমাদের চেয়ে উঁচু [বেশি সম্পদের অধিকারী] তাদের দিকে তাকাবেনা। কেননা ইহা তোমাদের উপরে আল্লাহর নিয়ামতকে ছোট না করার উত্তম পন্থা”। [বুখারী ও মুসলিম]।



ইসলামের আত্মা

“আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এমনই এক ধর্ম যা ইহার অনুসারীদের অন্তরে সুখ-শান্তির অনুপ্রবেশ ঘটায়। ইহা মানুষের অন্তরে শান্তনার বাণী ঢেলে দেয়।আমি ইসলামের আধ্যাত্মিক সুধা আমার অন্তরে পৌঁছেছে, ফলে আমি আল্লাহর ফয়সালার প্রতি বিশ্বাস এবং পার্থিব মজা বা ব্যাথাকে গুরুত্ব না দেয়ার নিয়ামত অনুভব করেছি”।

রেক্স ইংগ্রাম

আন্তর্জাতিক চলচিত্র নির্মাতা

সুখ-শান্তির পথ থেকে দূরে থাকা দুর্ভাগ্য

ইসলাম সর্বকালের ও স্থানের উপযোগী হিসেবে এসেছে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে মিলে চলে, জীবনের নানা পরিবর্তনের দিকে খেয়াল রেখে, উন্নতি ও সভ্যতার দিকে অগ্রসারিত, বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানকারী। কিন্তু অনেক মানুষই এ আলোকিত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, আবার অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, মানুষকে ইহা থেকে দূরে রাখতে একে কলুষিত করতে নানা প্রচেষ্টা করছে। এ কারণে ব্যক্তি ও সমাজে নানা দুঃখ-দুর্দশা। যে ইসলামের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করবে, ইহার শরিয়তের পাবন্দী করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়া’লা তার সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি ইহা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, ও অহংকার করবে আল্লাহ তায়া’লা তার জন্য দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা, ও অপমান লিখে রেখেছেন।

একমাত্র ইসলামই আল্লাহ তায়া’লা মানব জাতির জন্য মনোনীত করেছেন, যাতে তাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী ও সৌভাগ্যশীল হয়, উভয়জগতে সে হতভাগা হবেনা। কিন্তু মানব জাতি -স্বভাবগতভাবেই- তার প্রবৃত্তি ও লালসা বিরোধী নির্দেশ, শর্তাবলীর প্রতি আগ্রহী হয়না, যদিও ইহা তাদের কল্যাণেই আদেশ করা হয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তায়া’লা সত্য পথের পথিকদেরকে কল্যাণ ও হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দেয়া ফরজ করে দিয়েছেন। এ হিদায়েতকে সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম নিজে সুখী ও সৌভাগ্যবান হতে এবং সাথে তাঁর জাতি ও দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সুখী ও সৌভাগ্যবান করতে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।} [সূরা তোয়াহাঃ ২]

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

অতএব রাসুলের অনুসরণ, তাঁর পথে চলা, ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সুখের মূল ও পরিত্রানের পথ। ইহাই আল্লাহ তায়া’লার নির্দেশিত পথ, যে পথে তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করে জীবন যাপন করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন; দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-সৌভাগ্য-ই যার ফল। এ সীমারেখা থেকে যারাই বেরিয়ে আসবে তাদের দুজাহানেই দুর্ভাগ্য। আল্লাহ তায়া’লা যথার্থই বলেছেনঃ {এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৬]

মু’মিনের ক্ষেত্রে এর বিশাল পার্থক্য, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]



আর আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৪]

অতএব, প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহর আদেশ মানা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং প্রশান্ত চিত্তে তাঁর ফয়সালা মেনে নেয়ার মধ্যেই উত্তম ও পবিত্র জীবন রয়েছে। কেননা সে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও হেফাযতে জীবন যাপন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।} [সূরা রা'দঃ ২৮]



ইসলামের সকাল

"ইসলামের নতুন সুর্য পুনরায় উদিত হওয়া পর্যন্ত কত জাতিরাই ভয়ভীতি ও দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।এখন মনে হচ্ছে গোটা ইতিহাস সেদিকে ধাবিত হতে যাচ্ছে। সেদিন পুরা দুনিয়াতে শান্তি ছড়িয়ে পড়বে, সেদিন মানুষের হৃদয় শান্তিতে ভরে যাবে"।

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস

ব্রিটিশ লেখক ও সাহিত্যিক

অতএব অন্তরের প্রশান্তির প্রতিফলন মানুষের প্রত্যেকটি কাজেই প্রতিফলিত হয়, আর এর পুরো ব্যাতিক্রম তারা, যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবিকা সংকীর্ণতায় বসবাস করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।} [সূরা আন'আমঃ ১২৫]

সুতরাং তার সংকীর্ণতা, দুর্দশা ও কষ্ট দরিদ্রতা ও অসুস্থতার কারণে নয়, বরং ইহা হলো সমস্ত কাজে তার অস্থিরতা। দুর্ভাগাদের দুনিয়া প্রাপ্তি বা দুনিয়া হারানো তাদেরকে দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি দিবেনা। দুনিয়ায় কিছু অপ্রাপ্তি দুঃখ দুর্দশার কারণ নয়, বরং দুঃখের কারণ হচ্ছে ভাবনা চিন্তার পদ্ধতির মধ্যে, তাই অতিরিক্ত সম্পদ বা সামান্য সম্পদ বা সুস্বাস্থ্য বা রোগব্যাধি অধিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ হতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।} [সূরা তাওবাঃ ৫৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে।} [সূরা তাওবাঃ ৮৫]

ধন-সম্পদ, দরিদ্রতা, রোগ-ব্যাধি ও কোন মসবতে পতিত হওয়া মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশার কারণ নয়, বরং আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর পথ থেকে দূরে চলে যাওয়া এবং বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো দুঃখ-অশান্তির কারণ। কেননা হযরত জাকারিয়া [আঃ] যখন তার প্রভুকে দোয়ায় অসিলা করে বলেছেনঃ {হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হইনি।} [সূরা মারইয়ামঃ ৪]

আপনি অতীতে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন, অতএব আমার দোয়া কবুল করে আমাকে সুখী-সৌভাগ্যবান করুন। এটা শুধু যাকারিয়া [আঃ] এর ব্যাপারেই নির্দিষ্ট নয়, বরং আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে এভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যেঃ {আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।} [সূরা বাকারাঃ ১৮৬]

যখন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সরাসরি সম্পর্ক হয়ে যায়, তখন তার সুখ-শান্তি অবশ্যই অর্জিত হয়, আর দুর্ভাগ্য ও দুঃখ তখনই হয় যখন এ সম্পর্কের রশি ছিন্ন হয়ে যায়। এ দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার পরিমাণে সে নিজের ও জীবনের মাঝে অস্থিরতা ও অশান্তি ভোগ করে।

এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা হিদায়েত ও রহমতকে একসাথে উল্লেখ করেছেন, আবার ভ্রষ্টতা ও দুঃখ-দুর্দশাকেও একত্রে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।} [সূরা বাকারাঃ ৫]



তিনি আরো বলেনঃ {তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।} [সূরা আল বাকারাঃ ১৫৭]

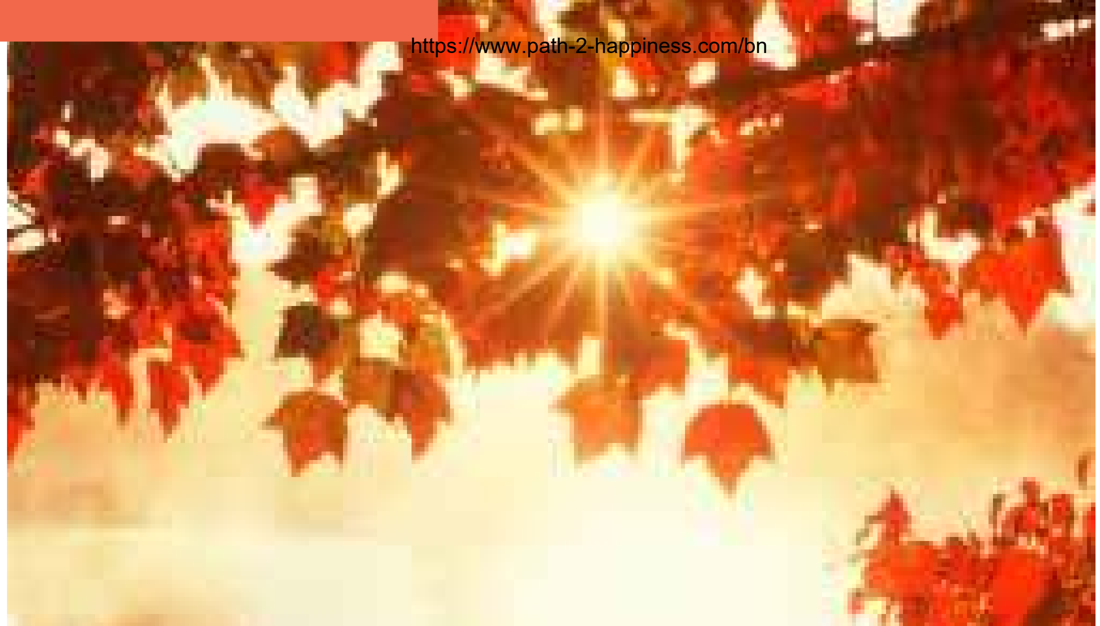
আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৩]

হেদায়েত হলোঃ ভ্রষ্টতা থেকে বিরত থাকা, রহমত হলোঃ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ। ইহাই আল্লাহ তায়া'লা সূরায়ে তোয়াহার শুরুতে বলেছেনঃ {তোয়া-হা, আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।} [সূরা তোয়াহাঃ ১-২]

কোরআন নাযিল ও দুঃখ ক্লেশ দূরকে একত্রিত করা হয়েছে। যেমন অন্য সূরায় হেদায়েতের অনুসারীদেরকে বলা হয়েছেঃ {সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৩]

হেদায়েত, কল্যাণ, নিয়ামত, রহমত সবকিছুই একসঙ্গে গাঁথা, একটি অন্যটির থেকে আলাদা হয়না। এমনিভাবে, ভ্রষ্টতা, দুঃখ, দুর্দশা ও পরস্পর একই সঙ্গে গাঁথা, একটি অন্যটির থেকে ভিন্ন হয়না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত।} [সূরা আল ক্বামারঃ ৪৭]

আয়াতে "সুউর" শব্দটি "সাঈর" এর বহুবচন। অর্থঃ সীমাহীন আযাব। অপরাধী ও পথভ্রষ্টদের আবাসের বিপরীতে আল্লাহ তায়া'লা একই সূরায় বিশ্বাসীদের আবাসের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ



{খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।} [সূরা আল ক্বামারঃ ৫৪-৫৫]

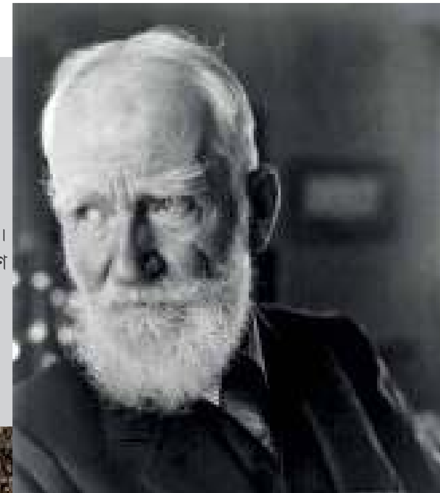
সুতরাং আসো, ইহাই সৌভাগ্যের পথ, যদি তুমি এ পথে চলতে চাও, যদি এ পথের অনুসরণ করতে চাও। ইহা এমন রাস্তা যা কল্প কাহিনী বা নিছক আত্মিক ও ভাবনাগত বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা সৌভাগ্যের পথ এবং সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতারওপথ।

মানবতার ত্রাণকর্তা

"মুহাম্মদকে মানব জাতির ত্রাণকর্তা ডাকাই হলো সুবিচার ও নিরপেক্ষতা। আমি মনে করি, তাঁর মত একজন মহামানব আধুনিক বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে, সব সমস্যার সফল সমাধান হবে, বিশ্ব সুখ শান্তিতে ভরে যাবে"।

বার্নার্ড শ

ইংরেজি লেখক





সূচিপত্র



জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ



জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ

ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুখ-সৌভাগ্য অবশ্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথে চলে। অজ্ঞতা ও পশ্চাদগামিতার পথে কখনও চলতে পারেনা। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত ইসলাম ধর্মের ন্যায় অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ নেই যা জ্ঞানীদের মর্যাদা সুউঁচু করেছে, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে বলেছে, জ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করেছে, বিবেককে কাজে লাগাতে বলেছে ও চিন্তা-গবেষণা করতে আহবান করেছে। তিনি এক মহা সভ্যতা গড়েছেন, যা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করে। এজন্যই তাঁর আগমনকে জ্ঞান পিপাসু ও জ্ঞানীদের নিকট প্রকৃত জ্ঞানের এক মহাবিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হয়। তাইতো ইসলাম জ্ঞান দিয়েই শুরু করেছে। খোদায়ী হেদায়েতের আলোতে পৃথিবী আলোকিত করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?} [সূরা মায়েদাঃ ৫০]

এ ধর্মে অজ্ঞতা, সন্দেহ, ধারণা বা সংশয়ের কোন স্থান নেই। নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের উপর প্রথমেই অবতীর্ণ হয়ঃ {পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।} [সূরা আলাকঃ ১-৫]

এটা স্পষ্ট যে, এই প্রথম বিষয়টিই এ ধর্ম বুঝার চাবিকাঠি, দুনিয়া জানার চাবিকাঠি এবং সকল মানুষের গন্তব্যস্থল আখেরাত জানারও চাবিকাঠি।

বরং একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, আল কোরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে গুরুত্ব শুধুমাত্র প্রথম নাযিলের সময়ই দেয়নি, বরং মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াতে এ ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তায়া'লা আদম [আঃ] কে সৃষ্টি করলেন, তাঁকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানালেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়ে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের ও ফেরেশতাদেরকে তাঁর সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ইহা জ্ঞানের কারণেই। আল্লাহ তায়া'লা এ ব্যাপারে বলেনঃ

{আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ [সেগুলো ব্যতীত] নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর!} [সূরা বাকারাঃ ৩০-৩৩]

পড়... ইসলামের আহবান

“নিঃসন্দেহে ইসলাম - জ্ঞান বিজ্ঞানের ধর্ম- ইহা তার অনুসারীদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও আমলের দ্বারা পাথেয় সংগ্রহ করতে সর্বদা আহবান করে। এতে কোন সংন্দেহের অবকাশ নেই; কেননা আল কোরআনের সর্বপ্রথম আয়াতই হলোঃ পড়ুন আপনার রবের নামে”।

রবার্ট বায়ের জোসেফ
ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক



ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব ও মর্যাদা শুধু কোরআন নাযিলের শুরুতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, যেহেতু কোরআনের প্রথম শব্দই জ্ঞান সম্পর্কে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পাঠ করুন }বরং ইহা এই চিরস্থায়ী সংবিধানের স্থায়ী পথ ও পদ্ধতি। কোরআনের এমন কোন সূরা পাওয়া যাবেনা যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। আল্লাহ তায়া'লা জ্ঞানের দ্বারা সর্বোচ্চ সাক্ষ্য তথা তাঁর তাওহীদের সাক্ষ্য-প্রমাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।} [সূরা মুহাম্মদঃ ১৯]

অতএব, এতে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়, বরং যারা জানে ও যারা জানে না তাদের মাঝে সমতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।} [সূরা যুমারঃ ৯]

বরং তিনি যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদের জন্য আখেরাতে অপরিসীম প্রতিদান ছাড়াও দুনিয়াতেও তাদের মর্যাদা উচ্চ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত,আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।} [সূরা মুজাদিলাঃ ১১]

এছাড়া কোরআনে জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু অধিক প্রাপ্তির জন্য এতো উৎসাহ দেয়নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।} [সূরা তোয়াহাঃ ১১৪]



মসজিদ... বিশ্ববিদ্যালয়

"আগেকার দিনে - এখনও কিছু কিছু জায়গায়-মসজিদসমূহ ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের দ্বারা ইহা শোরগোলে ভরপুর ছিল। তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মীয়, শরিয়ত, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অন্বষণে উলামাদের পাঠদান শুনতে আগমন করত। বিশ্বের নানা প্রান্তর থেকে আরবীতে দক্ষ উলামারা নিজেরাও পাঠদান করতে আসতেন। দেশে জাতি নির্বিশেষে সকল ছাত্রদেরকেই স্বাগত জানানো হতো"।

স্ট্যানলি লেন. পল

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী

এ থেকেই বুঝা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী মোটেও অতিরিক্ত নয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলবে আল্লাহ তায়া'লা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টিকরণে ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও জমিনের সবাই ইস্তিগফার করতে থাকে, এমনকি পানির নিচের মাছও। আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা যেমন সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের উপর চাঁদের মর্যাদা। উলামাগণ আম্বিয়াদের ওয়ারিশ। আর আম্বিয়া কিরামগণ দিনার বা দিরহামের [অর্থকড়ির] ওয়ারিশ করেননি, তাঁরা ইলমের ওয়ারিশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করল, সে পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হলো"। [মুসলিম শরীফ]। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে মসজিদগুলো ইলম ও উলামাদের দূর্গে পরিণত হয়েছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, কোরআনে "ইলম" শব্দটির বিভিন্ন রুপান্তর পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে ইহা [৭৭৯] বার এসেছে, অর্থাৎ কোরআনের প্রত্যেক সূরাতে প্রায় সাত বার করে এসেছে! আর ইহা শুধু তিন অক্ষরের "ইলম" শব্দটির ব্যবহার। তবে ইলমের সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ অনেক বার এসেছে। যেমনঃ ইয়াকিন, হেদায়েত, আকল, ফিকির বা চিন্তাভাবনা, নজর বা দৃষ্টিপাত, হিকমা বা প্রজ্ঞা, ফিকহ, বুরহান বা প্রমাণ, দলিল, হুজ্জাত বা প্রমাণ, আয়াত বা নিদর্শন, বাইয়েনাহ বা স্পষ্ট প্রমাণ এবং এভাবে ব্যবহৃত অনেক শব্দাবলী যা ইলমের অর্থ বুঝায় ও ইলমের প্রতি উৎসাহিত করে। অন্যদিকে রাসুলের সুন্নতে ইহা এত বেশি সংখ্যক বার ব্যবহৃত হয়েছে যে, এর পরিসংখ্যান করাই প্রায় কঠিন ও অসম্ভবপর।

আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময়

"আল কোরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক আয়াত এসেছে, যা ডঃ ইউসুফ মারওয়াহ তার "আল কোরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" বইয়ে উল্লেখ করেছেন। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ইহা [৭৭৪]টি আয়াত। ইহার বিস্তারিত হলো নিম্নরূপঃ গণিত [৬১], পদার্থবিদ্যা [২৬৪], অণু [৫], রসায়ণ [২৯], আপেক্ষিক বিজ্ঞান [৬২], জ্যোতির্বিজ্ঞান [১০০], আবহাওয়া [২০], জলজ [১৪] মহাকাশ বিজ্ঞান [১১], প্রাণিবিদ্যা [১২], কৃষিবিজ্ঞান [২১], জীববিজ্ঞান [৩৬], সাধারণ ভূগোল [৭৩], মানব প্রজনন [১০], ভূতত্ত্ব [২০], মহাবিশ্ব এবং মহাজাগতিক ঘটনার ইতিহাস [৩৬]টি আয়াত"।



মরিস বুকাইলী

ফরাসি বিজ্ঞানী ও ডাক্তার

কোরআন যদিও রসায়ণ, পদার্থ, জীব বা গণিত শাস্ত্র নয়, কেননা ইহা হেদায়েতের কিতাব, তথাপিও আধুনিক বিজ্ঞান যা কিছু প্রমাণ করেছে তা আল কোরআনের সাথে কখনও বিরোধপূর্ণ নয়।

পরবর্তীতে এ সব কিছুর সুদূর প্রভাব ইসলামী রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অনেক অবিষ্কার হয়েছিল। এমন সব বিস্ময়কর আবিষ্কার যা ইতিহাস কখনও দেখেনি, যা মুসলমানদের হাতে এক মহা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করেছে। তারা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এমন এক অভূতপূর্ব জ্ঞান ভাণ্ডার রেখে গিয়েছিল যা সারা পৃথিবীবাসীকে ঋণী করে রেখেছে। ম্যাক্স মাইরহোপ বলেনঃ "ইউরোপে পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি সরাসরি জাবের ইবনে হাইয়ানেরই অবদান। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ইউরোপের নানা ভাষায় বিজ্ঞানের অনেক পরিভাষায় এখনও তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়েথাকে"।

আলডোমিলি বলেনঃ "আমরা যখন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাকাই তবে আমরা প্রথম যুগের বিজ্ঞানীদের কথাই বলতে বাধ্য হব। আর তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মূসা আল খাওয়ারেজমী। (নি বীজগণিত এর প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় নম্বর সিস্টেমের সংজ্ঞাকারক, গণিত গবেষণা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের নানা তথ্যের উদ্ভাবক।) .... তিনি বিখ্যাত গণিতবিদদের জন্য গণিতের নানা শাখা প্রশাখা খুলে গেছেন। তাঁর লিখিত বই ষষ্টদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করা হত"।



সিগরীড হোংকে [Sigrid Hunke] আল জাহরাবীর "আল তাসরিফ লিমান আজেজা আ'নেত তা'লিফ" (ইহা ত্রিশ খন্ডে চিকিৎসা বিশ্বকোষ। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এতে রয়েছে প্রচুর চিত্র, এর লেখক আল জাহরাবীর সার্জারিতে ব্যবহৃত প্রচুর যান্ত্রিক রূপ। দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় জেরার্ড এই বইয়ের সার্জারি অধ্যয় অনুবাদ করেন। এর পরে এ বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ বের হয়। প্রথম সংস্করণ ১৪৯৭ সালে ভেনিসে, দ্বিতীয় ১৫৪১ সালে বাসেলে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৭৭৮ সালে অক্সফোর্ডে। উনবিংশ শতাব্দীতে ডঃ Leclerc ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন।) কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের সার্জারি অধ্যায় সম্পর্কে বলেনঃ "এই কিতাবের তৃতীয় অধ্যায় ইউরোপে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। কেননা ইহা ইউরোপে সার্জারির মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহার অপরিসীম মূল্য। ফলে কাটা ছিঁড়া [ব্যবচ্ছেদ] বিজ্ঞানে জখম ও সার্জারি একটি আলাদা বিষয় হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, ইহার রয়েছে নির্ভরযোগ্য মূলনীতি ও ভিত্তি।" ইউরোপের অগ্রগতিতে পাঁচ শতাব্দির অধিক কাল ধরে আল জাহরাবীর এ কিতাবের অনেক অবদান রয়েছে। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কিতাব পাঠদান করা হত, ইউরোপের শৈল্যচিকিতসকরা এ কিতাবের মুখাপেক্ষী হতেন ও ইহার থেকে সাহায্য নিতেন।

এখনও মুসলিম বিজ্ঞানীরা মানবজাতির কল্যাণে অনেক কিছু আবিষ্কার করে আসছে। আহমদ



সংস্কৃতির প্রতি প্রচন্ড ভালবাসা

"মানব ইতিহাসে কখনও সংস্কৃতির জন্য হঠাৎ আবেগময় হয়ে উঠার সেই আন্দোলনের মত আকর্ষনীয় কোন ঘটনা ঘটেনি, যেমনটি ঘটেছিল সে সময়ে সারা মুসলিম জাহান জুড়ে। তখন প্রত্যেক মুসলমান খলিফা থেকে শ্রমিক সকলেই যেন জ্ঞানের জন্য হঠাৎ আসক্ত হয়ে গেল, জ্ঞান অন্বেষণে সফর করতে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। আর এটা ছিল ইসলাম সর্বক্ষেত্রে যে সব অবদান রেখেছে তার মাঝে সর্বোত্তম। জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের পদচারণায় তখনকার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ যেমন বাগদাদ নগরী, এরপরে অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ যা কলা ও বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত ছিল ইত্যাদি মুখরিত ছিল। যেমনিভাবে ইউরোপীয় জ্ঞানীদের হাতে আধুনিক মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল, তাদের হাতে আধুনিক জ্ঞানের নানা গবেষণায় সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলো তরঙ্গায়িত হতো; বরং তাদের চেয়েও বেশী আকর্ষনীয় ও চমৎকার ছিল"।

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

স্ট্যানলি লেন. পল



জ্ঞান- বিজ্ঞানের সভ্যতা

যখনই আমরা আরব সভ্যতা, তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ বইসমূহ এবং তাদের অবিষ্কার ও শিল্পকলা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করি, তখন আমাদের সামনে নতুন তথ্য ও বিস্তৃত সম্ভাবনা প্রকাশিত হয়। আমরা সহজেই দেখতে পাই যে, মধ্যযুগে আরবরা পূর্ববর্তীদের জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেসব জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে পাঁচ শতাব্দী ধরে তাদের বইসমূহ ছাড়া কিছুই জানত না। আরবরাই ইউরোপকে পার্থিব, জ্ঞানগত ও চারিত্রিকভাবে সভ্য সংস্কৃত করেছে। ইতিহাসে কোন জাতিকে দেখা যায় না যারা এতো অল্প সময়ে এতো কিছু উপহার দিয়েছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কেউ তাদের থেকে বেশী অগ্রসর হতে পারেনি”।

ফরাসি ইতিহাসবিদ

বিস্ময়কর কোরআন

“আমি আল কোরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ গবেষণা করে দেখেছি যে, এসব আয়াত আমাদের আধুনিক জ্ঞানের সাথে পুরোপুরি প্রযোজ্য। আমি বিশ্বাস করেছি যে, হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদ মানবজাতির থেকে কোন শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই স্পষ্ট সত্য নিয়ে আগমন করেছিলেন। যে কোন বিজ্ঞানী বা শিল্পী তার জ্ঞানের সাথে কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ তুলনা করে, যেমনিভাবে আমি করেছি, তবে নিঃসন্দেহে সে কোরআনের বশ্যতা স্বীকার করবে, যদি সে বিবেকসম্পন্ন হয় এবং হীন উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়”।



রিনে জীনো

ফরাসি দার্শনিক

জুয়েল (মিশরী রাসায়নিক বিজ্ঞানী, ১৯৯৯ সালে ক্যামেরার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্যামেরা আবিষ্কারের জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। [Femtosecond Spectroscopy] পদ্ধতিতে তার গবেষণায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন, যাতে সমগ্র বিশ্ব একটি নতুন সময় প্রবেশ করে যা ইতিপূর্বে মানুষ প্রত্যাশা করেনি। এতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক দ্রুত লেজারের মাধ্যমে অণুগুলোর গতি পর্যবেক্ষন সম্ভব হয়। এমনিভাবে ডঃ আহমাদ জুয়েল অস্বাভাবিক দ্রুত ফটোগ্রাপ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন,যা লেজারের মাধ্যমে কাজ করে। এর মাধ্যমে একটি অংশ অপর অংশের সাথে মিলিত হওয়া ও আলাদা হওয়ার সময় অংশগুলোর গতি লক্ষ্য রাখা যায়। আর যে সময়ের মাঝে ফটোর কাজ সম্পন্ন হয় তা এক সেকেন্ড এর দশ লক্ষ বিলিয়ন অংশের এক অংশ)। “বিজ্ঞানের যুগ” বইয়ে বলেনঃ “আমার কাজ ছিল অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের একত্রিত ও পৃথক হওয়ার ক্ষেত্রে অনুর পরিবর্তন নিয়ে, অনুরুপভাবে সেকেন্ডের ভিতরের সময় নিয়ে, এমনভাবে যে, সেকেন্ডটা একটা বড় সময় হিসেবে রূপান্তরিত হয়।”

এ কথা সকলেরই জানা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনিত এ জ্ঞান-বিজ্ঞান, হিদায়েত ও আলো মানবজাতিকে বদ্ধতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে। যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা মানবজাতির মর্যাদা সুউচ্চ করেছে।

ইসলাম জ্ঞানের পথে চলার পদ্ধতি নিয়ে এসেছে। যেমনঃ ইসলামে অজ্ঞভাবে কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া’লা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ {তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও।}[সূরা বাকারাঃ ১৭০]

জ্ঞানের পথ ছেড়ে ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করতেও নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।}[সূরা আন’আমঃ ১১৬]

এছাড়াও জ্ঞান, যুক্তি, আকল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপরীতে ভ্রান্ত প্রবৃত্তির অনুসরণও নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে।}[সূরা আন’আমঃ ১১৯]

আরো নিষেধ করেছে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা হতে যা ন্যায় বিচার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।}[সূরা মায়েদাঃ ৮]

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পরিবর্তন করে লক্ষ্যচ্যুত করাকেও নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া’লা ইহুদীদের সম্পর্কে বলেনঃ {কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি।} [সূরা নিসাঃ ৪৬]

কারো উপর সীমালঙ্ঘন ও ঝগড়া করতে মানা করেছে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়।} [সূরা শুরাঃ ৪২]

মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করতে ইলমী আমানতের থেকে দূরে সরে যেতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক।} [সূরা নিসাঃ ৫৮]

ন্যায়নীতি, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দেয়া থেকে সরে যাওয়াও নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের যদি ক্ষতি হয় তবুও।} [সূরা নিসাঃ ১৩৫]

দলিল, প্রমাণ ও যুক্তিযুক্ত অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।} [সূরা নামলঃ ৬৪]

এছাড়াও আরো অনেক কিছু, যা জ্ঞান ও সভ্যতার পথে বিজ্ঞান সম্মত পথ ও পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে।



সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা

“ইসলাম বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কেননা ইহা ছিল সে যুগের সর্বোত্তম সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ইহা ব্যাপকহারে প্রসার লাভ করেছে, কেননা সর্বত্রই রাজনৈতিক দিক থেকে কিছু নির্বোধ লোক ছিল, যাদের অধিকার হনন করা হতো, তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা হতো, তাদেরকে ভয় ভীতি দেখানো হতো, তারা ছিল অশিক্ষিত ও রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালনা করে তা জানতোনা। এছাড়াও কতিপয় স্বৈর ও দুর্বল শাসক পাওয়া যায়, যাদের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামই বিশ্বের জন্য অদ্যবধি কার্যকর প্রশস্ত, অত্যাধুনিক ও নির্মল রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে এসেছে। ইহা মানব জাতিকে অন্য সব ব্যবস্থপনার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থপনা উপহার দিয়েছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যে শুল্কাধীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর ইউরোপে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরম্পরা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল ও ভেঙ্গে পড়েছিল “।

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস

ব্রিটিশ লেখক ও সাহিত্যিক

সভ্যতার পথঃ

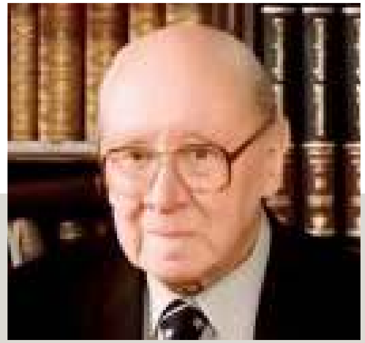
উন্নত অনুন্নত এমন কোন জাতি বা গোষ্ঠী পাওয়া যাবেনা যাদের সংস্কৃতি নাই, যা তাদের স্বভাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। সংস্কৃতি হলো জীবন যাপনের পথ, জীবন ও অস্তিত্বের অবস্থান, সুউচ্চ নীতিমালা ও সামাজিকতা যা জীবনের বাহ্যিক দিক ও রূপকে নির্দেশ করে। সকল কার্যকলাপ ও আচার আচরণের প্রতিফলন। ইহা সমাজকে প্রিয় অভ্যাসে অভ্যস্থ করে এবং তার উপর অটল থাকাকে সংরক্ষন করে। আর সভ্যতা হলো সমাজের সংস্কৃতির সাথে বাড়তি একটি বৈশিষ্ট্য, যা অগ্রগতি, উন্নতি, ব্যক্তি ও সমষ্টিক সফলতা, বাস্তবতার আলোকে অর্জন, ইতিহাসের পাতায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব, কোন কিছু সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা, এমন কার্যকারিতা যা স্থান ও কালের সীমা ছড়িয়ে একত্রিত ও আলাদা রূপে দীপ্তশীল, এসব কিছুকে শামিল করে। এভাবেই সকল সভ্যতা প্রকৃতি, পরিবেশ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও আখলাকের সাথে বুনন ও গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি করে। উক্ত উপাদানগুলো আমরা একই পাত্রে মিশ্রিত দেখি, ইহাই একটি জাতির সভ্যতা, ইহাই উক্ত জাতির বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী।

এভাবে আমরা দেখি যে, ইসলাম অসহিষ্ণু ও অনুন্নত একটি গোষ্ঠীকে মহান আখলাক, সুউচ্চ মূলনীতিবান জাতিতে পরিণত করেছে। মাত্র কয়েক দশকের মাঝে তাদের মধ্যে এমন নাগরিকতা ও সভ্যতা বিস্তার করে, যার দ্বারা তারা পৃথিবী জয় করে নেয়। এ সভ্যতায় সে সময়ে অনেক জনগোষ্ঠীই সাড়া দিয়েছিল, কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দ্বীনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা ছিল সহজ-সরল, ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যে ভরপুর। ইসলামের সভ্যতা এমন এক সময় এসেছিল যখন মানুষ দাসত্ব ও স্বৈরশাসনের পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তারা এ নতুন ব্যবস্থাপনায় আকৃষ্ট হলো, কেননা তারা দেখলো রাজা বাদশাদের স্বৈরচারিতা, একনায়কতন্ত্রের নির্যাতনের পরিবর্তে এতে রয়েছে তাদের জন্য সম্মানবোধ ও মানবতা। ফলে ইসলামই তাদের জন্য ছিল এক সোনালী সুযোগ। কেননা ইহা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান দিয়েছে, তারা এখানে সম্মানিত জীবন পেয়েছে, যা তারা প্রত্যাশা করত। এমনিভাবে ইসলাম তাদের থেকে জুলুম, নির্যাতন, অজ্ঞতা ও পশ্চাদপসারতা দূর করল।

ইসলামী সভ্যতা মানুষকে সম্মান দিয়েছে। গোত্র, বর্ণ বা ভাষার কারণে একে অন্যের উপর কোন আলাদা মর্যাদা বা পার্থক্য করেনি। বরং সকলেই আচরণ ও অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। মানব জাতির অগ্রগতিতে ইসলামী সভ্যতা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। গোত্রীয় স্বৈরতন্ত্র যা রক্ত ও বংশের ভিত্তিতে গড়ে উঠত, তা পরিবর্তন করে আক্বীদা ও চিন্তাভাবনায় একই সমগোষ্ঠীর পদ্ধতি চালু করেছে, যা ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে সভ্যতার প্রথম লক্ষ্যই হলো সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা বাস্তবায়ন, সুন্দর সমাজ গঠন, যে সব জিনিসে কল্যাণ আছে তা দিয়ে মানুষকে সুখী করা এবং সব ধরণের অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। যেহেতু সামাজিকভাবে নানা উপায়ে সভ্যতার উন্নতি মূলত মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রকৃত সভ্যতার উদ্দেশ্য হলো সমাজ ও দেশে শান্তি, নিরাপত্তার মাধ্যমে মানুষের মানসিক সুখ, আন্তরিক প্রশান্তি আনা। আর ইহা সম্ভব হয় ভাল ও কল্যাণকর কাজ করা ও মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

আধুনিক সভ্যতা ইহার বিপরীত, কেননা তা নিরাশা ও উদ্বিগ্নতা বাড়িয়ে দেয়। মানুষকে অন্যায়ভাবে শারীরিক ও জৈবিক ভ্রষ্টতার নিস্পেষণে ভোগায়। আর আখলাক-চরিত্র, সম্মানবোধ, ধার্মিকতা ইত্যাদি সুউচ্চ মানবিক গুনাবলী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে, তার কোন আত্মা থাকেনা, শক্তিশালীরা দুর্বলকে জুলুম নিস্পেষণ করে।



আত্ম অহংকারের আলামতসমূহ

“বর্তমানে ইউরোপে ইসলামের প্রভাব ও অবদানের উপর একটি গবেষণা প্রকাশ করা খুবই জরুরী; যখন বিশ্বে মুসলমান ও আরব খ্রিষ্টানদের সাথে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মধ্যযুগে ইউরোপীয় খৃষ্টান লেখকরা ইসলামের নানা বিকৃতরূপে তুলে ধরেছে। তবে গত শতকের গবেষকদের প্রচেষ্টায় পশ্চিমাদের মনে অনেকটা নিরপেক্ষ ও সত্য চিত্র গঠিত হচ্ছে। আরব ও মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্কের কারণে আমাদের উচিত মুসলমানদের অবদানগুলো স্বীকার করা। অন্যদিকে এ সব অবদান অস্বীকারে শুধু মিথ্যা অহংকারই প্রকাশ পাবে”।

মন্টগোমারি ওয়াট

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



বিশ্বের আত্মাহুতি

“অন্য সময়ের চেয়ে এ সময় পশ্চিমাদের ইসলাম খুবই প্রয়োজন, যাতে তারা জীবনের অর্থ খুঁজে পায়, ইতিহাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পারে এবং যেন পশ্চিমা বিশ্বে বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে যে বৈপরিত্য আছে তা পরিবর্তন করতে পারে। ইসলাম কখনও বিজ্ঞান ও ঈমানের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেনি, বরং এ দুয়ের মাঝে পরিপূরক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যা বিচ্ছিন্ন হয়না। এমনিভাবে ইসলাম আমাদের পাশ্চাত্য সমাজে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামগ্রিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে যা ক্রমাগত সমগ্র বিশ্বকে আত্মাহুতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।।

মারমাদুক পিৎথাল

ইংরেজ সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ



বৈজ্ঞানিক সফলতা অর্জন

“মাত্র আট শতাব্দীতে ইসলামবিজ্ঞানে অনেক বড় বড় অবদান রেখেছে। সুতরাং এ কথা একেবারেই ভুল যে, ইসলাম শুধু সভ্যতার নকলকারী। অথবা পশ্চিমা সভ্যতা শুধুই পশ্চিমাদের পরিপূর্ণ সভ্যতা। পশ্চিমাদের এ সব সফলতা বিস্তারের মূলেই রয়েছে ইসলামের অনেক বড় অবদান”।

প্রিন্স চার্লস

ব্রিটিশ যুবরাজ



সভ্যতার উপাদানসমূহ:

ইসলামী সভ্যতার কতিপয় স্বতন্ত্র উপাদান রয়েছে, যা একে আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও সুস্পষ্ট গুনাবলীতে উজ্জ্বল করে রেখেছে যা অন্যান্য সভ্যতার মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও মৌলিক নীতি হতে আলাদা করে ব্যাক্তিত্ব সৃষ্টি করে।যদিও এর কতিপয় উপাদান অন্যান্য সভ্যতার মাঝেও বিদ্যমান।

ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি জ্ঞান-বুদ্ধিকে অতিসম্মান দেয়া নয়, যেমনটি গ্রীকরা করত। শক্তি, প্রভাব ও কর্তৃত্বের অতিমর্যাদা নয়, যেমনটি রোমানরা করত। ইহা দৈহিক ভোগবিলাস, সমর শক্তি, ও রাজনৈতিক দাপটকে অতিগুরুত্ব দেয়নি, যেমনটি ছিল পারস্যদের নিকট। আবার শুধু আত্মিক শক্তির সম্মান ও করেনি, যেমনটি হয় হিন্দু ও কতিপয় চীনাদের নিকট। ধর্ম যাজকদেরও কাল্পনিক এবং পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে আলাদা কোন সম্মান ও দাপট নাই, যা মধ্যযুগে ইউরোপকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। এতে বস্তু বিজ্ঞানের বিমোহ নাই বা মহাবিশ্ব ও শুধু পদার্থ নিয়ে শুধু গবেষণাও নাই, যেমনটি করে গ্রীক ও রোমানদের থেকে প্রাপ্ত আধুনিক সভ্যতা। ইসলামী সভ্যতার মূল হলো তাওহীদ, চিন্তা-গবেষণা, বিজ্ঞান, কর্ম, আত্মা, আবাদ, বিবেকের মর্যাদা ও মানুষকে সম্মান দেয়া, এককথায় মানবের জীবনে যা কিছু দরকার সব কিছুই ইসলামী সভ্যতার মৌলিক উপাদান। এভাবেই ইসলামী সভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপূর্ণ সংবিধান, যা অন্যান্য সভ্যতার মৌলিক উপাদানের সাথে মূলেই ভিন্ন।

ইসলামী সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতা থেকে উন্নত এজন্য যে, শত্রুর সাথে ইহার রয়েছে আত্মিক জিহাদ ও পরিশ্রম, ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার ও ক্ষমার আদর্শ, বিশ্বের সকলের জন্য রয়েছে কল্যাণের প্রতি ভালবাসা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার। এজন্য ইহা আবার তার অনন্য উপাদানের দ্বারা মানব জাতিকে পরিচালনার জন্য নির্বাচিত।

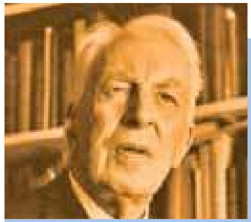
মধ্যযুগ

“If Musa Bin Nusairbeen was able to cross Europe, he would have converted it to Islam, and he would have achieved religious unity for the civilized nations. He would have also saved it from the backwardness it suffered from the darkness of the medieval ages, which was not experienced by Spain because it was under the rule of the Arabs.”

গোস্তাফ লে বন

ফরাসী ইতিহাসবিদ





পরাজিতের হাতে বিজিত বন্দী

“ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে বিজিতদেরকে বন্দী করে ফেলেছে। তাদের সভ্যতার শিল্পকলা খৃষ্টান জগতে প্রবেশ করে। ল্যাটিন রসহীন বিরক্তকর জীবন ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের কিছু ক্ষেত্র যেমন নির্মাণ প্রকৌশল ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে মধ্যযুগে একসাথে সমগ্র খ্রিষ্টান বিশ্বে ইসলামী প্রভাব ও আদর্শ অনুপ্রবেশ করে। সিসিলি ও আন্দালুসিয়া প্রাচীন আরব সাম্রাজ্যের পশ্চিমা নতুন রাষ্ট্রের দ্বারা ব্যাপকহারে প্রভাবান্বিত হয়েছিল”।

আর্নল্ড টয়েনবি
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

ইসলামী সভ্যতা কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদানে আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, সেগুলো হলোঃ

১- ঈমান ও তাওহীদঃ

সুখ-শান্তি লাভের মূল হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। ইহা জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা গঠনের মূল নিয়ামক। যে সব সভ্যতা আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা অন্তঃকলহ, পরষ্পর বিবাদে লিপ্ত। একটি অন্যটিকে ধ্বংস করে দেয়। কেননা সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ইলাহদেরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর ইহা মানুষের জীবনকে বিনষ্ট করে দেয়, দুঃখ-দুর্দশা বয়ে আনে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। } [সূরা আম্বিয়াঃ ২২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। } [সূরা মু'মিনূনঃ ৯১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার পথ অন্বেষন করত। } [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৪২]

আধুনিক ও পূর্বের অনেক সভ্যতায় এ সবের প্রতিফলন দেখা যায়। তারা যা প্রত্যাশা করে তার বিপরীতটা হয়ে থাকে। তারা যেসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া ফলাফল দাঁড়ায় উল্টোটা, ফলে মানবজাতিকে তারা দুঃখ-দুর্দশার দিকে টেনে নিয়ে যায়, যদিও তারা তাদের জন্য ভালই কামনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। } [সূরা তাওবাঃ ৩১]

২- বিশ্বজনীনতাঃ

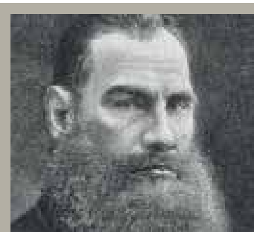
ইসলাম বিশ্বব্যাপী ধর্ম, যা সর্বযুগে, স্থানে, প্রত্যেক ভাষাভাষী, গোত্র-জাতি, বর্ণ সকলের জন্যই প্রযোজ্য ও উপযোগী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। } [সূরা সাবা' ২৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়। } [সূরা ফুরকানঃ ১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। } [সূরা আ'রাফঃ ১৫৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। } [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

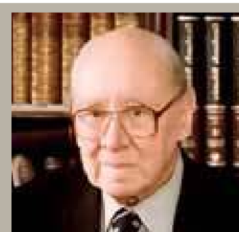
ইসলাম চিরন্তন আক্বীদা নিয়ে এসেছে যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হবেনা। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে উপযোগী ন্যায়নীতি, সৎ ও কল্যাণকর মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শরিয়ত নিয়ে এসেছে, যা সর্বস্থানে ও যুগে উপযোগী। এছাড়া আল্লাহ তায়া'লাই সর্বজ্ঞ, কিসের মাঝে তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য কল্যাণ রয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্নজ্ঞানী,সম্যক জ্ঞাত। } [সূরা মুলকঃ ১৪]



জীবনের সর্বত্রে প্রবেশ করে!!

“ইসলামই মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম ধর্ম। মুসলমানের জীবনে ইসলাম পূর্নাংগরূপে প্রবেশ করে, বরং ইহা দৈনিক জীবনের সব কর্মকান্ডকে পরিচালনা করে। আধুনিক বিশ্বে মানুষের সকল সমস্যা সমাধান ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নেই। ইহা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য”।

কপিলাল জাভা
ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক



কোথায় উপযুক্ত নেতা?!

“ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ কথা বলার মত একজন উপযুক্ত নেতা পাওয়া গেলে এ বিশ্বের বুকে ইসলাম আবারও একটি মৌলিক বৃহৎশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ পেতে পারে”।

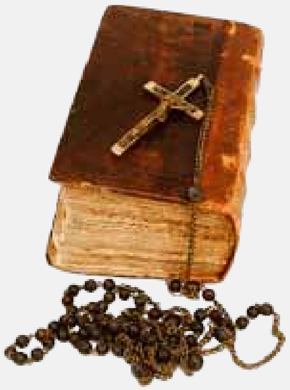
মন্টগোমারি ওয়াট
ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

এমনিভাবে ইসলাম শুধু কতিপয় গোষ্ঠী, বর্ণ, বা নির্দিষ্ট কোন জাতির ধর্ম নয়। ইহা সাদা, কালো, হলদে, লাল সব মানুষেরই ধর্ম। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল প্রজন্মেরই ধর্ম। কোন গবেষকই ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত এ ধর্মে আঞ্চলিকতা, গোত্রীয়তা ও বর্ণবাদ কখনও পাবেনা, সে যতই গবেষণা করুক, আর তাকে যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি দান করা হোক। ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলাম হলো বিশ্বজনীন দাওয়াত, ইহা কোন নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু ইসলামের নীতিমালা, শরিয়াত, আহকাম ও আখলাক সব কিছুই সকল মানুষের জন্য সর্বযুগে ও স্থানে উপযোগী।

অতএব, আমরা একথা বলতে পারিনা যে, ন্যায় বিচার বা সুন্দর আচরণ কোন কোন জাতির ক্ষেত্রে বা কোন যুগে উপযোগী নয়। ইহা শুধু ইসলামের জন্যই খাস। অন্যদিকে কিছু ধর্মে আঞ্চলিকতা, গোত্রীয়তা বা জাতীয়তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মের লোক ছাড়া অন্যান্যদের সাথে যখন লেনদেন ও আচরণ করে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তোদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না-যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৭৫]

ম্যাথুর ইঞ্জিল

"আমি তাকে পথভ্রষ্ট বনী ইসরাঈলের চারণভূমিতে পাঠিয়েছি। যখন তিনি ইহুদীদেরকে আহবান করার জন্য তাদের মধ্য থেকে বার জনকে নির্বাচিত করলেন, তখন তাদেরকে এ বলে উপদেশ দিলেনঃ তোমরা অন্য জাতির পথে চলবেনা। সামেরীদের শহরে প্রবেশ করবেনা। বরং তোমরা এ উপত্যকা দিয়ে পথহারা বনী ইসরাঈলের চারণভূমিতে যাও"।







৩- জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবাসন ও নির্মানের সভ্যতাঃ

মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে জমিনের আবাদ কর্মে খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন।} [সূরা হুদঃ ৬১]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।} [সূরা ফাতিরঃ ৩৯]

নির্মাণ এবং স্থাপত্য

"ইসলাম প্রতিভা, মেধা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্টকে স্বীকার করে। ইহা নির্মান ও স্থাপত্যের ধর্ম, ধ্বংস ও বিনাশের ধর্ম নয়। উদাহরণ স্বরূপ, কারো কাছে যদি আবাদি ভূমি থাকে আর সে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়ায় উহা চাষাবাদ না করে পতিত করে ফেলে রাখে, তবে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পেরিয়ে গেলে উক্ত ভূমি স্বাভাবিক ভাবে সর্বসাধারণের ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। তখন ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম উহাতে বীজ বপন করবে সে উক্ত ভূমির মালিক হবে"।

স্যার চার্লস এডওয়ার্ড আর্শিব্যাল্ড

ইংরেজ রাজনীতিবিদ



আত্মশুদ্ধি

“বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে ইসলামই সবচেয়ে উপযোগী ও প্রযোজ্য ধর্ম। ইহা আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে কার্যকরী এবং ন্যায় পরায়ণতা, ইহসান ও উদারতা বহনকারী ধর্ম”।

গোস্তাফ লে বন

ফরাসি ইতিহাসবিদ

যে সব জ্ঞান মানব জাতির কোন না কোন উপকারে আসে বা জমিনের আবাদ কার্যে লাগে সে জ্ঞান সকলে ছেড়ে দিলে সবাই গুনাহগার হবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময় প্রেরিত হয়েছিলেন যখন মানব জাতি সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। যখন মানুষ সমাজ গঠন, কাজকর্ম ও জমিনের আবাদ কাজ ছেড়ে অনর্থক দর্শন, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাঁটির মাঝে লিপ্ত থাকত। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতিকে এ সব কর্ম থেকে মুক্ত করলেন, তাদের মর্যাদা উঁচু করলেন, তাদেরকে তিনি ইসলাম ধর্ম দিয়ে মর্যাদাবান করেছেন। ইহা সভ্যতা, উন্নয়ন ও সমাজ বিনির্মানের ধর্ম। এতে সমাজ উন্নয়ন ও আত্মিক আলোকদীপ্ততার মাঝে কোন বিরোধ নেই। তাই মুসলমানের অন্তরে ইবাদত ও পার্থিব কাজের মাঝে এবং পৃথিবীর উন্নয়ন কাজের সাথে আত্মিক জীবন ও আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের কোন বৈপরিত্য নেই। বরং সব কাজই আল্লাহর জন্যই এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।} [সূরা আন'আমঃ ১৬২]





জনসমক্ষে ঘোষণা

“আপনারা সকলেই জানেন যে, আমি মহান পৌত্তলিক নেতা ‘গান্ধী’র ছেলে হিরালাল, আপনাদের সকলের সামনে এবং এই বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্মুখে আমি ইসলামের প্রতি আমার ভালবাসা ঘোষণা করলাম। আমি কোরআনকে ভালবেসেছি, এক আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লালু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি। তিনি সর্বশেষ নবী, তার পরে কোন নবী আসবেন না। তিনি যে কোরআন নিয়ে এসেছেন তা সত্য, আসমানী সব কিতাবই সত্য, সমস্ত আম্বিয়া ও রাসুলগণ সত্য। ইসলাম ও কোরআনের জন্যই আমি বাঁচব, ইহার জন্যই জীবন দিব, ইহার থেকে সমস্ত অপবাদ প্রতিহত করব। আমি ইহার একজন শক্তিশালী স্তম্ভ হবো, আমার সম্প্রদায়ের কাছে আমি ইহার একজন সুসংবাদদাতা ও প্রচারক হবো। একত্ববাদের এ ধর্মটি জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতি, ন্যায় পরায়ণতা, আমানত, দয়া ও সমতার ধর্ম”।

আব্দুল্লাহ হিরালাল গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর পুত্র

৪- শিষ্টাচার ও নৈতিকতার সভ্যতাঃ

ইসলামে শিষ্টাচার হলো ইবাদত। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই হলো মহান চরিত্রকে পরিপূর্ণ করা। তিনি বলেছেনঃ “আমি সুন্দর চরিত্রকে পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি”। [বর্ণনায় ইমাম মালিক রাঃ]। অতএব, সভ্যতা ও সুখ-শান্তির পথ হলো শিষ্টাচার ও নৈতিকতার পথ, যাতে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়।

ইসলামে আখলাক জীবনের সব ক্ষেত্রকেই শামিল করে। যেমনঃ মানুষ নিজের সাথে ব্যবহার, আল্লাহর সাথে ও অন্যান্যদের সাথে তার আচার ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই শামিল করে। এমনিভাবে মুসলমান-কাফির, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা ও স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলের সাথে আচার ব্যবহার আখলাকের মধ্যে শামিল। ইসলাম অন্যের সাথে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বদান্যতা, বীরত্ব, ন্যায়নীতি, রহমত, নম্রতা, উত্তম শিষ্টাচার, সততা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, বিশুদ্ধ অন্তর ও ভাল কাজের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমনকি বিপক্ষ লোকের বেলায়ও নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ {হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।} [সূরা মায়েদাঃ ৮]

তিনি তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য তাঁকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইহা শুধু ঈমানদারদের জন্য খাছ নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]



ইসলামী সভ্যতায় এ আখলাকসমূহ অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা আলাদা করা যায়না এবং ইহা ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি। অতএব, পৃথিবীর আবাদ কার্যে, বা কোন স্বার্থে বা অন্য কোন কারণে মুসলমানের থেকে এ সব সুন্দর আখলাকসমূহ কোনভাবেই চলে যেতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বকাজের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও অনুপম নমুনা করতে সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।} [সূরা আহযাবঃ ২১]

একে তিনি তাঁর রহমতের একটি অংশ ও শান্তির পথে মানুষের হিদায়েতের উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল,দয়াময়।} [সূরা তাওবাঃ ১২৮]



৫- বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার সভ্যতাঃ

ইসলাম ধর্মে পৌরহিত্যের কোন স্থান নেই, যাকে কোন প্রশ্ন করা যাবেনা, বা কোন গোপনীয় রহস্য সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা যাবেনা। বরং আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নিদর্শনাবলী, সৃষ্টি ও অন্যান্য জাতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, [তারা বলে] পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৯১]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেছেনঃ {এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে।} [সূরা ইউনুসঃ ২৪]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেছেনঃ {প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশনাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তোদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।} [সূরা নাহলঃ ৪৪]

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।} [সূরা রূমঃ ৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।} [সূরা হাশরঃ ২১]

বরং আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইলম বা জ্ঞান শুধু ধারণা করা নয়, বরং এ ব্যাপারে তার অকাট্য দলিল প্রমাণ থাকতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।} [সূরা বাকারাঃ ১১১]

অতএব, ইসলামে এমন কোন রহস্য নেই যা কেউ জানেনা, বা এমন কোন গোপনীয়তা নেই যা পৌরহিত ছাড়া কেউ জানেনা।

৬- অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত শান্তি ও নিরাপত্তার সভ্যতাঃ

অভ্যন্তরীণ শান্তি বলতে মানুষের মনের শান্তি ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে মুক্ত হওয়াকে বুঝায়, আধুনিক সভ্যতায় মানুষ এ সব সমস্যার খুব সম্মুখীন হয়। কিন্তু ইসলামে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের চিন্তা ভাবনা নিয়ে বসবাস করে। ইবাদত, দুনিয়ার কাজকর্ম ও নির্মাণ একই সাথে করে থাকে, পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সাথে সহাবস্থানে বাস করে। এ সবের মাঝে কোন বিরোধ নেই। ইসলামী সভ্যতায় অভ্যন্তরীণ শান্তি একটি স্পষ্ট নিদর্শন, যা তাওহীদ হতে উৎসারিত, মুসলমানের অন্তরে যা কিছুই আসে সব কিছুই সহজ ও সুন্দরভাবে সুবিন্যাস্ত করে দেয়। ইসলামে দুনিয়া মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, বরং ইহা আখেরাতের জন্য শস্য ক্ষেত্র ও পথ ও খেয়া স্বরূপ। ইহা আল্লাহ তায়া'লার নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়ঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।} [সূরা কাসাসঃ ৭৭]



বিবেক ও যুক্তি

"ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্যের বিষয় হলো ইহা বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা তার অনুসারীদেরকে খোদাপ্রদত্ত এ জীবন্ত দক্ষতাকে বাদ দিতে কখনও বলেনা। এমনিভাবে ইসলাম গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহিত করে। ইহা তার অনুসারীদেরকে ঈমান আনার আগেই গবেষনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিন্তা ভাবনা করতে আহবান করে। ইসলাম নিম্নোক্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রবাদটি সমর্থন করেঃ সব জিনিসের সঠিকতার উপর প্রমাণ পেশ করো, অতঃপর যেটি তোমার জন্য কল্যানকর সেটি গ্রহণ করো। এতে আশ্চর্যের কিছুই নাই; কেননা হিকমত হলো মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাবে সেখান থেকে কুঁড়িয়ে নেয়ার সেই অধিক হকদার। ইসলাম বিবেক ও যুক্তির ধর্ম। এজন্যই দেখা যায়, ইসলামের নবী মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ প্রথম শব্দটিই হলো "ইকরা" অর্থঃ পড়। এমনিভাবে দেখা যায় ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষনাই হলোঃ ঈমান আনয়নের পূর্বে চিন্তা ভাবনা করে দেখার আহবান। অতএব, ইসলামই সত্য ধর্ম, ইহার অস্ত্র হলো জ্ঞান বিজ্ঞান, আর শত্রুহলো অজ্ঞতা"।

আরোন লিওন

আরোন লিওন

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর,যাতে তোমরা সফলকাম হও।} [সূরা জুম'আঃ ১০]

অর্থাৎ যখন নামাজ সমাপ্ত হবে তখন দুনিয়ার কাজে ছড়িয়ে পড়, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল উপার্জন হয়। আর এতে ইখলাস অন্বেষণ কর, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদেরকে বলেছেনঃ «তুমি যা কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যয় করবে তাতেই প্রতিদান পাবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও তার জন্যও। »। (ইমাম মালিক এটি বর্ণনা করেছেন।) অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর মুখে যা দাও তাতেও সাওয়াব পাবে। অতএব আমাদের দুনিয়ার কোন কাজই আখেরাতের থেকে আলাদা নয়। তবে শর্ত হলো আখেরাতকে ছেড়ে শুধু দুনিয়ার মাঝে ডুবে থাকা যাবেনা। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।} [সূরা মুনাফিকূনঃ ৯]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।} [সূরা কাসাসঃ ৭৭]

কাজের প্রতি ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, ছেলে সন্তানদের সাথে আনন্দ করা ও তাদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া ইত্যাদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরিয়তের নির্দেশিত পথে করলে দ্বীন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।} [সূরা আন'আমঃ ১৬২]

অসাধারণ শ্রেষ্ঠ সমাধান

"আল কোরআন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সব সমস্যার চমৎকার সমাধান দিয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট দাওয়াত প্রচারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফলতায় কোরআনের প্রজ্ঞার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। আমার মতে, আমরা যে ধর্মেরই হই, আল কোরআনের বানীকে আমাদের ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতার মূল প্রবাহ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত"।

মন্টগোমারি ওয়াট

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



মানুষের পুরা জীবনই আল্লাহ তায়া'লার জন্য, এমনকি যাতে মানুষের নফসের ইচ্ছা মিটে নিয়্যাত বিশুদ্ধ হলে তাও আল্লাহর আনুগত্য হবে।

বাহিরের শান্তি হলো স্বপক্ষ বা বিপক্ষ নিকটতম ও দূরতম সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এক মুসলিমের সাথে অন্য মুসলিমের সাক্ষাতে ইসলামের প্রথম অভিবাদনই হলোঃ «আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ» অর্থঃ আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। ইসলামী শাসনের যুগে সমস্ত ধর্ম যেরূপ সুখী ও নিরাপদ ছিল অন্য কোন যুগে সেরূপ আর আসেনি। মুসলমানের পতনের কারণে বিশ্ব কত কিছুইনা হারালো। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শুত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।} [সূরা মায়েদাঃ ২]



উত্তম জীবন

"আমরা যদি ইসলামের প্রতি সুবিচারক হই, তবে আমাদের একথার সাথে একমত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় যে, ইসলামের শিক্ষাসমূহ কার্যকর শক্তিশালী, যা কল্যাণের দিকে ডাকে। এ শক্তিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে মানুষ উত্তম জীবন লাভ করতে পারে,যাতে নৈতিকতার দৃষ্টিকোণে কোন অপরিচ্ছন্নতার অবকাশ থাকেনা। ইসলামের এ সব শিক্ষাসমূহ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়া, মানুষের সাথে আমানত রক্ষা, ভালবাসা, ইখলাস ও কুরিপু দমন ইত্যাদির দিকে ডাকে। এভাবে সব ভাল গুনের দিকে আহবান করে। এর ফলে একজন সঠিক মুসলমান নৈতিকতার যাবতীয় সূক্ষ্ম ধারা তার জীবনে প্রস্ফুটিত করে সুন্দর জীবন যাপন করে"।

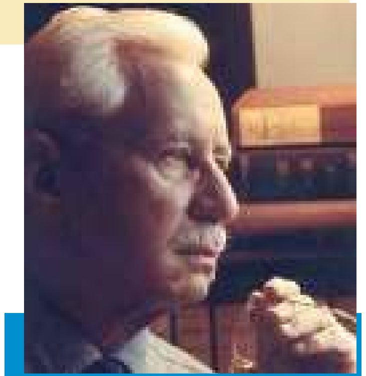
গোল্ড জিহের

ইহুদী প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

৭- আন্তরিকতা ও ভালবাসার সভ্যতাঃ

ইসলামী সভ্যতা তার প্রত্যেক সদস্যের উপর স্বচ্ছ ও পরিস্কার হৃদয়ের অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যকীয় করে। আল্লাহ তায়া'লা মু'মিনদের দোয়া সম্পর্কে বলেনঃ {আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।} [সূরা হাশরঃ ১০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।} [সূরা শুআ'রাঃ ৮৮-৮৯]



মহামানবের নৈতিকতা

"মুসলমানরা খৃষ্টানদের চেয়েও অনেক পরিপূর্ণ মানুষ। তারা তাদের চেয়ে অধিক ওয়াদাপূরণকারী, পরাজিতের প্রতি বেশি দয়াশীল। তাদের ইতিহাসে দেখা যায় যখন তারা ১০৯৯ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিল, তখন খ্রীষ্টানদের তুলনায় তারা খুব কমই হিংস্রতায় লিপ্ত হয়েছে। "।

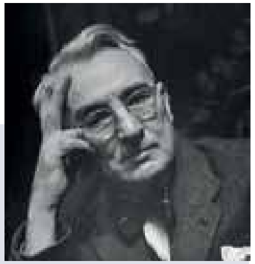
উইলিয়াম ডুরান্ট

মার্কিন লেখক

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «তোমরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়োনা, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করোনা, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করোনা, বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশী তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা জায়িয নয়; এভাবে যে, তারা মিলিত হলে একে অন্যের থেকে ফিরে থাকবে, তাদের মধ্যে উত্তম সেজন যে প্রথমে সালাম দিবে»। (মুসলিম শরীফ)। রাসুল (সাঃ) ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে বলেছেনঃ «যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, তোমরা ঈমান আনা ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবেনা, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পরস্পরকে ভাল না বাসবে ততক্ষণ পরিপূর্ণ ঈমানদার হবেনা। আমি কি বলে দিব না কোন জিনিস তোমাদের জন্য এগুলোকে দৃঢ় করবে? তোমরা নিজেদের মাঝে বেশী বেশি সালামের প্রচলন কর»। (তিরমিজি শরীফ)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেনঃ প্রত্যেক মাখমুম (পরিচ্ছন্ন) অন্তর, সত্যবাদী জবান। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেনঃ সত্যবাদী জবান আমরা চিনি, কিন্তু মাখমুম অন্তর বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেনঃ প্রত্যেক স্বচ্ছ ও পবিত্র অন্তর, তাতে কোন গুনাহ বা পাপ নেই, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ ও হিংসা বিদ্বেষ নেই»। (ইবনে মাজাহ শরিফ)।



[redacted]



আত্মিক আনন্দ

“আমার কাছে এখন দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বড় নেয়ামত হিসেবে বিবেচিত, যেমনিভাবে জীবন যাপনের জন্য শক্তি, সুঠাম খাদ্য ও নির্মল পানির খুবই প্রয়োজন। এসব কিছু মানুষকে আরামদায়ক জীবন দান করে, কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা এর চেয়েও বেশি। ইহা আমাকে আত্মিক আনন্দ যোগান দেয়, অথবা উইলিয়াম জেমসের ভাষ্যমতে, ইহা জীবন যাপনের জন্য শক্তির সঞ্চয় করে, পরিপূর্ণ, সুখী ও পরিতুষ্ট জীবনের জন্য ইহা চালিকাশক্তি। ইহা আমাকে ঈমান আনয়ন, আশা ও বীরত্বে সাহায্যকারী। আমার থেকে ভয়ভীতি, বিষন্নতা ও অস্থিরতা দূর করে। ইহা জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পাথেয় স্বরূপ। ইহা আমার সম্মুখে শান্তির সীমানা বিস্তৃত করে, জীবনের মরুময় ময়দানে সবুজ শ্যামল উর্বর চরিত্রের পথ খুলে দেয়”।

ডেল কার্নেগী

মার্কিন গ্রন্থ প্রণেতা

নাসরী সালহাব

লেবানীজ লেখক



ইসলামের মাহাত্ম্য

“আমাদের লেখনী যতই প্রাঞ্জল হোক ইসলাম আমাদের কলমের মুখাপেক্ষী নয়; বরং আমাদের কলমই ইসলামের মুখাপেক্ষী......যেহেতু এতে রয়েছে আত্মিক ও নৈতিক এক মহাভান্ডার...এর চমৎকার কোরআনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি”।

৮- আত্মিক ও পার্থিব সভ্যতাঃ

ইসলামী সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার আলো নিয়ে আসলেও একই সময়ে পার্থিব বিষয়কে ভুলে যায়নি বা অবহেলা করেনি। আল্লাহ তায়া’লা মানুষকে দেহ ও রূহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জীবন যাপনের জন্য মানুষের দৈহিক ও আত্মিক দিকের সব উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। শরীরের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, যাতে সে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে। আত্মার খাদ্য হিসেবে নবী রাসুলদের মাধ্যমে আসমানী অহী নাযিল করেছেন। মানুষকে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়া’লা বলেছেনঃ {আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।} [সূরা হিজরঃ ২৮-২৯]

রূহ ও শরীর পরস্পর মিশ্রিত, যা মৃত্যু ছাড়া একে অন্য থেকে আলাদা হয়না। রূহ ও শরীরের আলাদা আলাদা চাহিদা রয়েছে। খাদ্য, পানীয় এবং পোশাক পরিচ্ছেদের মাধ্যমে শরীর বেঁচে থাকে। যদি এর একটিও অপূর্ণ করি তবে পুরা শরীরে এর প্রভাব ফেলবে। মানুষ যদি খাদ্য গ্রহণে কমতি করে তাহলে সে দুর্বল ও ধ্বংসের দিকে যাবে, সে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবেনা। এমনিভাবে পানীয় ও পোশাক পরিচ্ছেদও।

শরীরের কোন একটি চাহিদা অপূর্ণ রাখলে এর প্রতিফলন পুরা শরীরে পড়ে, সে জীবনধারণে শক্তি পায়না, সুখ-শান্তির জীবন যাপনে জীবনের অন্য অংশেরও সাহায্য করতে পারেনা। এমনিভাবে রূহেরও রয়েছে কতিপয় চাহিদা। ভালবাসা, বদান্যতা ও আত্মত্যাগ ছাড়া রূহ বাচঁতে পারেনা। রূহ কিভাবে বাঁচবে সে যদি এমন একজন প্রভু না পায় যার ইবাদত করবে, যাকে ভালবাসবে, তার নিকট প্রত্যাশা করবে, তাঁকে ভয় করবে, তার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে?! রূহ কিভাবে বাঁচবে যদি উহা শূন্য হৃদয় হয়, কারো উপর ভরসা ও কারো নিকট শান্তি লাভ না করতে পারে। অথবা যদি নিরাপত্তা, বদান্যতা, অন্তরের শান্তি, মানুষের মাঝে ভালবাসা না পায়?! মানুষ যদি রূহের চাহিদাগুলো পূর্ণ না করে তাহলে সে যেমন তার খাদ্য ও পানীয়তে ত্রুটি করল। কিভাবে মানুষের অবস্থা শান্ত হবে? তার অবস্থা কিভাবে স্থির হবে তার অন্য অর্ধেক যদি ব্যথায় আক্রান্ত হয়?! দুঃখের বিষয় হলো পশ্চিমা সভ্যতা রূহের আনন্দ খুশীর ব্যাপারটা ভুলে গেছে, ফলে তারা ভোগ বিলাসের চরম পর্যায়ে পৌঁছলেও দুনিয়াতে দুর্ভাগা ও দুঃখী। আধুনিক সভ্যতা শরীর ও পার্থিব সেবায় অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কিন্তু সে ভুলে যায় যে, রূহ ছাড়া শরীরের কোন সুখ, সফলতা, আনন্দ ও প্রশান্তি আসতে পারেনা। বরং এটাকে কোন সভ্যতাই বলা যায়না।

৯- ইসলামী সভ্যতা মানব ও মানবাধিকারের গুরুত্ব দেয়ঃ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মানবাধিকার বাস্তবায়ন করাই কোন রাষ্ট্রের ন্যায়নীতি, ইনসাফ, দেশের মানুষের অধিকার রক্ষা ও তাদের স্বাধীনতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। ইহা উক্ত জাতির জ্ঞান গরিমা ও সচেতনতার মাপকাঠি। বরং গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানবাধিকার রক্ষা করা।

ইসলামী সভ্যতা পৃথিবীর বুকে বাস্তবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এক মহা উপমা ও নমুনা প্রবর্তন করেছে। ইহা ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব, কেননা ইহা শুধু কথা



দোষ আমাদের মাঝে

“এটা আমাদের কাছে একেবারেই স্পষ্ট যে, মুসলমানদের অবহেলাই -ইহা ইসলামের ত্রুটি নয়- বর্তমান অধঃপতনের কারণ”।

লিউপোল্ড উইস

অস্ট্রীয় চিন্তাবিদ

বা শ্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়। এজন্যই ইসলামে অন্যতম মানবাধিকার হলো নিম্নরূপঃ

১. ইসলামে মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হলো সার্বভৌমত্ব ও শাসন হলো একমাত্র মহান আল্লাহ তায়া'লার। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।} [সূরা আন'আমঃ ৫৭]

ফলে ইসলামী প্রকল্পে অধিকারের ক্ষেত্রে সৃষ্টির প্রতি ও তার প্রয়োজনের প্রতিআল্লাহ তায়া'লার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা হয়।

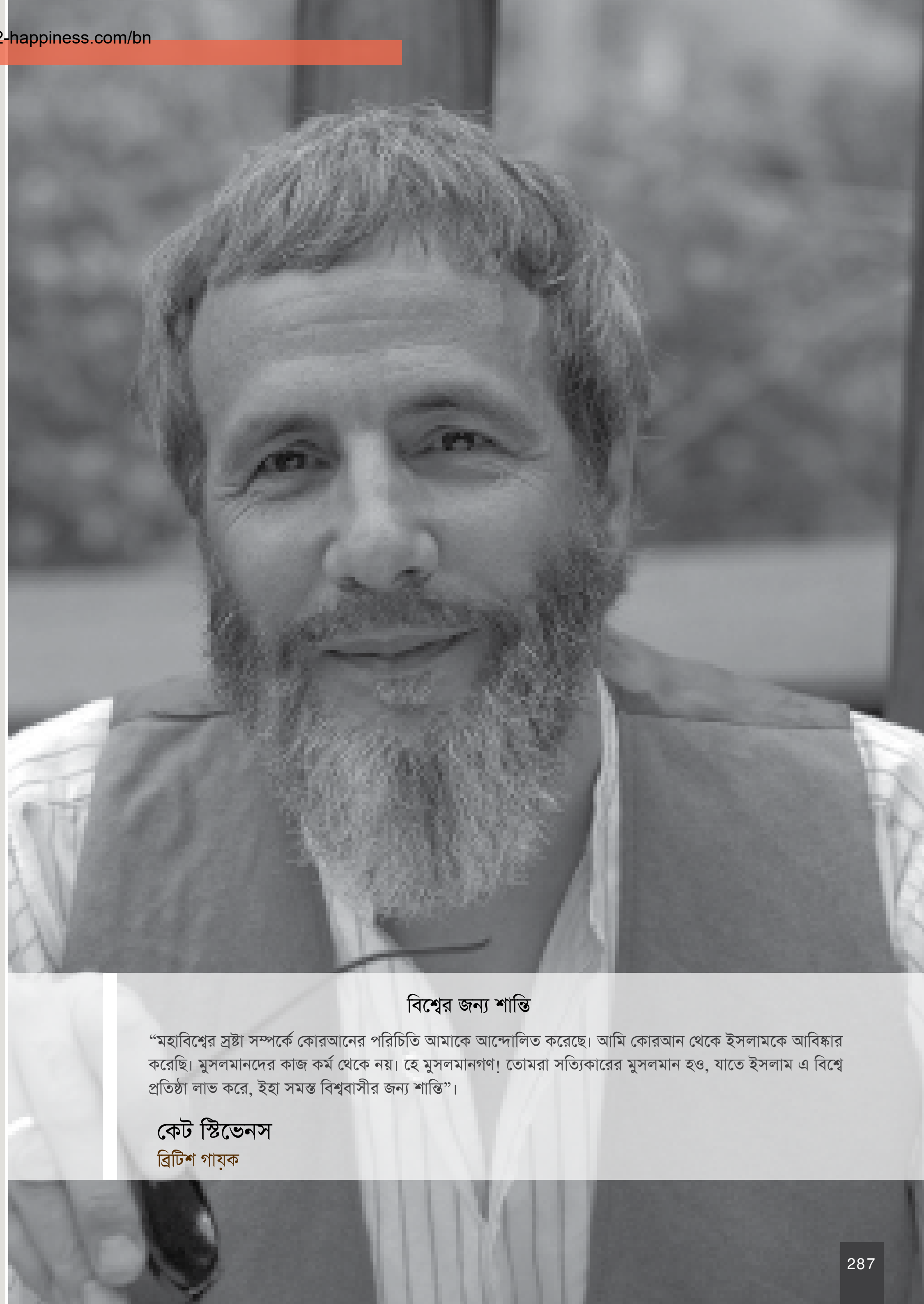
২. স্থায়ীত্বঃ স্থান, কাল, সমস্যা ও অবস্থার পরিবর্তনের কারণে এ অধিকার পরিবর্তীত হয়না।

৩. অধিকারকে ইহসান ও ইখলাসের স্থান থেকে বিবেচনা করা। ইসলামে অধিকার সে স্থান থেকে উৎসারিত যেখানে বান্দাহ আল্লাহ তায়া'লার ভয় ও আশঙ্কায় থাকে, ইহাই রাসুলের [সাঃ] কথা অনুযায়ী ইহসানের দরজা। তিনি বলেছেনঃ « ইহসান হলো তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখতেছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পারো তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন»। (মুসলিম শরিফ)।

৪. মানবাধিকার ও ধর্মের প্রকৃতির মাঝে সঙ্গতি ও সম্পূরকতাঃ ইসলাম মানুষের জন্য শুধু অধিকার দিয়েই ছেড়ে দেয়নি, ইহা বাস্তবায়নে যথাযথ পরিবেশ ও শরয়ী আহকামের সীমারেখা নির্ধারন ও শরিয়তের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। একে ইসলামের শিষ্টাচার ও আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সে সব শিষ্টাচারকে অধিকারের মধ্যে শামিল করে সর্বশেষে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এরমূল উৎস আল্লাহর পক্ষ হতে গণ্য করেছে। এজন্যই এসব অধিকারকে শুধু অধিকারই নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে ধরা হয়। তাই ইসলামে অধিকারসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সম্পূরক।

৫. ইসলামে মানবাধিকারের ধরণ হলো, ব্যক্তিগত অধিকার থেকে সমষ্টিক অধিকার উৎসারিত হয়, যা মানব রচিত সমাজ ব্যবস্থার বিপরীত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবাপৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।} [সূরা মায়েদাঃ ৩২]





বিশ্বের জন্য শান্তি

"মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে কোরআনের পরিচিতি আমাকে আন্দোলিত করেছে। আমি কোরআন থেকে ইসলামকে আবিষ্কার করেছি। মুসলমানদের কাজ কর্ম থেকে নয়। হে মুসলমানগণ! তোমরা সত্যিকারের মুসলমান হও, যাতে ইসলাম এ বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইহা সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি"।

কেট স্টিভেনস

ব্রিটিশ গায়ক

৬. অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার আগেই ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছেঃ ইসলাম যে সব মানবাধিকার দিয়েছে তা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাত বা বিপ্লব বা আন্দোলনের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেমনটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ইতিহাসে দেখা যায়। ফ্রান্স, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে যেভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং ইসলামে মানবাধিকারের মৌলনীতি ও আহকাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পূর্বের কোন আলোচনা, আন্দোলন বা প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৭. বাস্তবসম্মত, জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ও মানুষের প্রয়োজন মিটায়; যা অন্যান্য ব্যবস্থার বিপরীত, কেননা তা দার্শনিক ভাবধারায় চিত্রিত।

৮. ইসলামে একক কতিপয় মানিবাধিকার রয়েছে, যা অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় পাওয়া যায়না, যেমনঃ পিতামাতার অধিকার, নিকটতম ও দূরতম আত্মীয়স্বজনের অধিকার, ভ্রূণের অধিকার, ব্যক্তির ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষার অধিকার, হালাল উপায়ে উপার্জনের অধিকার ও সুদ থেকে বারণ করার অধিকার, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের থেকে নিষেধ করার অধিকার।

৯. ইসলামে মানবাধিকারের মূল হলো সর্বপ্রথম মানুষকে সম্মান করা, আল্লাহর উপর ঈমান আনার মাধমে আবেগময় অনুভূতিকে আলোড়িত করা।অন্যান্য মতবাদ তার ব্যাতিক্রম। এ বিশ্বে যা কিছু মানুষের কল্যাণে অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে তা জীবনের সাথে সংগতিপূর্ন ও পরিপূরক, ইসলামের মানবাধিকারের মূলে এ বিষয়টিও রয়েছে।

ইতিহাসে অন্য কোন সভ্যতাকে দেখা যায়না যা স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করেছে। কত সহজে মানবাধিকারের সস্তা বুলি, শ্লোগান আর পেষ্টুন উত্তোলন করা যায়, কিন্তু এর আড়ালের প্রকৃত উদ্দেশ্য আর গোপন স্বার্থ অপ্রকাশ্যই থেকে যায়; যখন সন্দেহভাজন লোকেরা সেই তথাকথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারী হয়ে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্য সভ্যতা নিয়ে আগমন





করয়েছেন; কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের পশ্চাদপসরতা ও অবস্থা দেখলে নানা প্রশ্ন জাগে, অথচ ইসলামী সভ্যতা তাদেরকে কতকিছু দান করেছে?! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বর্তমানে মুসলমানেরা তাদের দ্বীনের উপর নেই, তাদের অনেকেই ইসলামের মূলনীতি, শিক্ষা ও কোরআন হাদীসের থেকে দূরে সরে গেছে। নতুবা ইসলামী সভ্যতার মত আর কোন সভ্যতাই নাই যা মানব জাতিকে সুখী ও সৌভাগ্যবান করতে পারে। ইতিহাসের পাতায় দেখলে ও উদারমনা ও ন্যায়নীতিবানদের কথা শুনলে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাবে যে, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?!



শূণ্য বিশ্ব

“মুসলমানরা পূর্বের মতই দ্রুত তাদের সভ্যতাকে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিতে পারে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে তারা পূর্বের মত আখলাকে ফিরে যাবে। কেননা এ শূন্য বিশ্ব তাদের সভ্যতার শক্তির সামনে মুকাবিলা করতে পারবেনা”।

মার্মাডোক ব্যাকটাল

ইংরেজ লেখক



কোরআন ও সুন্নতের বিস্ময়ঃ

প্রত্যেক রাসুলেরই তাদের নবুয়াত ও রিসালাতের সত্যতার জন্য কিছু মুজিযা ও নিদর্শন থাকে। যেমনঃ মূসা [আঃ] এর মু'জিযা ছিল তাঁর লাঠি, ঈসা [আঃ] এর মু'জিযা ছিল কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে অরোগ্য করা, আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করা। সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত যেহেতু সর্বযুগে ও স্থানে প্রযোজ্য ও অবশিষ্ট তাই তাঁর মু'জিযাও ছিল সেসবের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন। কোরআন যেহেতু হিদায়েতের কিতাব, তাই এ মোবারকময় কিতাব সব কিছুরই বিস্ময় ও রহস্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সত্যতা প্রমাণে এ কোরআন বিস্ময় ছিল ও আছে, ইহা স্রষ্টা, রিজিকদাতা, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এ কিতাব সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ, সর্বকালে ও স্থানে সকলের জন্য প্রযোজ্য। উপরোল্লেখিত নানা রহস্য ও বিস্ময় ছাড়াও আল কোরআন বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যের ব্যাপারেও মহাবিস্ময়কর। কোরআনে প্রকৃতির নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্য বর্ণিত হয়েছে, যা বর্তমানে অনেক গবেষকের প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞান সে সব কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপঃ মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ, ভ্রূণের সৃষ্টি, যা শত শত বছর পূর্বে মানুষ এ সম্পর্কে কিছু জানার আগেই কোরআন এ সম্পর্কে সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।} [সূরা মু'মিনূনঃ ১২-১৪]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?} [সূরা যুমারঃ ৬]

চিকিৎসকেরা যখন তাদের তথ্যসূত্র ও আবিষ্কারের মূলে চিন্তা গবেষণা করেছেন, তখন তারা মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে বলেছেন সেভাবেই পেয়েছেন।

এছাড়াও শরীরে মানুষের অনুভূতির স্থানগুলোর ব্যাখ্যায়ও তারা কোরআনের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।} [সূরা নিসাঃ ৫৬]

মহাশূন্যের প্রশস্ততার বর্ণনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী।} [সূরা যারিয়াতঃ ৪৭]

সূর্য তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়নের বর্ণনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি,আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি,তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী,সর্বজ্ঞ,আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।} [সূরা ইয়াসিনঃ ৩৭-৩৮]

এ সব বিস্ময়কর ও রহস্যময় তথ্যের ব্যাপারে রাসুলের হাদীসও অনেক তথ্য দিয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «বনী আদমের প্রত্যেককে তিনশত ষাটটি » [৩৬০টি গ্রন্থি] জোড়া দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে ঐ তিনশ' ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহু আকবর, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ বললো, ও মানুষের চলার পথ থেকে একটি পাথর বা একটি কাঁটা বা একটি হাড় সরালো অথবা কাউকে কোন ভাল কাজের উপদেশ দিলো অথবা কোন খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করলো, ঐ দিন সে নিজেকে দোযখ থেকে দূরে রাখলো। (মুসলিম শরীফ)।



ভ্রূণের বর্ণনা

"আল কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন ধরণের জটিলতা আমি পাইনি। কেননা কোরআনে বর্নিত ভ্রূণের বর্ণনা সপ্ত শতাব্দীতে জানা সম্ভব ছিলনা। এসব কিছু জানার বিবেকসম্মত একমাত্র উপায় ছিল আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেরিত অহী"।

প্রফেসর আসুধা কুঝান

টোকিও পর্যবেক্ষণ অধিকর্তা



বর্তমানে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ শরীরে এ সব গ্রন্থি ছাড়া এ জীবনে তার অস্তিত্বের স্বাদ ভোগ করতে পারেনা। তার উপর খিলাফতের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আদায় করতে সক্ষম হয়না। এজন্যই মানুষের উচিত প্রত্যহ আল্লাহ তায়া'লার সে সব নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, যা প্রত্যেক সৃষ্টিকে সুনিপুণ পরিমাপে মহান স্রষ্টার সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। এ হাদীসের বিস্ময়কর ব্যাপার হলো মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের শরীরের গ্রন্থি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলেছেন, তিনি এমন এক সময় এ সব তথ্য দিয়েছেন যখন মানুষের পক্ষে এ সব জানা সম্ভব ছিলনা, এ সম্পর্কে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও ছিলনা। এমনকি একবিংশ শতাব্দির অনেক মানুষই তা জানেনা, বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক বিশেষজ্ঞরাও জানতনা!! কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের শরীরে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে নির্ধারণ করে গেছেন। সেগুলো হলোঃ মেরুদন্ডে [১৪৭] টি, বুকে [২৪] টি, শরীরের উপরি অর্ধভাগে [৮৬] টি ও নিম্নার্ধভাগে [১৫]টি এবং মধ্যভাগে [২৯] টি গ্রন্থি রয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হলো যে, মহান আল্লাহ তায়া'লা ছাড়া কে সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিজ্ঞানের এ সব অতিসূক্ষ্ম তথ্য শিক্ষা দিয়েছে, বিংশ শতাব্দী ছাড়া যে সব তথ্য মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি?!

কার পক্ষে সম্ভব ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সব অদৃশ্যের বিষয় নিয়ে জানানো?! সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ তায়া'লা জানতেন যে, একদিন মানুষ শরীরের এ সব সূক্ষ্ম রহস্যের ব্যাখ্যা জানতে পারবে, তখন এ হাদীসের নূরানী ইশারাই তার রাসুলের সত্যতা ও আসমানী অহীর সাথে তার সম্পর্কের সত্যতার সাক্ষ্য হবে।

তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ যতক্ষণ আখলাক চরিত্রের পথ না হবে, তাহলে উহা ধ্বংসাত্মক সভ্যতা, নিশ্চিহ্ন, দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের জ্ঞান হবে। মানুষকে সুখী করা ও তাদের সেবায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান হবেনা। এজন্যই জ্ঞান ও সভ্যতার পথ আখলাকেরও পথ। এমনিভাবে জ্ঞান ও সভ্যতা ছাড়া সুখ-শান্তির পথ শুধুই কল্পকাহিনী ও অবিশ্বাস্য। অতএব, আখলাক ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ ব্যক্তি, জাতি, সমাজ ও মানবতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।



নিরক্ষর রাসুল

"আমাদের বিবেক দিশেহারা হয়ে যায় যখন ভাবি, কিভাবে এ সব আয়াত একজন নিরক্ষর লোক হতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচ্যের সকলেই একমত যে, কোরআনের আয়াতসমূহ শাব্দিক বা আর্থিক যেকোন ভাবেই হোক তৈরি করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়"।

হ্যানরী দ্যি কাষ্টারী

ফরাসি সাবেক সেনা অফিসার

মহাবিশ্বের বিস্ময়

"জাহেলিয়াতের যুগে বসবাস করে একজন নিরক্ষর লোক মুহাম্মদ কিভাবে কোরআনে উল্লেখিত মহাবিশ্বের সে সব রহস্য সম্পর্কে জানল যা এখনও আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি? ইহা এটাই প্রমাণ করে যে, ইহা আল্লাহ তায়া'লার কালাম"।

ডেবোরা পটার

মার্কিন মহিলা সাংবাদিক



الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness



নৈতিকতার পথ

সূচিপত্র

নৈতিকতার পথ

সুখ শান্তির পথ হলো তাই যে পথে নৈতিকতা নিশ্চিতভাবে উড়তে থাকে। সে পথে ভ্রমণকারীর মধ্যে অবশ্যই ভালবাসা, উদারতা, সম্মানবোধ, ক্ষমাশীলতা, লজ্জাশীলতা, শান্ততা, নম্রতা, অন্যকে অগ্রাধিকার, ন্যায় বিচার, সততা, বন্ধুত্ব, সকলের সাথে পরামর্শ করা ইত্যাদি উত্তম চরিত্রের গুনাবলী থাকতে হবে। ইহা আত্মার উন্নতির পথ, উত্তম চরিত্র ও পরিপূর্ণ শিষ্টাচারের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ। আখলাক কোন শৌখিনতা নয়, যা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে। বরং ইহার স্থান সে সব মূলনীতির অগ্রভাগে, যেগুলোর উপর জীবন যাপনের ধারা নির্ভর করে। ব্যক্তির আখলাক যদি সুন্দর হয় তবে তার জীবন ও সমাজের সুখ-শান্তিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আর যদি ব্যক্তির চরিত্র খারাপ হয় তবে সে নিজেও দুঃখী হবে এবং সমাজের সকলকে দুঃখী ও দুর্ভাগা করবে।

এজন্যই ইসলাম তার অনুসারীদের অন্তরে উত্তম চরিত্র ও সৎগুনাবলী স্থাপন করতে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। তাদেরকে এসব গুনাবলী আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে উৎসাহিত করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহাকে তাঁর নবুয়াতের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ «আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি»। (বায়হাকী শরীফ)।

মানুষ যে সর্ববৃহৎ সভ্যতা [ইসলাম] সম্পর্কে অবগত হয়েছে সে সভ্যতাকে যুগে যুগে শক্তিশালী ও মজবুত করতে ইসলামের মিশনই যেন ছিল উত্তম চরিত্র গঠন। ইসলামের নবী এ রিসালাতের আলো পৌঁছাতে ও মানুষকে এ সভ্যতার উপর ঐক্যবদ্ধ করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মানুষকে সুন্দর আখলাক, উত্তম আদর্শের মাধ্যমে পবিত্রকরণ ও তাদের চোখের সম্মুখে পূর্ণতার আলো উদ্ভাসিত করতে তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন।

তাহলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চরিত্র গঠন, ইহাকে উন্নত করা, আত্মাকে পুতঃপবিত্র ও কলুষমুক্ত করা। তাঁর আগমনের পূর্বে মানবজাতি এ সব আখলাকের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট ছিল, তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, এমনকি কোন গুরুত্বও দিতনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।} [সূরা জুম'আঃ ২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেছেনঃ {যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।} [সূরা বারাকাঃ ১৫১]





নৈতিকতার মূলনীতিসমূহ

"আল কোরআনে নৈতিকতার মূলনীতিসমূহ খুব উঁচু। যে সব জাতি কোরআনের স্পর্শ পেয়েছে তারাও ঈসা [আঃ] এর ধর্মের অনুসারীদের মত সুমহান চরিত্রে পরিবর্তীত হয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো কোরআন তার অনুসারীদেরকে প্রভাবিত করেছে। ইসলামের মত কোন ধর্ম নাই যা মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলেছে। ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম পাওয়া যাবে না যা তার অনুসারীদের অন্তরে স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে কোরআনই হলো জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, জীবনের সূক্ষ্ম ব্যাপারেও আমরা এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই"।

গোস্তাফ লে বন

ফরাসি ইতিহাসবিদ

সুন্দর চরিত্রের সাথে ঈমানের সম্পর্কঃ

ঈমান এমন এক শক্তি যা মুমিনকে সম্মানিত আসনে নিয়ে যায়, আর নিম্নতা ও ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। অতএব, দুর্বল চরিত্র দুর্বল ঈমানের পরিচয়। এমনিভাবে, উত্তম চরিত্র শক্তিশালী ঈমানের পরিচয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারটি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শক্তিশালী ঈমান অবশ্যই উত্তম চরিত্রের জন্ম দেয়, অন্যদিকে চরিত্রের অধঃপতন দুর্বল ঈমান বা ঈমানহীনতার পরিচয়। এজন্যই অমুসলিম কারো ভয়, ভৎসনা বা অপরাধের জবাবদিহীতা না করে খুব সহজেই খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «লজ্জাশীলতা ও ঈমান পরস্পর একত্রে থাকে। যখন কোন একটি চলে যায়, তখন অন্যটিও চলে যায়»। (বায়হাকী শরিফ)।

বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণকে ঈমানহীনতার পরিচয় বলেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ « আল্লাহর কসম তোমরা ঈমানদার হতে পারবেনা, আল্লাহর কসম তোমরা ঈমানদার হতে পারবেনা, আল্লাহর কসম তোমরা ঈমানদার হতে পারবেনা। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, কেন হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেনঃ যার “বাওয়ায়েক” থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসুল “বাওয়ায়েক” কি? তিনি বললেনঃ তার অনিষ্ট। » (বুখারী শরিফ)।



এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়া’লা বান্দাহকে যখনই ভাল কাজের দিকে ডাকেন বা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন, তখন ইহা তাদের অন্তরে ঈমানের স্তর ও চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়া’লা পবিত্র কোরআনে একথা সবচেয়ে বেশি বলেছেনঃ {হে ঈমানদারগণ অতঃপর, তিনি তাদেরকে তাঁর আদেশ দিয়েছেন, যেমন আল্লাহ তায়া’লার বাণীঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।} [সূরা তাওবাঃ ১১৯]

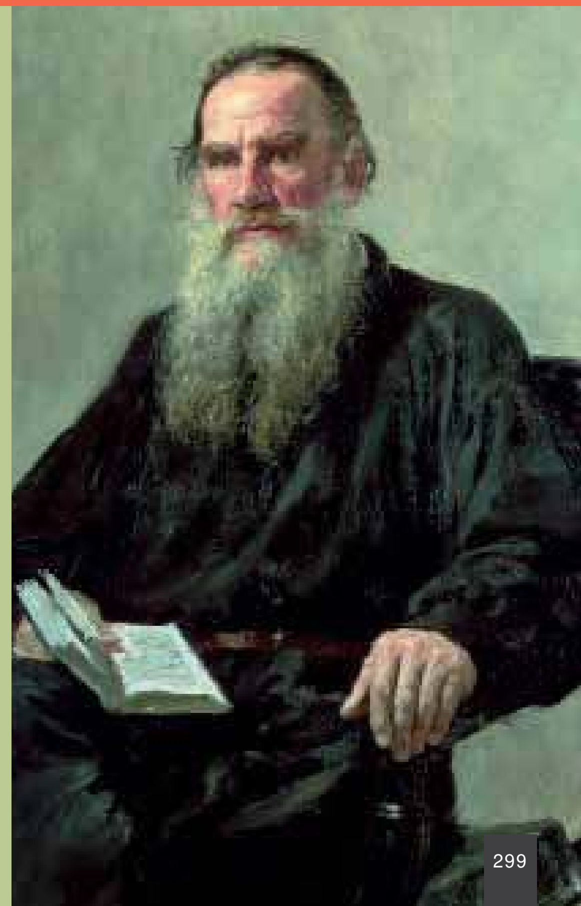
এমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন, ইহাকে তিনি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ «যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে, সে যেন অতিথির সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে, সে যেন প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে, সে যেন উত্তম কথা বলে বা চুপ থাকে»। (মুসনাদে আহমদ)। এমনিভাবে ইসলাম মানুষের ঈমানের সত্যতা ও পরিপূর্ণতার ব্যাপারে তাদের অন্তরে উত্তম চরিত্রের গুনাবলী অর্জনের উপর নির্ভর করেছে।

দূষণীয় অভ্যাস

“মুহাম্মদের গর্বের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি একটি লাঞ্ছিত, রক্তাক্ত জাতিকে শয়তানের নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাদের সামনে অগ্রগতি ও উন্নতির পথ খুলে দিয়েছেন। মুহাম্মদের আনিত শরিয়ত মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য হওয়ার কারনেই ইহা বিশ্বকে অচিরেই নেতৃত্ব দিবে”।

লেভ তলস্তোয়

রুশ সাহিত্যিক



ইবাদত ও নৈতিকতাঃ

ইসলামে ইবাদত শুধু দুর্বোধ্য কথা ও অর্থহীন কিছু নড়াচড়া নয়; বরং ইহা কর্ম সম্পাদন ও কতিপয় সুন্দর কথা যা অন্তরকে পবিত্র করে ও জীবনকে সুন্দর করে। ইসলামের ফরজসমূহের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমকে প্রশংসিত উত্তম চরিত্রের জীবন যাপনে অভ্যস্থ করা। তার সমস্যা ও অবস্থা যাই হোক না কেন সব সময়ই সে এ সব আখলাক ধরে রাখবে। কোরআন ও হাদীসে এ বাস্তবতার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তায়া'লা যখন ফরজ নামাজের আদেশ দিয়েছেন, তখন তিনি বলেছেন যে, ইহা অসচ্চরিত্র তথা অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।} [সূরা আনকাবুতঃ ৪৫]

ইসলামে যাকাত বলতে কোন ট্যাক্স নয়, যা ধনীদের থেকে উত্তোলন করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করবে; বরং ইহা রহমত ও হৃদ্যতার এমন এক অনুভূতি যা সব স্তরের মানুষের মাঝে সম্পর্ক ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। এছাড়াও অপরাধ ও অন্যায় থেকে মানুষের অন্তরকে পবিত্র করে এবং সমাজে বিত্তবান ও দরিদ্র মানুষের মাঝে সমতা বিধানের মাধ্যম। ইহাই যাকাত ফরজের সর্বপ্রথম হিকমত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই শোনেন,জানেন। } [সূরা তাওবাঃ ১০৩]

এজন্যই ইসলাম সদাকাকে শুধু সম্পদের সাথেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং ইহা সে সব সুউঁচু আখলাকের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সমাজ ও সমাজের বসিন্দাকে সুখী করতে অংশীদার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকা শব্দটির অর্থ ব্যাপক অর্থে বুঝিয়েছেন, যা মুসলমানের ব্যয় করা উচিত। তিনি বলেছেনঃ « তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেয়া সদাকা [বিশেষ করে যখন কূপ থেকে পানি তোলার জন্য রশি থাকবে না], সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধও সদাকা»। অন্য রেওয়ায়েতে আছেঃ «তোমার ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসি সদাকা, মানুষ চলাচলের পথ থেকে পাথর, কাঁটা ও হাঁড় সরিয়ে ফেলা সদাকা, পথ ভোলা মানুষকে পথ দেখানোও সদাকা»। (বায়হাকী শরীফ)।

এমনিভাবে ইসলামে রোজাও শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার জন্য নয়, বরং ইহা গরীব ও বঞ্চিত মানুষের দুঃখ কষ্টের অনুভূতি বুঝার একটি মাধ্যম। এছাড়াও রোজা মানুষের অন্তরকে সুপথ দেখায়, তার কামভাব ও খামখেয়ালীকে নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর,যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। } [সূরা বাকারাঃ ১৮৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ছাড়বে না তার খাবার ও পানীয় ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই"। [মুসনাদে আহমদ] তিনি আরো বলেছেনঃ «খাবার ও পানীয় ত্যাগের নাম রোজা নয়, বরং রোজা হলো অনর্থক ও অশ্লীল কথা কাজ ছেড়ে দেয়া। কেউ যদি তোমাকে গালি দেয়, বা অন্যায় আচরণ করে তবে বলঃ আমি রোজাদার, আমি রোজাদার»। (ইবনে খুজাইমা)।

আর হজ্বের ব্যাপারে যদি কেউ মনে করে ইহা চারিত্রিক শিক্ষা ও অর্থ বাদ দিয়ে শুধু ভ্রমণ, যেহেতু অন্যান্য ধর্মও কতিপয় গায়েবী ইবাদত শামিল করেছে, তবে তা ভুল ধারণা। কেননা আল্লাহ তায়া'লা এ ইবাদত সম্পর্কে বলেছেনঃ

{হজ্বে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝাগড়া-বিবাদ করা হজ্বের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তো জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগন! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। } [সূরা বাকারাঃ ১৯৭]

উপরোল্লেখিত আলোচনা দ্বারা দ্বীন ও আখলাকের মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক বুঝা যায়। ইসলামের মূল রুকূনসমূহ যেমনঃ নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব ও অন্যান্য ইবাদতসমূহের উদ্দেশ্য হলো কাংখিত পরিপূর্ণ মানবতায় পৌঁছানো ও পবিত্র জীবনে উন্নীত করা, যা উত্তম আখলাক ও উন্নত মৌলিক নীতির মাধ্যমে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নেয়ামত লাভ করবে। যদিও কাজে কর্মে ও দৃশ্যত নানা ধরণের ইবাদত; কিন্তু সব কিছুর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসে অংকিত করেছেনঃ «নিশ্চয় আমি উত্তম আখলাককে পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি»। (বায়হাকী শরিফ) অতঃএব, সুখ-শান্তির পথ তাই যা নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, নৈতিকতার মাঝেই ঘুর্ণায়মান, সেখানে নৈতিকতা কখনও ইবাদত থেকে আলাদা হবে না।



আইন ও নীতি

"আইনগত ও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে ইসলামী বিশ্বাসে কোন পার্থক্য নেই। আইন ও নৈতিকতার মাঝে এ সুদৃঢ় সমন্বয় শুরু থেকেই এ সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে"।

মার্সেল বাউজার

ফরাসি চিন্তাবিদ



সূক্ষ্ম বিশদ নিয়ম কানুন

“আল কোরআনে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়, ইহা ধর্মীয় ও নৈতিক আইনের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করে, নৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করে, এবং দুর্বিপাক, নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করে। নিশ্চয় ইহা দুর্বলদের পাশে দাঁড়ায়, সৎ কাজের উপদেশ ও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। আর শরিয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ইহা দৈনন্দিন সহযোগিতার ভিত্তিতে লেনদেন, ও উত্তরাধিকারের জন্য সূক্ষ্ম বিশদ নিয়ম কানুন প্রণয়ন করেছে। আর পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের জন্য শিশু, দাসদাসী, জীব জন্তু, স্বাস্থ্য ও পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদির ব্যাপারে আচরণবিধি নির্ধারণ করেছে”।

জ্যাক সি, রিচার্ড

ফরাসি গবেষক

ইসলামে নৈতিকতাঃ

সুখ-শান্তির পথের মূলভিত্তিসমূহ যেমনঃ শরয়ী বিধিবিধান, শিষ্টাচারিতা ও আক্বায়েদী মূলনীতি সবকিছুই নৈতিকতার মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর সাথে উত্তম আখলাক ও শিষ্টাচার থেকে শুরু করে মানুষ তার নিজের সাথে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, শত্রু-মিত্র সকলের সাথেই উত্তম আচার ব্যবহার করা, এমনকি জীবজন্তু ও অন্যান্য সকল অস্তিত্বশীল জিনিসের সাথেও। বরং পরিবেশ, গাছপালা ও উদ্ভিদের সাথেও ভাল আচরণ করা। এসব উত্তম আখলাক সব কিছুর সাথে কথা ও কাজে উত্তম আচরণ করা, বরং অন্তরের চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে উত্তম আচরণ করাকেও শামিল করে। আল্লাহ তায়া'লা কথাবার্তায় উত্তম চরিত্রের মূলনীতি বর্ণনা করে বলেছেনঃ মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে। } [সূরা বাকারাঃ ৮৩]

আল্লাহ তায়া'লা কাজে কর্মে উত্তম আখলাকের মূলনীতির কথা এভাবে বলেছেনঃ { মন্দের জওয়াবে তাই বলুন,যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। } [সূরা মু'মিনূনঃ ৯৬]

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করবে, সে দেখতে পাবে যে, আল কোরআনে আখলাকের আদেশসমূহ ভরপুর। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো একটু চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? } [সূরা আর রহমানঃ ৬০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। } [সূরা বাকারাঃ ২৩৭]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ { সুতরাং এখন ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। } [সূরা ইউসুফঃ ১৮]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপক্ষো করুন। } [সূরা হিজরঃ ৮৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক। } [সূরা আ'রাফঃ ১৯৯]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ তারা যখন অবাঞ্চিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। } [সূরা কাসাসঃ ৫৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ { সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শুত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। } [সূরা হা-মীম সিজদাঃ ৩৪]

এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে উত্তম আখলাককে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



রাসুল

“গোঁড়া ও ধর্মান্ধরা মনে করে যে, মুহাম্মদ নিজে ব্যক্তিগত সুনাম সুখ্যাতি, গৌরব, প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছেন। খোদার কসম তিনি কখনও এমনটি চাননি। এ মহান মরুবাসী ও নির্জনতাপ্রিয় ব্যক্তিটি ছিলেন মহান হৃদয়ের অধিকারী, তার হৃদয় রহমত, কল্যাণ, ভালবাসা, সৎকর্ম ও প্রজ্ঞায় ভরপুর ছিল। দুনিয়ার কোন লোভ লালসার চিন্তা ছিল না। ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির কোন স্বাদ ছিল না। কেনই বা থাকবে, তার অন্তর ছিল ঝকঝকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তিনি একাগ্র একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন “।

টমাস কার্লাইল

স্কটিশ সমালোচক ও ইতিহাসবিদ



ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা

"নিশ্চয় এ মহান ব্যক্তিটির স্বীয় বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করার প্রস্তুতি, যারা তার উপর ঈমান এনেছে, তার অনুসরণ করেছে ও তাকে তাদের নেতা ও সেনাপতি মেনেছে তাদের জন্য তার সুমহান স্বভাবগত নৈতিকতা, এছাড়াও তার পরম সাফল্য অর্জন...... এ সব কিছুই তার ব্যক্তিত্বের ন্যায় পরায়নতা ও স্বচ্ছতা প্রমাণ করে। মুহাম্মদকে শুধুমাত্র একজন নবুয়াতের দাবীদার মনে করা শুধু ধৃষ্টতা, যা সমস্যা আরো বাড়বে, যার কোন সমাধান নেই। বরং পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এমন কোন মহান ব্যক্তিত্ব পাওয়া যাবে না যার সম্মান ও মর্যাদা মুহাম্মদের মত হবে"।

উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

বলেছেনঃ «মু'মিনদের মাঝে বেশী পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী সে ব্যক্তি যার আচরণ বেশী সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীদের নিকট উত্তম»। (বায়হাকী শরিফ)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ «সৎ কাজ হলো উত্তম চরিত্র। আর অসৎ কাজ হলো তাই, যা তোমার অন্তরে বাঁধা দেয় আর মানুষের সামনে প্রকাশ তা করতে অপছন্দ কর»। (মুসলিম শরিফ)। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] আরো বলেছেনঃ «ইসলামে অশ্লীলতা করা ও অশ্লীলতা ছড়ানোর কোন স্থান নেই, সে ব্যক্তির ইসলাম উত্তম যার আখলাক উত্তম»। (মুসনাদে আহমদ)। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] আরো বলেছেনঃ «কিয়ামতের দিনে মু'মিনের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে কিছু ভারী হবেনা। আল্লাহ তায়া'লা নির্লজ্জ নোংরা অশ্লীলভাষীকে খুবই অপছন্দ করেন»। (বায়হাকী)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] আরো বলেছেনঃ «তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটতম সেই ব্যক্তি যে চরিত্রে উত্তম, আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে অপছন্দ ও আখেরাতে আমার সবচেয়ে বেশী দূরে থাকবে যার আখলাক নিকৃষ্টতম; তারা হলোঃ সত্য অতিক্রম করা বাচাল যারা সত্য অতিক্রম করে বেশী কথা বলে।, মানুষকে উপহাসকারী যারা সতর্কতা ছাড়াই কথা বলতে থাকে] যারা সতর্কতা ছাড়াই কথা বলতে থাকে, কেউ কেউ বলেছেনঃ মানুষকে উপহাসকারী, আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ যারা কথায় ভণিতা করে। ও অহংকারী»যারা সর্বদা মুখ কথায় ভরপুর রাখে। কেউ কেউ বলেছেন, যারা অহংকারী ও নির্বুদ্ধি। (যারা মুখ কথায় ভরে রাখে)। (মুসনাদে আহমদ)।

ইসলামে আখলাক একটি পরিপূর্ণ ও ব্যাপক বিষয়। যার শুরুতে রয়েছেঃ

আল্লাহ তায়া'লার সাথে সুন্দর আচরণঃ

আল্লাহ তায়া'লার সাথে সুন্দর আচরণ তিনটি জিনিসকে শামিল করেঃ

প্রথমতঃ তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁর প্রদত্ত সকল সংবাদকে সত্যয়ণ করে গ্রহণ করা। আল্লাহ তায়া'লা নিজের সম্পর্কে বলেছেনঃ {আল্লাহ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে। } [সূরা নিসাঃ ৮৭]

তৃতীয়তঃ তাঁর নির্ধারিত পরিমাণ বা ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি থাকা ও ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করা। কেননা আল্লাহর সাথে সুন্দর আচরণ বলতে মানুষ তাঁর নির্ধারিত পরিমাণের উপর খুশী থাকা, আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও ফয়সালায় আত্মসমর্পণ ও পরিতুষ্ট থাকা বুঝায়। এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করে বলেছেনঃ {তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।} [সূরা বাকারাঃ ১৫৫-১৫৬]



নৈতিকতার ধর্ম

"কোরআনে এমন কোন আয়াত পাবে না যেখানে আল্লাহ তায়া'লার গভীর ভালবাসার কথা বলা হয়নি। নৈতিক আচরণের নীতিমালার মাধ্যমে এতে রয়েছে সদ্গুণের ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা। এতে আরো রয়েছে, আবেগ ভালবাসা বিনিময়, উত্তম উদ্দেশ্যসমূহ এবং লাঞ্ছনা- অপমানে ক্ষমার প্রতি জোর আহবান। এতে আছে বিস্ময় এবং ক্রোধ নিবারণের কথা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, চিন্তা ও দৃষ্টির দ্বারাও গুনাহ হতে পারে। এতে আরো আছে, প্রতিশ্রুতি পূরণের আহবান, যদিও তা কাফেরের সাথে হয়। বিনয় ও নম্রতার প্রতি রয়েছে উৎসাহ। নৈতিকতার স্বচ্ছ নীতিমালায় কোরআনের সমস্ত প্রজ্ঞা ও উপদেশ বুঝাতে এ কথা-ই যথেষ্ট যে,"উহা প্রত্যেক বিষয়ে আলোকপাত করেছে।"

লুই সেজদিউ

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



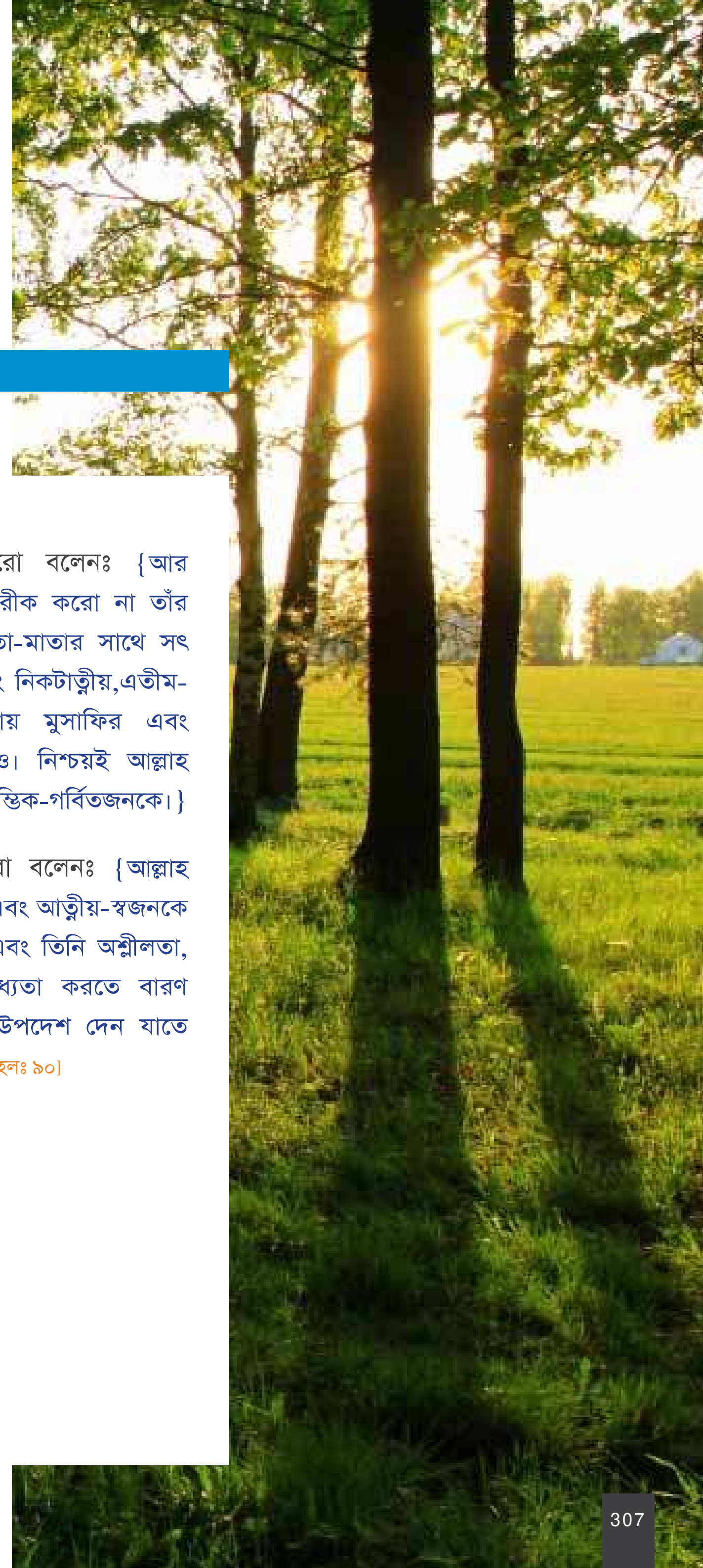
মানুষের সাথে সুন্দর আচরণঃ

আল্লাহ তায়া'লা সব মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন; [যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ওয়াজিব] এবং প্রতিবেশী। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।} [সূরা বাকারাঃ ৮৩]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্নীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।} [সূরা বাকারাঃ ১৭৭]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্নীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।} [সূরা বাকারাঃ ২১৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরা হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্নীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।} [সূরা আনফালঃ ৭৪-৭৫]



আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্নীয়,এতীম-মিসকীন,প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।} [সূরা নিসাঃ ৩৬]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।} [সূরা নাহলঃ ৯০]



আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। আত্নীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষামান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।} [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৩-২৮]

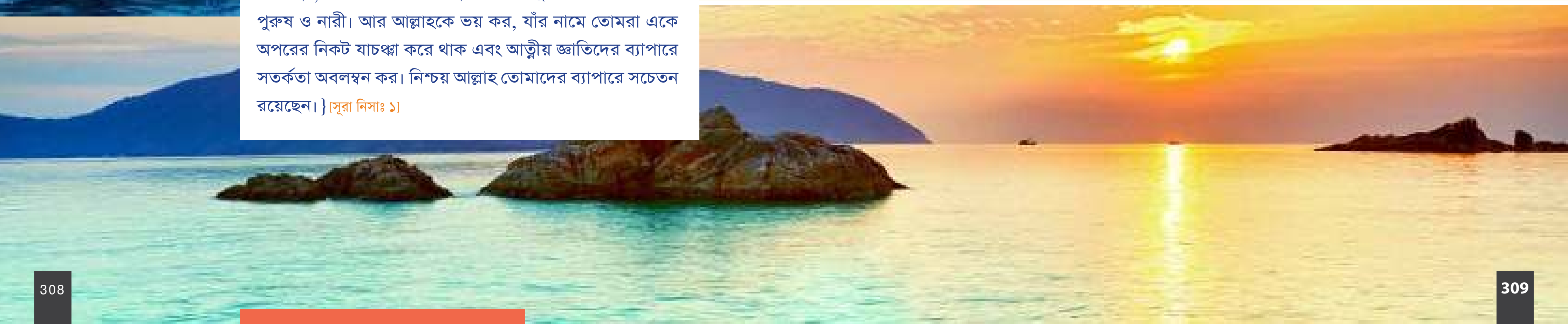
আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আত্নীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম।} [সূরা রূমঃ ৩৮]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।} [সূরা নিসাঃ ১]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {ক্ষমতা লাভ করলে, সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্নীয়তা বন্ধন ছিন্ন করবে।} [সূরা মুহাম্মদঃ ২২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তি সম্পন্ন। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে। এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্টা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবেঃ তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার। এবং যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে, সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।} [সূরা রা'দঃ ১৯-২৫]}

ইসলামে সদ্ব্যবহার শুধু বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইহা শত্রুর সাথেও করতে হয়, এমনকি সে যদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানেও থাকে! এভাবেই সদ্ব্যবহার সকল মানুষকে শামিল করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শুত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।} [সূরা হা-মীম সিজদাঃ ৩৪]



আল্লাহ তায়া'লা সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন, এমনকি যে ব্যক্তি আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তার সাথেও। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।} [সূরা বাকারাঃ ১৯০]

ইসলামে যুদ্ধের সময় শত্রূর সাথে সদ্ব্যবহারের নমুনা দেখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়া ও শত্রূর মোকাবিলার সময় নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ "তোমরা ওয়াদা ভঙ্গ করোনা, গণিমতের মালে খেয়ানত করোনা, নিহতের অঙ্গ কেটে বিকৃত করোনা, শিশু ও গীর্যার লোকদেরকে হত্যা করবে না"। [মুসনাদে আহমদ]। এ ধর্মের আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যুদ্ধরত শত্রূর সাথেও ভাল আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। আর যুদ্ধ ছাড়া -এমনকি শত্রু হলেও- আল্লাহ তায়া'লা তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।} [সূরা মুমতাহিনাঃ ৮]



জীব-জন্তুর সাথে সদাচরণঃ

ইসলামে সদাচরণের পরিধি খুবই ব্যাপক; এমনকি জীব-জন্তুর সাথেও সদাচরণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «এক মহিলাকে একটি বিড়াল আটকে রেখে হত্যা করার কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল, অতঃপর, সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছে, খাদ্য ও পানীয় দেয়নি, আবার ছেড়েও দেয়নি যে সে জমিনের কীটপতঙ্গ খাবে»। (বুখারী শরিফ) বরং আল্লাহ তায়া'লা পশু জবাইয়ের সময়ও সদাচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «আল্লাহ তায়া'লা সকলের সাথেই সদাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তোমরা কোন প্রাণী হত্যা করবে বা জবাই করবে তখন তা উত্তমরূপে কর। সে যেন ছুরিতে ধাঁর দিয়ে নেয়, যাতে জবাইকৃত প্রাণী কষ্ট না পায়»। (মুসলিম শরিফ)।

পরিবেশের সাথে সুন্দর আচরণ

এমনিভাবে ইসলাম পরিবেশ ও সাধারণ দৃশ্যের সাথেও শিষ্টাচার নিয়ে এসেছে। অপচয় করতে নিষেধ করেছে। এজন্যই প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বলেছে, ধ্বংস ও ক্ষয় করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও,পান কর।} [সূরা বাকারাঃ ৬০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না। যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।} [সূরা শু'আরাঃ ১৫১-১৫২]

এমনিভাবে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদান যেমনঃ পানি ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলাম খুবই গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?} [সূরা আম্বিয়াঃ ৩০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে।} [সূরা নাহলঃ ৬৫]

কোরআনের পাশাপাশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পরিবেশ ও এর উপাদানসমূহ রক্ষা করতে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন। যেহেতু হাদীসে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে বার বার তাগিদ দিয়ে আহবান করা হয়েছে; যেন ভূমিধস, খরা ও অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «তোমরা তিনটি অভিশাপের স্থান থেকে বেঁচে থাক, তা হলোঃ পানি প্রবাহের পথ, [মানুষ চলাচলের] রাস্তা ও ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা থেকে বিরত থাক»। (আবু দাউদ শরিফ)। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «কোন মুসলমান যে শস্য বপন করে বা চারা রোপন করে, আর তা থেকে পাখি, মানুষ বা জীব জন্তু খায়, তবে উহা তার জন্য সদকা হবে»। (মুসলিম শরিফ)।

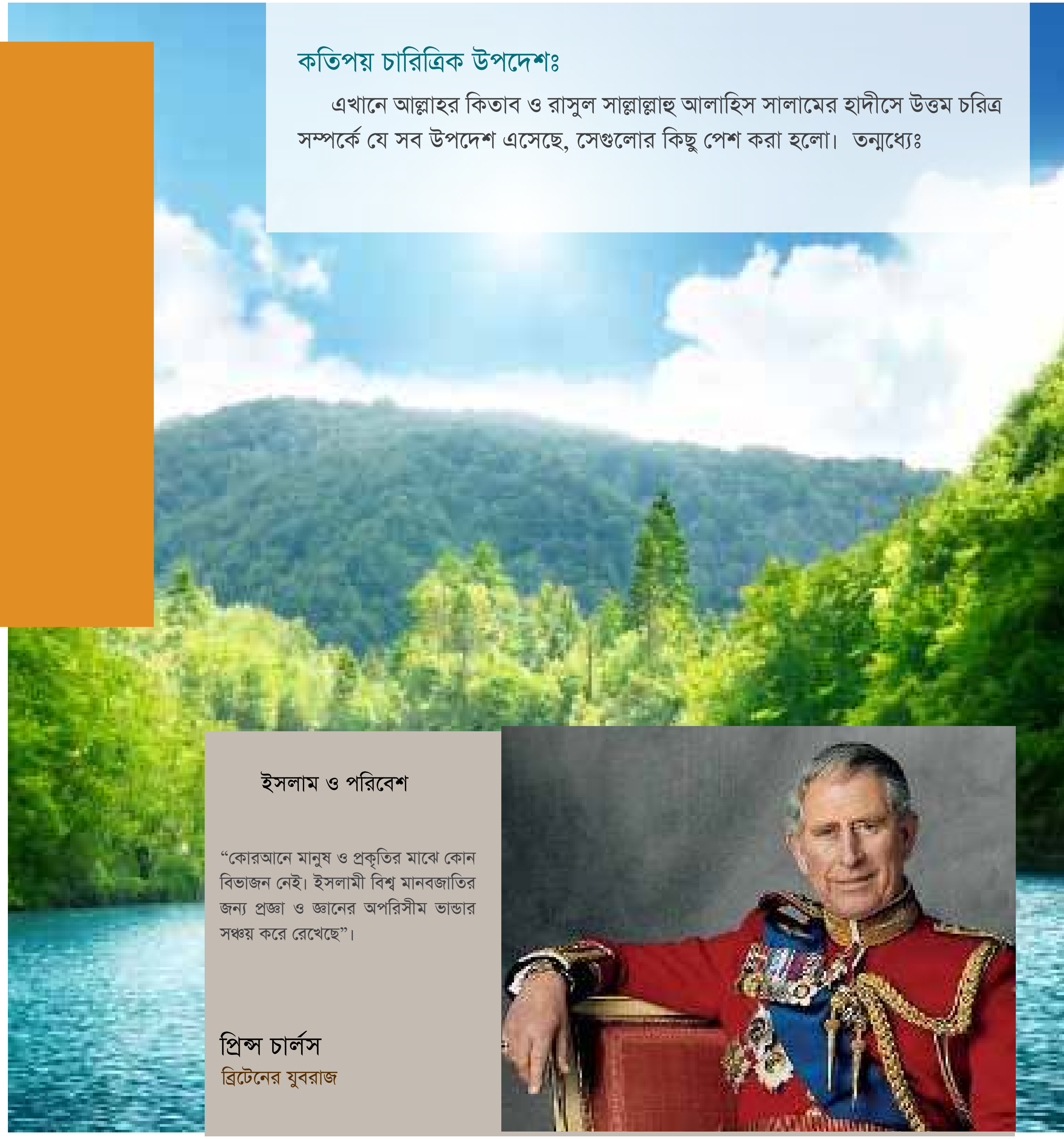
তিনি আরো বলেছেনঃ «যদি কিয়ামত এসে যায়, আর তোমাদের কারো হাতে একটি চারা থাকে, তাহলে যদি পারো তবে উহা রোপণ করো»। (মুসনাদে আহমদ)। একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সা'দ [রাঃ] এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি অযু করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি [আযু করতে পানি বেশী ব্যবহার করে] অপচয় করছ কেন? তিনি বললেনঃ অযু করলেও কি অপচয় হবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবাহমান নদীতে থাক তবুও"। [ইবনে মাজাহ]। সাহাবায়ে কিরামগণ পরিবেশের সাথে সদাচরণ করেছেন, এমনকি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের সাথেও। হযরত আবু বকর সিদ্দীক [রাঃ] তার সেনাপতিকে উপদেশ দিয়ে বলেছেনঃ «শিশু, নারী, বয়ঃবৃদ্ধকে হত্যা করবে না, ফলদায়ক গাছ কাটবেনা, ছাগল, গরু খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত হত্যা করবে না, ঘরবাড়ি ধ্বংস করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না বা জ্বালিয়ে দিবে না»। (মুয়াত্তা মালিক)।



নিশ্চয় মু'মিনরা ভাই ভাই

"মু'মিনদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল ইসলামে উত্তম আদর্শ। ইহাই মানুষকে এই ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে"।

টমাস আর্নল্ড
ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ



কতিপয় চারিত্রিক উপদেশঃ

এখানে আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের হাদীসে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে যে সব উপদেশ এসেছে, সেগুলোর কিছু পেশ করা হলো। তন্মধ্যেঃ

ইসলাম ও পরিবেশ

"কোরআনে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে কোন বিভাজন নেই। ইসলামী বিশ্ব মানবজাতির জন্য প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অপরিসীম ভান্ডার সঞ্চয় করে রেখেছে"।

প্রিন্স চার্লস
ব্রিটেনের যুবরাজ

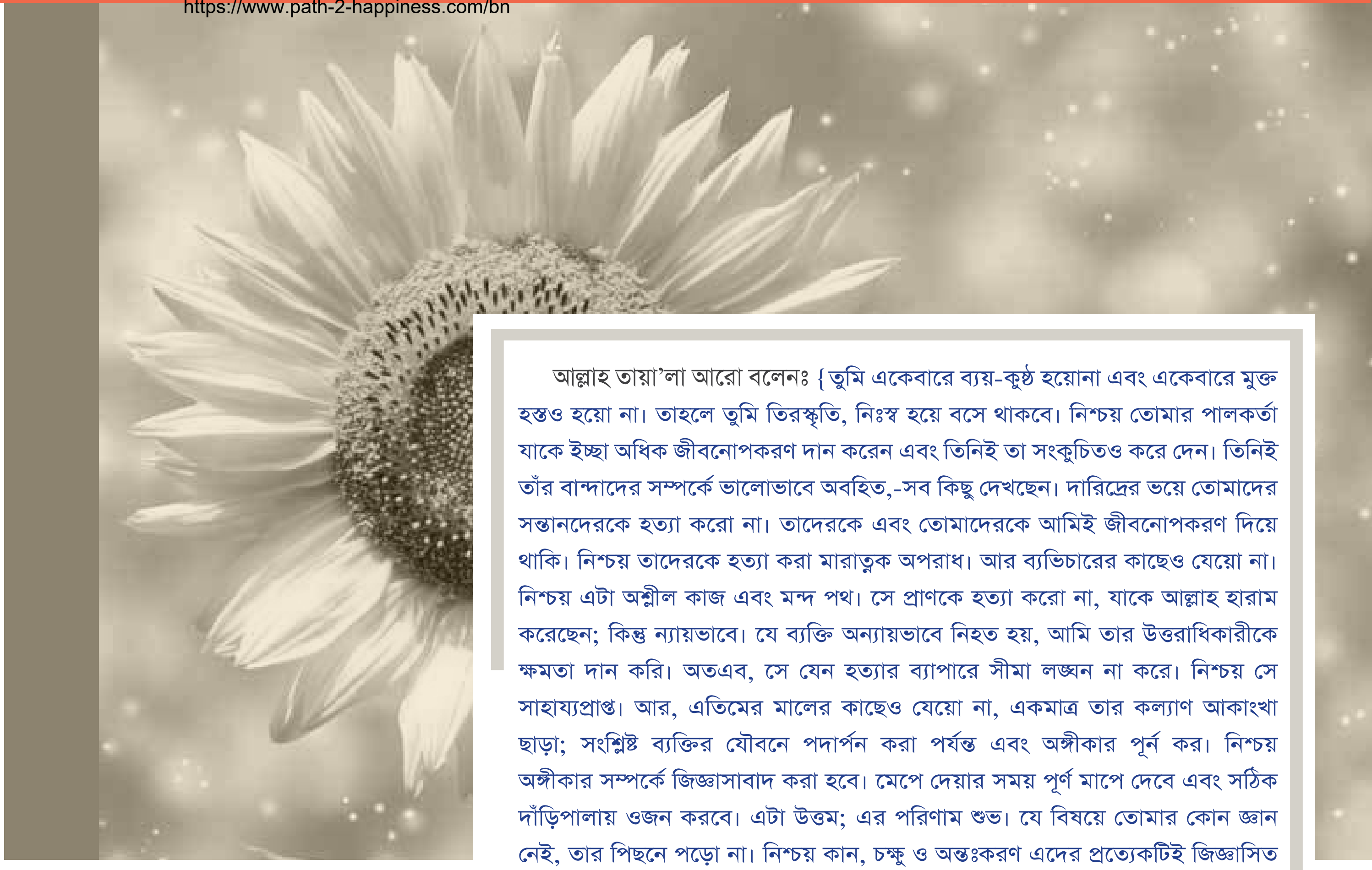
পবিত্র কোরআনের উপদেশঃ

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।} [সূরা নিসাঃ ৫৮]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তাএই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্নীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।} [সূরা আন'আমঃ ১৫১-১৫৩]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।} [সূরা আ'রাফঃ ৫৬]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আর ধৈর্য্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ পূণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।} [সূরা হুদঃ ১১৫]





আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃতি, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,-সব কিছু দেখছেন। দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্নক অপরাধ। আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। আর, এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ন কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দকাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভূক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন।} [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৯-৩৯]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৩-১৩৪]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম। মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।} [সূরা হুজরাতঃ ১১-১৩]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।} [সূরা লোকমানঃ ১৭-১৯]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে,সালাম।} [সূরা ফুরকানঃ ৬৩]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্নীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।} [সূরা নিসাঃ ৩৬]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯]

রাসুলের [সাঃ] হাদীসের উপদেশঃ

আমরা যদি রাসুলের হাদীসের বাগানে যাই তবে দেখব সেখানে ঈমানের অসংখ্য গাছ পালা রয়েছে, যা থেকে আমরা উত্তম চরিত্র ও সদাচরণের মৌলিক রীতি নীতির পক্ক ফল আহরণ করতে পারি। তন্মধ্যে কয়েকটি হলোঃ

-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «প্রত্যেক দুর্বল, নম্র, সহজ ও মানুষের নিকটতম ব্যক্তিদের উপর জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে»। (তিরমিজি)।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক সাহাবীকে বলেছেনঃ «তোমার মাঝে দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে, যা আল্লাহ তায়া'লা পছন্দ করেনঃ ধৈর্যশীলতা ও ধীরতা»। (মুসনাদে আহমদ)।

- তিনি আরো বলেছেনঃ «আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে, যে যাচনা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ধৈর্য ধারন করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি»। (মুসলিম)

তিনি অন্যত্রে বলেছেনঃ «বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয়; বুরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য»। (বুখারী)

-তিনি আর বলেছেনঃ «প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম»। (বুখারী)।

- তিনি বলেছেনঃ «যে মানুষের শুকরিয়া করেনা, সে আল্লাহ তায়া'লারও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেনা»। (মুসনাদে আহমদ)।

তিনি অন্যত্রে বলেছেনঃ «সব ভাল কাজই সদাকা, হাসি খুশী চেহারায় কারো সাথে মিলত হওয়া ও তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেয়াও [বিশেষ করে যখন পানি উঠানোর রশি না থাকে] সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত »। (তিরমিজি)।

পরিশেষে বলব, প্রকৃত সুখ ও উত্তম আখলাকের মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। উত্তম চরিত্রই মানব সন্তানের একমাত্র সুখ-শান্তির পথ। উত্তম আখলাক ছাড়া শান্তি আসতে পারে না। আখলাক ব্যতীত মানুষ জীবনে হতাশা, দুঃখ, দুর্দশা, বিষণ্ণতা ও কষ্ট ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারে না। অতঃএব, সুখ-শান্তি হলো মানুষকে সুন্দর চরিত্র অর্জনের দিকে ধাবিতকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ন বিষয়। কেননা সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, সচ্চরিত্র ব্যতীত কখনও প্রকৃত সুখ আসতে পারে না, এমনকি একদিনের জন্যও কোন আনন্দ-খুশী আসে না।



ভালবাসা ও সম্মানের পথ

সূচিপত্র

ভালবাসা ও সম্মানের পথ

রহমতের পথ

আল কোরআনের প্রত্যেকটি সূরা আল্লাহর নাম রহমান [দয়াময়] রহীম [দয়ালু] দিয়ে শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। {তোমাদের পালনকর্তা রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। ।} [সূরা আন'আমঃ ৫৪]

তাঁর রহমত সব কিছুকে ব্যাপ্তি করে রেখেছে। {আমার রহমত সব কিছুকে ব্যাপ্তি করেছে।} [সূরা আ'রাফঃ ১৫৬]

মানুষকে তিনি তাঁর রহমতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তাদেরকে রহমতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর রহমত হতে নিরাশ হতে সতর্ক করেছেন। {বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} [সূরা যুমারঃ ৫৩]

তিনি দয়ালু, ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «আল্লাহ তায়া'লা রাতের বেলায় দিনে কৃত অন্যায়ের তাওবা কবুল করতে হাত প্রশস্ত করে দেন [তাওবার দরজা খুলে দেন]। আবার দিনের বেলায় তাওবার দরজা খুলে দেন রাতে কৃত অন্যায়কারীর তাওবা কবুল করতে, যতক্ষণ না পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হবে»। [(মুসলিম শরিফ)]। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বলেছেনঃ « আল্লাহ তায়া'লা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টির আগে তাঁর কিতাবে লিখেছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়ী»। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর রবের পক্ষ থেকে আরো বলেছেনঃ «আল্লাহ তায়া'লা রহমতকে একশত ভাগে ভাগ করেছেন, তিনি তাঁর কাছে ৯৯ভাগ রেখে দিয়েছেন, আর পৃথিবীতে মাত্র একভাগ নাযিল করেছেন। ঐ একভাগের কারণেই সৃষ্ট জগত একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এ ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে»। (বুখারী শরিফ)।

আল্লাহ তায়া'লা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

তাই তিনি তাঁকে সুমহান আখলাক দিয়ে সজ্জিত করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [সূরা ক্বালামঃ ৪]



এজন্যই রাসুলের সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম আখলাক হলো রহমত। তা না হলে লোকজন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯]

বরং তিনি ছিলেন স্নেহশীল ও দয়াময়। উম্মতের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে সহ্য করা দুঃসহ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল,দয়াময়।} [সূরা তাওবাঃ ১২৮]

এ জন্যই দয়াময় ও দয়ালু মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে যে ইসলাম এসেছে, তামানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ। তাদেরকে দুঃখ, জুলুম, অত্যাচার, জোর জবরদস্তি, বিষণ্নতা, উদ্বেগ, বিশৃঙ্খলা, প্রতিশোধ, ক্রোধ, স্বৈরশাসন ও একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্তি দিতে উম্মতের উপর দয়ালু একজন রাসুলের মাধ্যমে তা প্রেরণ করা হয়েছে; যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ এসেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্যই রহমত, অনুগত ও অবাধ্য, ছোট-বড়, নারী, পুরুষ, শিশু, ধনী, গরীব এককথায় সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তিনি ছিলেন রহমত স্বরূপ।

এ কারণে ইসলাম রহমতের আবেদন নিয়ে এসেছে, রহমতের জন্য উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার।} [সূরা বালাদঃ ১৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «যে মানুষের উপর দয়া করে না, আল্লাহ তায়া'লাও তার উপর দয়া করেন না»। (বুখারী ও মুসলিম)।

তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] আরো বলেছেনঃ «আল্লাহ তায়া'লা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। তোমরা জমিনবাসীকে দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন। দয়া রহমান হতে উদগত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তায়া'লাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। আর যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তায়া'লাও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন»। (তিরমিজি)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ «হতভাগা ছাড়া কারো থেকে রহমত উঠিয়ে নেয়া হয়না»। (তিরমিজি)।

তাই আল্লাহ তায়া'লা রহমতের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি সচ্চরিত্র, উত্তম পথ, জীবন পদ্ধতি হিসেবে

উহার প্রতি সাধারণভাবে উৎসাহিত করেছেন। শরিয়ত বিশেষ কতিপয় লোকদের সাথে সাথে রহমত করতে গুরুত্ব দিয়েছে। তন্মধ্যেঃ

১. সাধারণ মানুষের সাথে দয়াঃ তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন, আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দ্বারা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, দুঃখ-দুর্দশা থেকে সুখ-শান্তির পথে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁর রহমত শুধু মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কাফেরদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার অমুসলিমদের ব্যাপারে বলেছেনঃ «বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশধর থেকে এমন একজাতি সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে শরিক করবেন না»। (বুখারী ও মুসলিম)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে আহত হলে সাহাবারা তাঁকে বললেন, আপনি মুশরিকদের উপর বদদোয়া করুন। তখন তিনি বললেনঃ «হে আল্লাহ আপনি আমার জাতিকে হিদায়েত দান করুন, কেননা তারা না জেনে আমার সাথে এমন আচরণ করেছে»। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, আপনি মুশরিকদের উপর বদদোয়া করুন, তিনি বললেনঃ «আমি লা'নতকারী হিসেবে প্রেরিত হইনি, আমি রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি»। (মুসলিম শরিফ)।

২. ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালবাসাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী বলেছেন, আমরা ইব্রাহীমের [রাসুলের সন্তান] ইনতেকালের পরে রাসুলের সাথে প্রবেশ করলাম, আমরা দেখতে পেলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষুদ্বয় ক্রন্দন করছে। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ [রাঃ] বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও [কাঁদতেছেন]? তিনি বললেনঃ হে ইবনে আউফ! ইহা হলো স্নেহ ভালবাসা। অতঃপর তিনি বললেনঃ নিশ্চয় চক্ষুদ্বয় সিক্ত হচ্ছে, অন্তর ভারাক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের রবের সন্তুষ্টি ছাড়া কোন কথাই বলব না। হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তোমার বিচ্ছেদে আমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত"। [বুখারী ও মুসলিম]। বরং তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] উসামা ইবনে যায়েদকে এক রানে আর হাসান [রাঃ] কে অন্য রানে বসাতেন। অতঃপর তাদেরকে জড়িয়ে ধরে বলতেনঃ «হে আল্লাহ! আপনি এদেরকে রহমত করুন, আমি এদেরকে ভালবাসি»। একদা এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করে দেখল, তিনি হাসান বা হোসাইন [রাঃ] কে চুমো দিচ্ছেন। সে রাসুলকে বললেনঃ আপনারা সন্তানদেরকে চুমো খান?! আমার তো দশটি সন্তান আছে, আমি কখনও তাদেরকে চুমো খাইনি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ «যে দয়া করেনা, সে দয়া পায় ও না»।

৩. দুর্বলদের প্রতি রহমতঃ একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে ঝাড়ুদার এক মহিলাকে দেখতে না পেয়ে তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সাহাবাবীরা বললেনঃ তিনি মারা গেছেন। এতে তিনি বললেন, তোমরা কেন আমাকে জানালেনা? .... তার কবর কোথায় দেখাও। তারা তার কবর দেখালেন। অতঃ « পর তিনি তার কবরে জানাযা নামাজ পড়লেন »। (বুখারী ও মুসলিম)।

« রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম আনাস [রাঃ] বলেনঃ আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দশ বছর খেদতম করেছি, তিনি কখনও আমাকে উফ শব্দটিও বলেননি। কখনও বলেননি এটা কেন করেছ বা এটা কেন করোনি? » (বুখারী শরিফ)। বরং বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাঃ] বলেছেনঃ একদা আমি আমার এক দাসকে প্রহর করেছিলাম, হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে শব্দ শুনতে পেলামঃ«জেনে রাখ হে ইবনে মাসউদ! আল্লাহ তার পক্ষ হয়ে তোমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অনেক বেশী শক্তিশালী। আমি পিছনে লক্ষ্য করতেই দেখলাম, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে আযাদ, আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যদি তুমি এ কাজ না করতে তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো। » (মুসলিম শরিফ)।

৪. জীব জন্তুর প্রতি দয়াঃ একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন, উটটির পিঠ পেটের সাথে লেগে আছে। তিনি মালিককে বললেন, «তোমরা এ সব অবুঝ জীব জানোয়ারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। ন্যায়সঙ্গতভাবে ইহাতে আরোহণ কর, এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে এদেরকে খেতে দাও»। (আবু দাউদ)।

একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারীর বাগানের দেয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি একটি উট দেখতে পেলেন। উটটি রাসুলকে দেখে কান্না শুরু করে দিল, তার চক্ষু ভিজে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে গিয়ে ঘাড়ে হাত বিলিয়ে দিলেন। ফলে উটটি কান্না থামাল। অতঃপর তিনি বললেনঃ « এ উটটির মালিক কে? তখন আনসারী এক যুবক এসে বলল, এটা আমার হে আল্লাহর রাসুল। তখন তিনি তাকে বললেনঃ তোমাকে আল্লাহ তায়া'লা এ সব চতুষ্পদ জন্তুর মালিক করেছে, তুমি কেন এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করোনা? কেননা উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখ আর বেশী পরিশ্রম করাও »। (আবু দাউদ)।



এ সব ঘটনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণের সামান্য নমুনা। তাছাড়া ইসলামে রহমতের আলো ও উহার বাস্তবায়ন অনেক, যা এ ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সুস্পষ্ট করে। এ সব রহমত অপমান ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়, বরং ইহা সম্মান ও মর্যাদার রহমত।

ইজ্জত ও সম্মানের পথঃ

আল্লাহ তায়া'লা বনী আদমকে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদেরকে তাঁকে সিজদা করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলছি-আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।} [সূরা আ'রাফঃ ১১]

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, শুরু থেকেই তাকে অন্যান্য অনেক মাখলুকাতের উপর সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।} [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭০] মানুষ শুরু থেকেই সম্মানিত সৃষ্টজীব, তাদেরকে প্রতিপালক নিম্নোক্ত বিষয়ে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেনঃ

১. কাঠামোগতভাবে সম্মান ও মর্যাদাদানঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।} [সূরা ত্বীনঃ ৪]

তিনি তাদেরকে উত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, যেমনঃ সুঠাম শরীর, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাঝে সুবিন্যস্ততা। জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দান, কথা বলা ও শুনার শক্তি দান, তাদেরকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।



২. জলে ও স্থলে সব কিছু মানুষের অধীনস্থ করে সম্মান ও মর্যাদা দেয়াঃ এ অধীনস্থের মধ্যে আবহাওয়া ও পরিবেশও অন্তর্ভূক্ত, কেননা ইহাকে অধীনস্থ করা সম্মানের গুরুত্ব বুঝায়। কেননা আল্লাহ তায়া'লা মানুষের জন্য সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তার সমস্ত সৃষ্টির মাঝে তাদেরকে বৈশিষ্ট্যময় করেছেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ এ পৃথিবীর রাজা, যার অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হয়, অন্য সব কিছু তাদের প্রজা, তাদের অধীনস্থ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি।} [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭০]

বরং আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা জাসিয়াঃ ১৩]

৩. হালাল রিজিকঃ আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যা খুশী তাই খাবে, তিনি খাদ্যের মাঝে উপকার ও ক্ষতির আলামতসমূহ বর্ণনা করে দিয়েছেন। অন্যান্য প্রাণী যা খায়, মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশী ধরণের খাদ্য গ্রহণ করে। কেননা অন্যান্য প্রাণী বিশেষ ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকে, যাতে তারা অভ্যস্থ। এমনিভাবে আল্লাহ তায়া'লা তার



নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ততা এবং শান্তি

"মুসলমানদের নামাজে রুকু ও সেজদায় নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ততা ও শান্তিতে অন্তর ভরে যায়। প্রত্যেকে তা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম [পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি] দিয়ে শুরু করে আর আসসালামু আলাইকুম [আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক] দিয়ে শেষ করে"।

লোরেন বোথ

ব্রিটিশ মানবাধিকার কর্মী



করুনা ও দয়ায় মানুষের জন্য সব কিছু অধীন করে দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব,আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।} [সূরা বাকারাঃ ২২]

৪. অন্যান্য মাখলুকাতের উপর শ্রেষ্ঠত্বদানঃ এ পথেই মানুষ তার সম্মান, ইজ্জত, মর্যাদা ও বড়ত্ব বুঝতে পারবে, আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন। অতএব, মানুষ এ পার্থিব জগতে শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র কণা নয়... তুচ্ছ একটি ক্ষুদ্র কণা যা এ পৃথিবীর সাথে তুলনা করলে সে নিজে একটি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ কণাই দেখবে। একটিমাত্র পরমানু বোমাই দুই লক্ষকে শেষ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যেমনি ঘটেছে জাপানের হিরোশিমায়। অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের আকার নির্ধারিত হয় আল্লাহ প্রদত্ত্ব সে মর্যাদার দ্বারা যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন। যখন আমরা দেখব, কোরআনে মানুষ সৃষ্টি ও আদম [আঃ] কে সিজদা দেয়া, অতঃপর ইবলিসকে বিতাড়িত করা, কেননা সে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আমরা বুঝতে পারব যে, মানুষকে বিশ্বব্যাপী মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করার ভিত্তি কতটাই মজবুত ছিল। এমতাবস্থায় মানুষ আল্লাহর দেয়া পথ ব্যাতীত তার সংকীর্ণতা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেনা। যেহেতু আল্লাহ তাকে ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন।আর সে পথ হলো কোরানের পথ। এ পথেই মানুষকে স্বাধীনতা, সম্মান ও সব ধরণের ইচ্ছার অধিকার দান করা হয়েছে।

তাইতো, সম্মান ও ইজ্জতের পথের মানুষকে অপমান, অমর্যাদা ও উপহাস করা জায়েজ নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।} [সূরা হুজরাতঃ ১১]

খোদাভীতি ছাড়া কালোর উপর সাদার, হলদের উপর লালের, অনারবের উপর আববের, এক গোত্রের উপর অন্য গোত্রের, এক উপজাতির উপর অন্য উপজাতির, এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের বা দরিদ্র লোকের উপর ধনীদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।} [সূরা হুজরাতঃ ১৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের আকৃতি ও ধন সম্পদের দিকে তাকান না, তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকেই তাকান»। (অর্থাৎ অন্তর ও আমলের ভিত্তিতেই বিবেচনা করেন) (মুসলিম শরিফ)।

এজন্যই মানুষের সম্মান, মর্যাদা এ পথের অনুসরণ ও আকড়ে ধরার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুন, সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্যে।} [সূরা ফাতিরঃ ১০]

অন্যদিকে তার অপমান ও লাঞ্ছনা এ পথ থেকে দূরে থাকার কারণেই, যে পথে সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহর আনুগত্যের উপর ঐক্যমত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।} [সূরা হাজ্জঃ ১৮]

যদিও আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তবে অধিকাংশ মানুষ লাঞ্ছনার পথই বেছে নেয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।} [সূরা হাজ্জঃ ১৮]

তারা বেছে নিয়েছে, তারা এ দৃষ্টিতে দেখবে যে,মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতই জীব জানোয়ার, অবোধ যন্ত্র বা সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বা অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে, যা আল্লাহ তায়া'লা কর্তৃক মানুষকে যে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে তার বিপরীত।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো মানুষ হিসেবেই। ইসলাম নারী পুরুষের মাঝে কোন বিরোধ সৃষ্টি করেনি। অতএব, পুরুষ নারীর বিরুদ্ধে নয়, আবার নারীও পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। বরং সমস্ত মানুষ এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। } [সূরা নিসাঃ ১]

সুতরাং যে সম্মান ও ইজ্জত চায় সে যেন সম্মান ও ইজ্জতের পথে চলে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

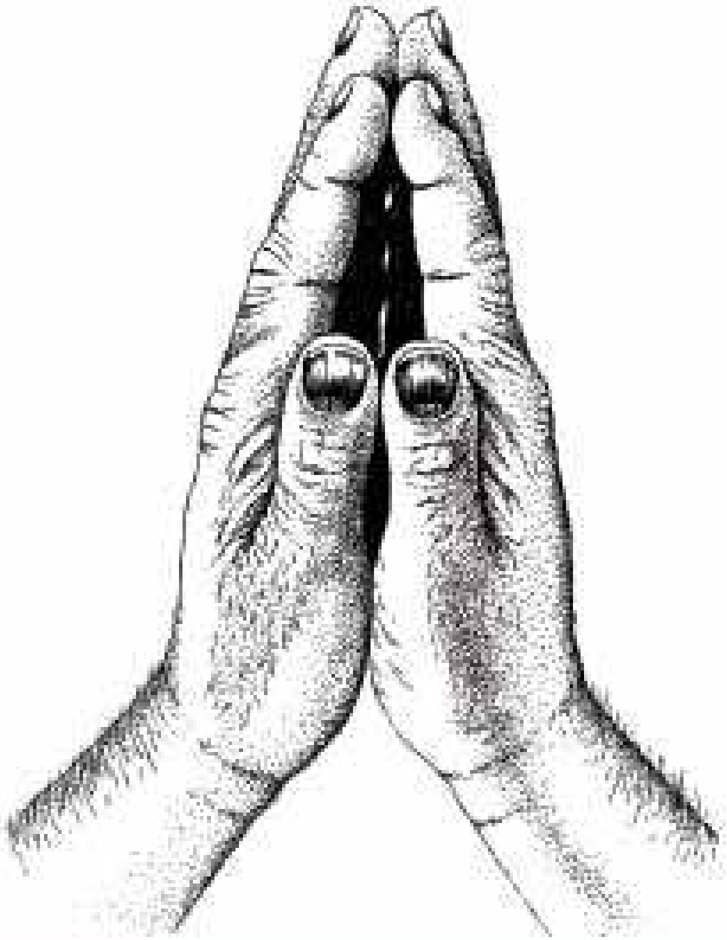
{আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। } [সূরা ইউনুসঃ ৬৫]



কোন ক্ষুধার্ত থাকবেনা

"ইসলামের মত অন্য কোন ধর্ম পাইনি যা যাকাতের পরিপূর্ণ বিধান প্রণয়ন করেছে। যে সব ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যাকাত উত্তোলন করা হয় তা দরিদ্রতা, অভাব ও গৃহহীনতা থেকে মুক্ত থাকে। আমি মনে করি, বিশ্বের সকলেই যদি ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে পৃথিবীর বুকে কোন ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত পাওয়া যাবে না"।

ব্রিশা ব্যাংকমার্ট
বৌদ্ধধর্ম থেকে ইসলামে রূপান্তরিত, থাই শিক্ষাবিদ



সুখ-সৌভাগ্যের সমাপনী

সূচিপত্র

সুখ-সৌভাগ্যের সমাপনী

হে সুখ-সৌভাগ্যের অনুসন্ধানী!!

তোমার এ ধরায় অস্তিত্বের পূর্বে তুমি অস্তিত্বহীন ছিলে, আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতি পূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না।} [সূরা মারইয়ামঃ ৬৭]

অতপর তিনি মাটি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শুক্রাণু থেকে। অতঃপর তোমাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে,এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।} [সূরা দাহরঃ ১-২]



অতঃপর, দুর্বল থেকে আস্তে আস্তে শক্তিশালী হলো, কিন্তু তোমার শেষ গন্তব্য হলো দুর্বল হওয়াই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দূর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ,সর্বশক্তিমান।} [সূরা রুমঃ ৫৪]

অবশেষে তোমার অবসান নিশ্চিত মৃত্যু।

তুমি জীবনের ধাপগুলোতে দূর্বল থেকে আরো দূর্বল হবে, নিজের থেকে কোন ক্ষতি দূর করতে পারবেন না। আবার নিজের জন্য কোন উপকারও বয়ে আনতে পারবেনা, তবে হ্যাঁ আল্লাহ তায়া'লার অনুগ্রহে ও শক্তিতে পারবে। তুমি স্বভাবগতভাবেই ফকির ও অভাবী। দুনিয়াতে জীবন যাপনের জন্য কত কিছুই তুমি চাও, যা তোমার হাতের নাগালের বাইরে। কখনও কিছু লাভ করতে সক্ষম হও, আবার কখনও তোমার থেকে ছুটে যায়। কত উপকারী বস্তু তুমি অর্জন করতে চাও, তা কখনও অর্জন করছ, আবার কখনও ব্যর্থ হচ্ছো। কত ক্ষতিকারক জিনিস তোমার ক্ষতি করছে, তোমার আশা ভঙ্গ করছে, তোমার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তোমার জন্য বিপদ ও দুর্যোগ বয়ে আনছে, তুমি এগুলো নিজের থেকে দূর করতে চেষ্টা করছো, কখনও সক্ষম হচ্ছো, আবার কখনও অক্ষম হয়ে পড়ছো।

তুমি কি নিজের অভাব এবং আল্লাহর নিকট তোমার মুখাপেক্ষীতাঅনুভব করনি? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত,প্রশংসিত।} [সূরা ফাতিরঃ ১৫]

তোমাকে দুর্বলতার ভাইরাসে আক্রান্ত করে, যা তুমি খালি চোখে দেখতে পাও না। তখন তা তোমাকে মরণব্যাধিতে ধরাশায়ী করে, তুমি তা প্রতিহত করতে পারো না। আবার তুমি চিকিৎসা করতে তোমার মতই এক দূর্বলের নিকট যাও, ফলে কখনও তার দেয়া ঔষধে কাজ করে, আবার কখনও ডাক্তার অক্ষম হয়। এতে ডাক্তার ও রোগী দুজনেই হয়রান হয়ে পড়ে... হে আদম সন্তান! তুমি কতই না দূর্বল!! যদি মাছি তোমার থেকে কিছু নিয়ে যায় তা পুনরুদ্ধার করতে পারো না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।} [সূরা হাজ্বঃ ৭৩]

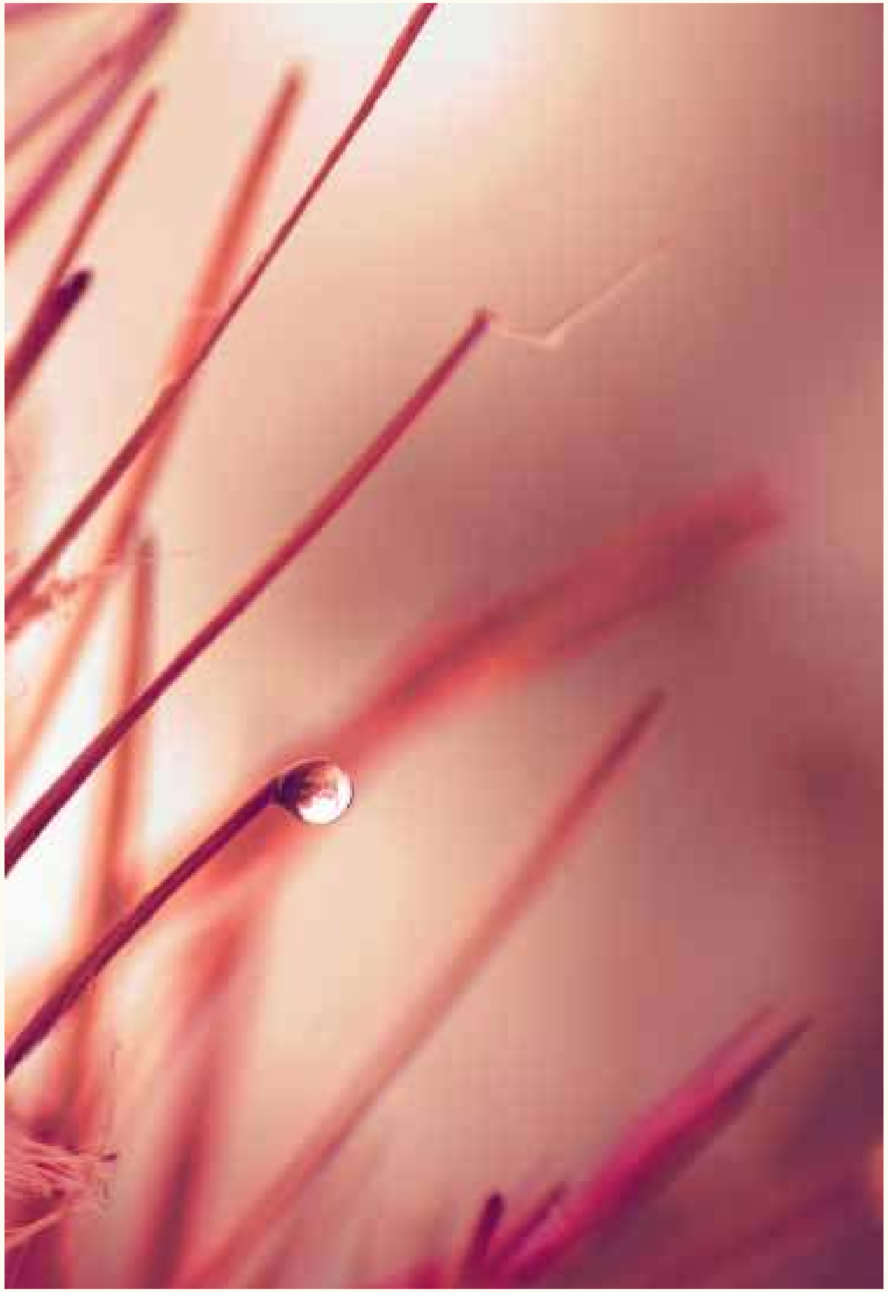
যখন মাছির থেকেই কিছু রক্ষা করতে পারো না, তাহলে তুমি নিজে কি পার?! তোমার ভাগ্য আল্লাহর হাতে, তোমার জীবনও তারই হাতে। তোমার অন্তর দয়াময় আল্লাহ তায়া'লার কুদরতী হাতের দু'আঙ্গুলে, তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই পরিবর্তন করেন। তোমার জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ আল্লাহর হাতে, তোমার হাটাচলা, স্থীরতা, কথাবার্তা আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছায় হয়ে

থাকে, তার অনুমতি ছাড়া বিন্দুমাত্রও নড়াচড়া করতে পারনা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কাজই করতে পারনা। যদি তোমার নিজের ব্যাপার নিজের কাছেই ন্যস্ত করা হতো, তবে অক্ষমতা, দূর্বলতা, সীমালঙ্ঘন, কলুষতা এবং পাপ ছাড়া কিছুই হতনা। আর যদি তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে ন্যস্ত করা হতো, তবে এমন একজনের কাছে ন্যস্ত হতো যে নিজের কোন ক্ষতি, উপকার, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান কিছুই করতে পারেনা। অতএব তুমি আল্লাহর থেকে এক মুহুর্তও অমুখাপেক্ষী হতে পারনা। বরং তুমি সর্বদা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁরই মুখাপেক্ষী। তোমার সর্বাংগে তাঁর নিয়ামত। সব সময় তাঁর নিকট তোমার প্রয়োজন থাকা সত্বেও তুমি অন্যায়, কুফুরী করে বেড়াচ্ছ। তুমি তাকে ভুলে গেছ, অথচ তোমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট, তোমার অবস্থান তাঁরই হাতের মুঠোয়।

হে মানব! তোমার দূর্বলতা, অক্ষমতার কারণে আল্লাহ তায়া'লা তোমার বোঝা হালকা করতে চান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।}[সূরা নিসাঃ ২৮]

তিনি রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, তাদের সম্মুখে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ জন্য অসংখ্য দলিল প্রমাণ ও নিদর্শন পেশ করেছেন, যাতে এ সব কিছু তাঁর একত্ববাদ, প্রতিপালকত্ব ও খোদায়ীত্বের দলিল প্রমাণ হয়। এতদ্বসত্বেও কিছু মানুষ সত্য ছেড়ে বাতিলের দিকে ধাবিত হচ্ছে, আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে, মিথ্যা নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।}[সূরা কাহফঃ ৫৪]

তোমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সে সব নিয়ামতের কথা তুমি কি ভুলে গেছ?! নাকি তুমি ভুলে গেছ যে, তুমি একফোঁটা নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছ?



তোমার গন্তব্য হলো কবরে, সেখান থেকে স্থায়ী বাসস্থান হবে জান্নাতে বা জাহান্নামে! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতন্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভূত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।} [সূরা ইয়াসিনঃ ৭৯]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।}[সূরা ইনফিতারঃ ৬-৭]

হে মানব! কেন তুমি আল্লাহর তাওহীদের স্বাদ ও তাঁকে সম্মান করার স্বাদ থেকে নিজেকে বিরত রাখছ...মোনাজাতরত হয়ে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকার স্বাদ; যাতে তিনি তোমার দরিদ্রতা থেকে মুক্ত করেন, রোগ থেকে আরোগ্য করেন, বিপদ থেকে রক্ষা করেন, গুনাহ মাফ করেন, ক্ষতি দূর করেন, নির্যাতিত হলে সাহায্য করেন, দিশেহারা বা পথভ্রষ্ট হলে সঠিক পথের সন্ধান দেন, যা জান না তা শিখিয়ে দেন, ভয় ভীতিতে নিরাপত্তা দেন, দূর্বলাবস্থায় দয়া করেন, শত্রুথেকে মুক্তি দেন এবং তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করেন।

হে মানব! মানুষের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো -দ্বীনের নিয়ামতের পরে- বিবেকেরনিয়ামত, যাতে লাভ-ক্ষতির মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারো, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বুঝতে পারো, তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারো; তা হলো এক আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোন শরিক নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দুরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে।} [সূরা নাহলঃ ৫৩-৫৪]



হে মানব! জ্ঞানীলোক উচ্চ মর্যাদাকারী বিষয়সমূহ ভালবাসে, আর অর্থহীন জিনিস অপছন্দ করে, সকল সৎ ও সম্মানিত আম্বিয়া ও সালেহীনদেরকে অনুসরণ করতে ভালবাসে, তাদের সাথে মিলিত হতে তাদের মন সর্বদা আকুল থাকে; যদিও তাদেরকে সামনে না পায়, এ সব কিছুর পথ হলো আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে বর্ণনা করেছেনঃ {বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।}[সূরা আলে ইমরানঃ ৩১]

মানুষ যখন এ সব ভাল কাজ সম্পন্ন করবে আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে নবী, রাসুল, শহীদ ও সৎলোকদের সঙ্গী করবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।}[সূরা নিসাঃ ৬৯]

হে মানব! তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, একাকী বসে তোমার কাছে যে সত্য এসেছে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, দলিল প্রমাণ দেখ, সুস্পষ্ট প্রমাণের বিষয়ে গবেষণা করো, এরপর, যদি দেখ ইহা



সত্য তবে তাড়াতাড়ি ইহার অনুসরণ করো, তখন তুমি কারো বন্ধুত্ব বা কোন অভ্যাসের পিছে পড়ে থেকোনা। জেনে রাখ তোমার নিজের জীবনের মূল্য তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, উত্তরসূরীদের চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ তায়া'লা কাফিরদেরকে এ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন, তাদের এ ব্যাপারে আফসোস করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু, দু জন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর-তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উম্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কাঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র।}[সূরা সাবাঃ ৪৬]

হে মানব! তুমি যদি ঈমান আন তবে কিছুই ক্ষতি হবেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর কিই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর উপর কেয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে! অথচ আল্লাহ, তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত।}[সূরা নিসাঃ ৩৯]

আমি নিজের সম্পর্কে যা জানি কোরআন আমার সম্পর্কে তার অধিক জানে

"আল কোরআন আমাকে খুবই পুলকিত করেছে। আমার অন্তরকে জয় করে নিয়েছে, আমাকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করেছে। কোরআন পাঠককে সর্বোচ্চ মুহুর্তে নিয়ে যায়, তখন তার সামনে একা একা তার স্রষ্টার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে উদ্ভাসিত করে। কেউ কোরানকে সত্যিকারে গ্রহণ করতে চাইলে ইহাকে সাধারণভাবে পড়লে হবে না। ইহা গভীরভাবে পড়লে পাঠককে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে মনে হবে তার উপর কোরানের অধিকার রয়েছে! ইহা তোমার সাথে তর্ক বিতর্ক করবে, তোমার সমালোচনা করবে, তোমাকে লজ্জায় ফেলে দিবে আবার কখনও তোমাকে চ্যালেঞ্জ করবে। আমি অন্য দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, আমার নিকট স্পষ্ট মনে হলো যে, এই কোরানের অবতীর্ণকারী আমার সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জানেন। আমার চিন্তা ভাবনার উপর কোরআন সর্বদা জয় লাভ করত। কোরআন আমার জিজ্ঞাসাবলীকে সম্বোধন করত...... প্রতি রাতে আমি আমার প্রশ্ন ও আপত্তি ঠিক করতাম, পরের দিন আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতাম... আমি কোরানের পাতায় পাতায় নিজেকে সম্মুখীন করেছি"।



জেফরি ল্যাং

মার্কিন গণিতবিদ



অর্থাৎ তারা যদি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আনত, তবে তাদের কি ক্ষতি হত?! তাদের এমন কি ক্ষতি হত তারা যদি আখেরাতের দিবসে ভাল কাজের প্রতিদানের আশায় আল্লাহর উপর ঈমান আনত?! তারা যদি আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করত তাহলে তাদের কি ক্ষতি হত?! তিনি তাদের ভাল ও মন্দ নিয়াত সম্পর্কে জানেন। তিনি জানেন কে তাঁর তাওফিক পাওয়ার যোগ্য, ফলে তিনি তাকে তাওফিক দান করেন, তাকে সুপথ দেখান, যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট সে সমস্ত ভাল কাজের তাওফিক দান করেন। তিনি আরো জানেন কে অপমান ও তাঁর দরজা হতে বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য, যে দরজা হতে কোন ব্যক্তি বিতাড়িত হলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ ও নিরাশ হয়?!

তোমার ইসলাম গ্রহণ তোমার কাজের বা আল্লাহর হালাল জিনিস গ্রহণের মাঝে তোমার জন্য কোন বাঁধা নয়। বরং তুমি তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যে কাজই করো সে জন্য সাওয়াব পাবে, এমনকি যদি তাতে দুনিয়ার স্বার্থ লাভ, সম্পদ, প্রতিপত্তি বা সম্মান লাভ করো তাতেও সাওয়াব পাবে। বরং হালাল গ্রহণের মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকলেও সাওয়াব পাবে। হে মানব! রাসুলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন। তারা আল্লাহর বানী পৌঁছিয়েছেন, মানুষের আল্লাহর শরিয়াত জানা উচিত, যাতে এ দুনিয়ার জীবন দলিল প্রমাণের সাথে যাপন করতে পারে ও পরকালে সফলকামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।} [সূরা নিসাঃ ১৭০]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সেপথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই।} [সূরা ইউনুসঃ ১০৮]

হে মানব! তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে একমাত্র তুমিই লাভবান হবে। আর কুফুরী করলে তুমিই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ তায়া'লা বান্দাহ থেকে অমুখাপেক্ষী। অবাধ্য লোকের গুনাহ তাঁর



কোন ক্ষতি করেনা বা অনুগত লোকের ভালকাজ তাঁর কোন উপকারে আসেনা। অতএব, তাঁর জ্ঞাতসারেই কেউ গুনাহগার হয়, আর তাঁর রহমতেই কেউ অনুগত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।} [সূরা আন'আমঃ ১০৪]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তায়া'লা থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ «হে আমার বান্দাহগণ! আমি জুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করেছি, এবং তোমাদের জন্যেও এ কাজটি হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করোনা। হে আমার বান্দাহগণ! আমি যাকে হিদায়েত প্রদান করি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। কাজেই তোমরা আমার কাছে হিদায়েত চাও, আমি হিদায়েত দিবো। হে বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ছাড়া অন্যরা অভুক্ত থাকে। অতএব, তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খেতে দিবো। হে বান্দাহগণ! আমি যাকে পরিধান করাই সে ছাড়া অন্য সকলেই উলঙ্গ। অতএব, তোমরা আমার কাছে পোশাকের জন্য প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ দান করবো। হে বান্দাহগণ! তোমরা দিনরাত গুনাহ কর, আর আমি সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা আমার কোন অপকারও করতে পার না আর উপকারও করতে পার না। হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের আগের ও পরের, এবং জ্বীন ও মানব সকলেই যদি তোমাদের মাঝের সবচেয়ে বড় মুত্তাকীর হয়ে যায়- এতে আমার কোন রাজত্ব বাড়বে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের লোকেরা এবং জ্বীন ও মানব সকলেই তোমাদের মাঝের সবচেয়ে বড় পাপাচারীর ন্যায় পাপাচারী হয়ে যায় তাতেও আমার সম্রাজ্যে কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের আগের ও পরের মানুষ ও জ্বীন সকলে যদি এক ময়দানে সম্মিলিত হয়ে আমার কাছে চাইতে থাকে এবং আমি তোমাদের প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রার্থনা অনুযায়ী দিতে থাকি তাতে আমার কাছে যে ভান্ডার রয়েছে তা হতে যে পরিমান সম্পদ কমবে তার পরিমান হবে মহাসমুদ্রে একটি সুঁই ডুবিয়ে বের করে আনার   অনুরূপ। হে আমার বান্দাহগণ! এ তো তোমাদেরই আমল । আমি তোমাদের জন্য তা হিসেব করে রেখেছি। অতঃপর, আমি তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে তোমাদের আমলের প্রতিদান দান করবো। অতএব, যে ভাল ফল পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে খারাপ প্রতিদান লাভ করে সে যেন এ জন্য নিজেকেই দায়ী ও অভিযুক্ত করে»। [(মুসলিম শরিফ)]





পাশ্চাত্য সভ্যতার গভীরতা

“কোন ব্যক্তি যদি গভীরভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে প্রবেশ করে, এর শাখা-প্রশাখা গুলো যদি সে বুঝে, তাত্ত্বিকভাবে ও ব্যবহারিকভাবে সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তবে সে অবশ্যই তার মনের সুপ্ত শক্তির কারণে স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইহা ইসলামী আক্বীদার ঝরনা থেকে তীব্রভাবে পিপাসা মিটিয়েছে”।

নাসিম সোসা

ইরাকি ইহুদি অধ্যাপক

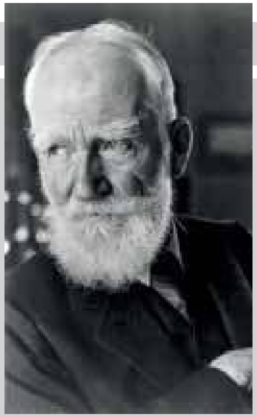
হে মানব! ইহাই একমাত্র পথ, দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ শান্তির জন্য অন্য কোন পথ নাই। অন্যান্য পথ হলো দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট ও ক্ষতিকারক পথ। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।} [সূরা আন’আমঃ ১৫৩]

সুতরাং যে শান্তির পথে চলবে সে সেখানে পৌঁছে যাবে, আর যে অন্য পথে চলবে সে শান্তির পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাবে। সে কখনও সুখ শান্তি লাভ করতে পারবেনা।



শান্তি ও সুখের ভিত্তিসমূহ

“বর্তমান ইউরোপ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের প্রজ্ঞা অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লেগেছে। ইহা মধ্যযুগে ইউরোপের আরজীবদের দেয়া অভিযোগ থেকে ইসলামী আক্বীদাকে মুক্ত করতে শুরু করেছে। মুহাম্মদের দ্বীন যা নিরাপত্তা ও শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাই এক সময় ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে। নানা দ্বিধা, সমস্যা ও সংকটের সমাধানে ইহার উপরই নির্ভর করবে”।



বার্নার্ড’শ

ইংরেজ লেখক

ইহাই একমাত্র পথ....

এ পথ প্রত্যেক বিবেকবানই চিনে যদিও প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। সে জানে ইহাই চিরস্থায়ী শান্তির পথ। মূসা [আঃ] তার নবুয়াতের মু’যিজা পেশ করার পরেও যেমনিভাবে তারা অস্বীকার করেছিল, এদের অবস্থাও তাই। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ

{তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?} [সূরা নামলঃ ১৪]

অনেক নিরপেক্ষ নীতিবান জ্ঞানীরা -যদিও তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি- স্বীকার করেছেন যে, সমস্ত মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ শান্তির একমাত্র পথ ইহাই।

ইহাই একমাত্র পথ... নিজের বিবেকের মত প্রকাশে সাহসী প্রত্যেক ব্যক্তিই কথ স্বীকার করেন, যদিও অনেক সংকীর্ণতা ও গোপনীয়তা থাকে। যারা নিজের স্বার্থকে বা মানুষেকে ভয় পায়না। তারা ভয় পায়না এ দ্বীন গ্রহণে কোন নতুনত্বকে বা প্রচারনাকে বা মস্তিষ্কে অংকিত পূর্বের কোন চিত্রকে। কত মানুষকেই ভীরুতা, সম্পর্কচ্ছেদ ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হওয়ার ভয় এ দ্বীন গ্রহণ ও শান্তির পথ থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক,তবে আমাকে ভয় কর।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৫]

ইহাই একমাত্র পথ... হ্যাঁ ইহা সুখ-সৌভাগ্যের পথ, সম্মানের পথ, রহমতের পথ, জ্ঞানের পথ, সভ্যতার পথ, সচ্চরিত্রের পথ। যদিও এ পথে কিছু পরীক্ষা আসে, তা হলো জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম, মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদী যাচাই করার জন্য। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।} [সূরা মুলকঃ ২]

ইহাই একমাত্র পথ... এ পথেই পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়া কিরামগণ চলেছেন, সাহাবা কিরাম ও তাদেরকে যথাযথভাবে অনুসরণকারী সমস্ত জাতি, গোত্র ও ভাষাভাষী তাবেঈনদের পথ। ইহাই অদূর ভবিষতে নেতৃত্ব দিবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ « দিবস ও রজনীর ন্যায় আল্লাহ তায়া’লা এই দ্বীনকে অবশ্যই সর্বত্র পৌঁছে দিবেন। আল্লাহ তায়া’লা এমন কোন মাটির ঘর কিংবা চামড়ার তৈরি তাঁবু ঘর রাখবেন না, যেখানে এই দ্বীনকে প্রবেশ করানো হবে না, সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য সম্মানের পন্থায় এবং লাঞ্ছিতের জন্য লাঞ্ছনাময় পন্থায়। সম্মানিতকে আল্লাহ পাক ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানিত করেন, আর লাঞ্ছিতকে কুফুরীর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করেন»। (মুসনাদে আহমদ)।

সুতরাং এ চিরস্থায়ী শান্তির পথে সম্মানিত পথিকদের সাথে চলো। ইহাই একমাত্র পথ...... ইহাই একমাত্র সফলতা... ইহাই সুখ-সৌভাগ্য, যাতে এ পথের পথিকদের অন্তর সর্বদা ডুবে থাকে। অতএব, নিজেকে বঞ্চিত করো না, নিজের উপর জুলুম করো না। সাবধান! নিজের উপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকো, সৌভাগ্যের পথে চলো। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]



অন্তরকে বন্দী করে

“বিশ্বের নানা ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়নের পরে আমি এ ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা তার বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলের মাঝেই সমানভাবে প্রভাব ফেলে। ইসলামের সবচেয়ে বড় গুন হলো ইহা মানুষের অন্তরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আটক করে দেয়। এজন্যই ইসলামে এক ধরণের আশ্চর্যকর যাদু ও আকর্ষণ দেখতে পাবে, যা বিকশিত জ্ঞানের অধিকারী অমুসলিমকে আকর্ষণ করে”।

মেরি অলিভার

মার্কিন মহিলা কবি

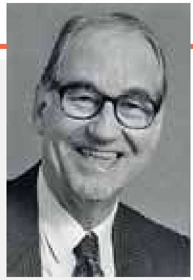


এ কাফেলার সাথে মিলিত হও

“যুগে যুগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের প্রসার প্রচার ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা ইহা মানুষের স্বভাব সুলভ ধর্ম, যা মুহাম্মদের অন্তরে নাযিল করা হয়েছে”।

ডঃ মুরাদ হোপম্যান

জার্মান রাষ্ট্রদূত



চিরন্তন প্রকল্প

"ইসলাম হলো চিরস্থায়ী প্রকল্পের বিকল্প জীবন ব্যবস্থা, যার উপযোগীতা ও চাহিদা কখনও শেষ হবে না। কেউ একে অতীত হিসেবে ভাবলে দেখবে ইহাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎও রয়েছে, ইহা কোন স্থান ও কালের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। অতএব, ইসলাম চিন্তা ও ফ্যাশনের কোন তরঙ্গ নয়, যার অপেক্ষা করতে হবে... মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বকে সভ্যতার নেতৃত্ব দিলে এটা অসম্ভব মনে করা হবে না। কেননা বলা হয়ে থাকেঃ "সত্যভাত আলো প্রাচ্য থেকেই আসে"। ইহা যথার্থ উক্তি"।

ডঃ মুরাদ হোপম্যান

জার্মান রাষ্ট্রদূত



আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণ

"ইহা ছিল আমার জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত, যখন দেখলাম আল্লাহ তায়া'লা তাঁর প্রশস্ত জ্ঞান ও রহমতে যন্ত্রণা এবং ব্যথাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দিতে আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, আরো দেখলাম যে, আমার অন্তরে আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণে বিরাট প্রস্তুতি... তখন আমি মুসলমান হই। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি জীবনে ভালবাসার অর্থ বুঝতাম না। কিন্তু আমি যখন কোরআন পড়েছি, তখন অনুভব করলাম যে, অগণিত রহমত ও ভালবাসার উচ্ছাস আমাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে, আমি আমার অন্তরে ভালবাসার দাবী অনুভব করতে লাগলাম। যে জিনিস আমাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হলো আল্লাহ তায়া'লার অতুলনীয় ভালবাসা"।

জেফরি ল্যাং

মার্কিন গণিতবিদ

ইহাই হলো পথ... অতঃএব ইহাকে শক্তকরে আঁকড়িয়ে ধর। দুনিয়াতে অনাবিল সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও আরামে জীবন যাপন করো। ভুলে যেওনা আল্লাহর নিকট যা আছে তা অতিউত্তম ও স্থায়ী। আখেরাতের আরাম হলো স্থায়ী আরাম। আমাদের ইলাহ আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য একটি পথই দিয়েছেন। এতে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের শান্তি। অন্যসব পথে দুনিয়ার অশান্তি ও দুর্দশা এবং আখেরাতের আযাব রয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৪-১২৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৬]

সাবধান! হে আত্মভোলা বা স্বেচ্ছায় ভুলে যাওয়া মানুষ!! ইহাই সুখ-সৌভাগ্যের পথ। এপথই আঁকড়িয়ে ধর।

ইহাই একমাত্র পথ.... এ পথ চলতে শুরু করে অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা স্বীকৃতি এবং সমস্ত নবী রাসুলদের উপর ঈমান নিয়ে, আর শেষ



হয় পরকালের অনাবিল শান্তি লাভের মাধ্যমে। শুরু হয় কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে, তা হলোঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। ইহা শেষ হয় জান্নাতে আল্লাহ তায়া'লার দর্শন ও রাসুলের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যের মধ্য দিয়ে। অতএব এখুনি বলোঃ"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাল্লাহ"। সুখী জীবন যাপন কর, আর সুখী হয়ে মৃত্যুবরণ কর। জান্নাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত কবরে সুখী হয়ে থাক। ইহাই একমাত্র পথ। তুমি যদি এ পথে না চল, তবে মনে রেখো, রাসুলের শুধু পৌঁছানোই দায়িত্ব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়াতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী।} [সূরা হুদঃ ৫৭]



লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

"আমি যখন আল্লাহ পাককে জানলাম, তাঁর উপর ঈমান আনলাম। ইসলাম বলে, আল্লাহ তায়া'লা তোমার ঘাড়ের মূল রগ থেকেও অধিক নিকটে, তাহলে তোমার ও স্রষ্টার মাঝে কোন মাধ্যমের দরকার নেই। কোন পুরোহিতের প্রয়োজন নেই যার কাছে তুমি ভুল স্বীকার করবা এবং সে তোমার তাওবা গ্রহণ করবেন, অথবা কোন প্রতিমূর্তিরও দরকার নেই যা ছাড়া ইবাদত করা যায় না"।

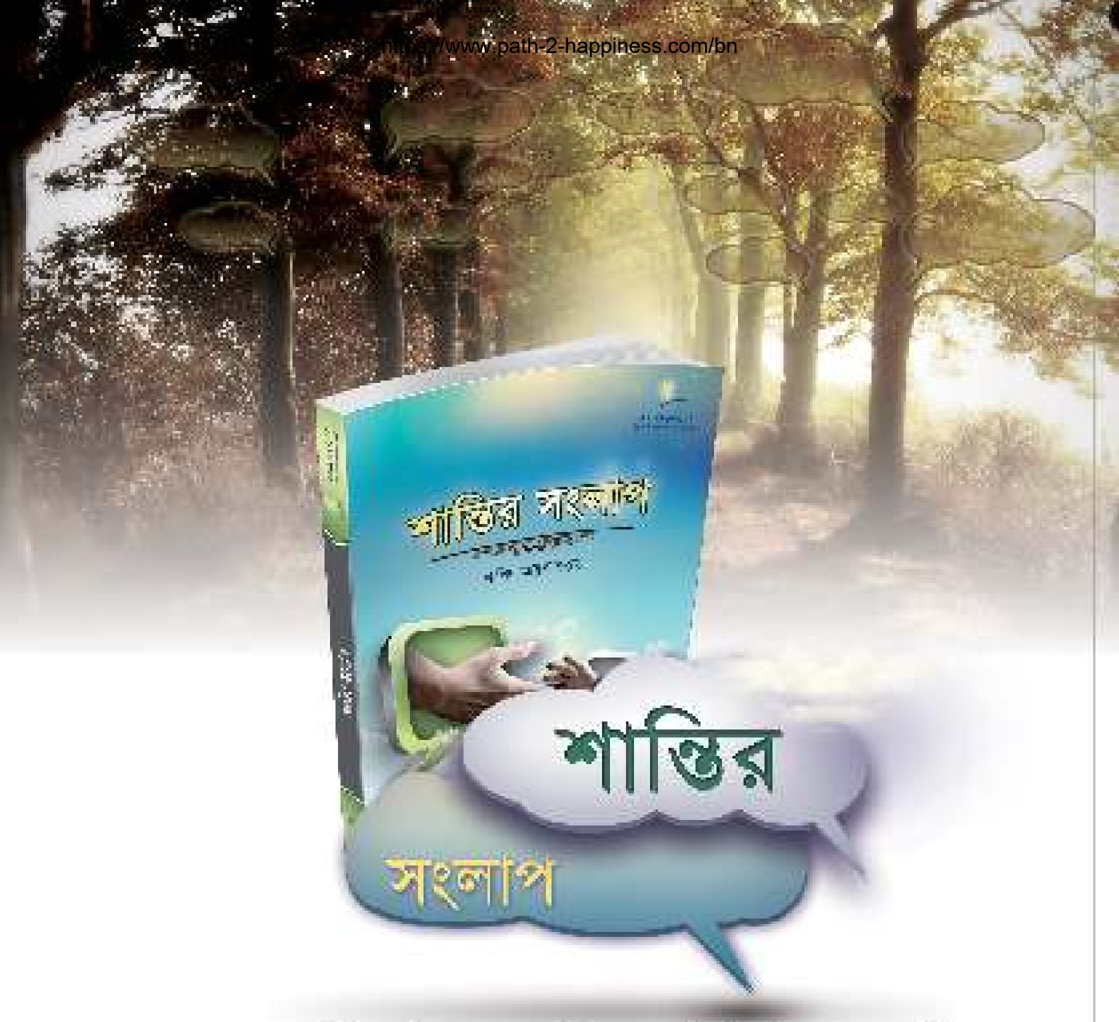
ডোনাল্ড রকুয়েল

মার্কিন কবি

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness



সূচিপত্র



আমাদের মধ্যে কেউ কি না শান্তি না চাইবে? এক কথায় সব মানুষই শান্তির উদ্দেশ্যে ছুটছে, কিন্তু কয়জনই বা এ শান্তি লাভ করতে পেরেছে? এবং কয়জনই বা এর সঠিক পথ চিনতে পেরেছে? সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, সুখ-শান্তির অনেক রকম উপায় রয়েছে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল মানুষ তার সত্তাকে বাস্তবায়ন করা। মানুষ তার সত্তা ততক্ষণ বাস্তবে রূপ দিতে পারবেনা যতক্ষণ না সে সর্বপ্রথম তার মানবতাকে বাস্তবায়ন করতে পারবে, যে মানবতা তাকে সৃষ্টির সব প্রাণী থেকে আলাদা করবে। জীবন,জগত ও মানুষ সম্পর্কে বড় বড় প্রশ্নাবলী নিয়ে চিন্তা করা এবং তার সঠিক ও সন্তোষজনক উত্তর লাভ করার মাধ্যমে মানুষ আত্মিক প্রশান্তি ও পরিতুষ্টি লাভ করে।

এ সংলাপগুলো শান্তির প্রাথমিক পথে আমাদের পথচারণার সংক্ষিপ্ত সারাংশ। যাতে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা হয়ে বাস্তবতা প্রকাশ পায় এবং আমাদের প্রত্যেকের চিন্তায় উদিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারে। এখানে মানবিক বিভিন্ন বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা অধিকাংশ পাঠকের বোধগম্য হওয়ার উপযোগী করে আকর্ষণীয় বর্ণনা শৈলীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বন্ধুত্বপূর্ণ সাইট

[redacted] — [redacted].